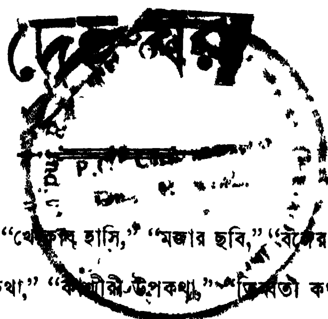




দে[illegible]

"শুশ্রূষা," "[illegible]পত্যসথা," "খোকার হাসি," "মজার ছবি," "[illegible]র উপকথা,"
"অন[illegible]র-উপকথা," "কাশ্মীরী-উপকথা," "[illegible]বতী কথা,"
"কিম্ভূত-কিমাকার" প্রভৃতির গ্রন্থকার

শ্রী[illegible]চরণ দে প্রণীত

"Nature, the dear old Nurse,
Took the child upon her knee,
Saying, Here is a story book
Thy father has written for thee"
—*Longfellow.*

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্—এলাহাবাদ
ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস্—কলিকাতা

১৯১৭

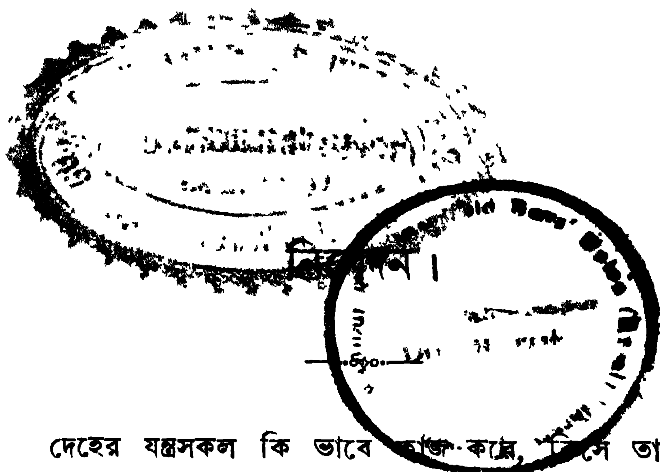
মূল্য ১৲ এক টাকা।

নিউ আর্টিষ্টিক্ প্রেস, ১, রামকিষণ [illegible]র লেন, কলিকাতা

শ্রীশরৎশশী রায় [illegible] মুদ্রিত

ও

এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ হইতে [illegible]পূর্ব্বকৃষ্ণ বসু দ্বারা প্রকাশিত।



নিবেদন।

দেহের যন্ত্রসকল কি ভাবে কাজ করে, কিসে তাহাদের ক্রিয়ার বিঘ্ন জন্মাইতে পারে, কি উপায় অবলম্বন করিলে সে সকলের প্রতীকার হইতে পারে, এ সকল বিষয়ে একটা মোটামুটি জ্ঞান সকলেরই থাকা আবশ্যক। বিজ্ঞানকে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য ইংরাজীতে বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-দিগের লেখা Popular Science Series এর অনেক বই আছে। কিন্তু আমাদিগের মাতৃভাষায় সেরূপ পুস্তকের নিতান্ত অভাব। বাঙ্গালা ভাষায় শিশুদিগের উপযোগী বিজ্ঞানের সহজ সুন্দর কোন গ্রন্থ নাই, এজন্য আমাদের বিদ্যালয়সমূহেও এ সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। বিজ্ঞ পাঠকেরা এ পুস্তকের কয়েকপাতা উল্টাইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞানের কটমট যাহাদের রুচিকর হয় না অথবা যাহাদিগেব বিদেশীভাষায় বই পড়িবার সুবিধা, সুযোগ বা ইচ্ছা নাই তাহাদিগকে সাধ্য ও সম্ভবমত নিজ নিজ ঘরের খবর দিবার জন্য এই দেহ-ঘর লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানিকে শিক্ষার্থী-দিগের মনোজ্ঞ ও সহজ-বোধ্য করিবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা

করিয়াছি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিবরণ ও শরীর-যন্ত্রাদির প্রক্রিয়া সহজে বুঝাইবার জন্য বিলাত হইতে আনীত বহুসংখ্যক চিত্রও সংযোজিত করিয়াছি।

সোদরপ্রতিম ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, বি, মহোদয় ইহার পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

কলিকাতা,
জানুয়ারী, ১৯১৭। } গ্রন্থকার।

সূচিপত্র।



প্রথম অধ্যায়।

মানব-দেহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কঙ্কাল।

তৃতীয় অধ্যায়।

মাংসপেশী।

চতুর্থ অধ্যায়।

ত্বক্।

পঞ্চম অধ্যায়।

পরিপাক ক্রিয়া।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়া।

সপ্তম অধ্যায়।

শ্বাস-প্রশ্বাস।

অষ্টম অধ্যায়।

মস্তিষ্ক।

নবম অধ্যায়।

স্নায়বীয় বিধান।

দশম অধ্যায়।

জ্ঞানেন্দ্রিয়।

দেহ-ঘর

প্রথম অধ্যায়

মানবদেহ

আমাদের শরীরটা যেন আমাদের থাকিবার ঘর। আমার শরীরটা যে 'আমি' নয় তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পার। তাহা না হইলে, "আমার শরীর," "আমার হাত," "আমার পা" বলিতে না। ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছ যে 'আমি' আর 'আমার শরীর' এক নয়। তাই বলিয়াছি শরীরটা যেন আমাদের থাকিবার ঘর। ঘরের যেমন দরজা, জানালা আছে এই দেহ-ঘরেরও তাই আছে। দেহ-ঘরের পাঁচটা সদর দরজা। সেই দরজা দিয়া বাহিরের খবর আমাদের নিকট পঁহুছে। দর্শনদ্বার, শ্রবণদ্বার, আঘ্রাণদ্বার, আস্বাদন দ্বার, এবং স্পর্শদ্বার এই পাঁচটী দরজা দিয়া আমার দেহ-ঘরের বাহিরে যখন যাহা ঘটিতেছে তাহার খবর তৎক্ষণাৎ আমার কাছে আসে। সাধারণতঃ চলিত ভাষায় মানবদেহকে "নবদ্বারী ঘর" বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ চক্ষু দুই, কর্ণ দুই, নাসারন্ধ্র দুই, মুখ এক এবং মল-মূত্রদ্বার দুই— এই নয়টী দ্বার। ঘরের যেমন দরজা ছাড়া আবার জানালারও

*দরকার হয় তেমনি এই দেহ-ঘরের ও অসংখ্য জানালা আছে ; সেগুলি হইল লোমকূপ।

আবার আমাদের বাড়ীর যেমন একতলা, দোতলা আছে এই দেহ-ঘরেরও তাই আছে। এই দেহ-ঘরের নীচের তলায় রান্না-ঘর অর্থাৎ পাকস্থলী। আমরা যাহা কিছু খাই এখানে সে সমস্ত রান্না বা পরিপাক হইয়া সার অংশ রক্তে পরিণত হয় এবং অসার অংশ মলমূত্র বা ঘর্ম্মে পরিণত হয়। ইহাকেই চলিত ভাষায় আমরা 'হজম হওয়া' বলি। ইহার উপরের তলায় এক দমকল অর্থাৎ হৃদ্‌যন্ত্র। দমকলের ন্যায় ইহা রক্ত সকলকে শরীরের চারিদিকে চালনা করে। ইহাতেই দেহ-ঘরটী সর্ব্বদা গরম এবং মেরামত অবস্থায় থাকে। সকলের উপর তলায় মস্তক। এই যায়গায় 'আমির' খাস কামরা। দেহ-ঘরের কোথায় কি হইল না হইল এইখান হইতেই আমি সব জানিতে পারি এবং যখন যাহা দরকার হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারি।

মানুষ এ পর্য্যন্ত যত প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছে সে সমস্ত দেহ-যন্ত্রের তুলনায় কিছুই নয়। এই যন্ত্র কিরূপে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা জানিতে পারিলে তোমরা অবাক হইয়া যাইবে। যে ভাল গৃহস্থ সে তাহার ঘরখানি যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং যাহাতে উহার কোন স্থানে কম মজবুত বা বেমেরামত হইয়া না পড়ে সে বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন নিয়া থাকে। আমাদের এই দেহ-ঘরখানিও যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং মেরামত অবস্থায় থাকে সে বিষয়ে আমাদের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বে এই ঘরখানি কিরূপ এবং কি দিয়া তৈয়ার হইয়াছে তাহা জানা দরকার।

তোমরা সকলেই জান যে হাড় ও মাংসের উপর চামড়া দিয়া আমাদের শরীর প্রস্তুত হইয়াছে। এ বিষয়ে ক্রমশঃ অনেক জানিতে পারিবে। প্রথমে কোমল ত্বকদ্বারা আবৃত মাংস এবং তাহার নীচে দৃঢ় অস্থি-পঞ্জর। এই অস্থিময় কঙ্কালই দেহের অবলম্বন (১নং চিত্র দেখ)। পৃষ্ঠদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড-গ্রথিত একখানি অস্থি-মালা। ইহাকেই মেরুদণ্ড বা চলিত ভাষায় "শির্‌দাঁড়া" বলে।

শরীরকে সাধারণতঃ তিন অংশে ভাগ করা যায়; যথা—(ক) মস্তক, (খ) দেহকাণ্ড বা ধড় এবং (গ) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। মস্তকে করোটী বা মাথার খুলি; ইহাতে মগজের স্থিতি। দেহকাণ্ডে বক্ষঃস্থল এবং উদর ভাগ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঊর্দ্ধভাগ হস্ত ও নিম্নভাগ পদ। হস্ত আবার বাহু, কনুই, প্রকোষ্ঠ (কনুই হইতে কব্‌জি পর্য্যন্ত), মণিবন্ধ (কর্‌জি) ও অঙ্গুলীতে বিভক্ত এবং পদ ঊরু, জঙ্ঘা, জানু (হাঁটু), গুল্‌ফ (গোড়ালি) ও পদাঙ্গুলীতে বিভক্ত।

হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ও স্তন দুই দুইটী। ইহারা দেহের ডান ও বাম পার্শ্বে একটী করিয়া থাকে। দেহের ভিতরের সকল যন্ত্র এরূপ নহে। পাকস্থলী, যকৃৎ, প্লীহা ও হৃৎপিণ্ড এক একটী মাত্র। কিন্তু ফুসফুস, মূত্রাশয়, গর্ভাশয় প্রভৃতি জোড়া জোড়া।

দেহের নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান অংশগুলির বিষয় এক্ষণে আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) অস্থি-পঞ্জর বা কঙ্কাল (skeleton or bony frame work).

(২) মাংসপেশী বা মাংসল অংশসমূহ (muscles or fleshy parts).

(৩) পরিপাক যন্ত্রসমূহ (digestive organs).

(৪) রক্ত সঞ্চালন যন্ত্রসমূহ (organs of the circulation of blood).

(৫) শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রাবলী (organs of respiration or breathing).

(৬) মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমণ্ডলীসমূহ (brain and the nervous system).

(৭) জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ—স্পর্শ, স্বাদ, আঘ্রাণ, শ্রবণ এবং দর্শন—(senses)

(১) দেহযন্ত্র ও ইঞ্জিন

তোমরা সকলেই হয়ত কোন না কোন বাস্পীয যন্ত্র দেখিয়াছ। অন্য কোন কল কারখানা সকলে দেখিয়া না থাকিলেও রেলের গাড়ী বা ষ্টীমার নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবে। যাহারা রেলের গাড়ী দেখিয়াছ তাহারা জান যে একটা ইঞ্জিন কতগুলি গাড়ী নিয়া তীরবেগে ছুটিতে থাকে। যাহারা জাহাজ দেখিয়াছ তাহারা জান যে কতজলের স্রোত কাটিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজগুলি কেমন দ্রুতবেগে চলিয়া যায়। এক একটা ইঞ্জিনের কত জোর তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছ। এই ইঞ্জিন আর মানবদেহে নিম্নলিখিত পাঁচটী বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য আছে, যথা—

(ক) মানবদেহ ও ইঞ্জিন এই উভয়েরই খাদ্যের আবশ্যক হয়।

(খ) মানবদেহ ও ইঞ্জিন এই উভয়েই অসার অংশ পরিত্যাগ করে।

(গ) মানবদেহ ও ইঞ্জিন এই উভয়কেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়।

(ঘ) মানবদেহ ও ইঞ্জিন এই উভয়ই ব্যবহারে কর্ম্মক্ষম থাকে।

(ঙ) মানবদেহ ও ইঞ্জিন এই উভয়েরই প্রত্যেক অংশ অপর অংশের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। যে কোন এক অংশ অকর্ম্মণ্য হইলে অপরাংশও তাহার ফলভাগী হয়। এমন কি কোন এক অংশ বিকলাঙ্গ হইলে সমস্ত দেহ বা ইঞ্জিন একবারে অকর্ম্মণ্য বা শক্তিহীন হইয়া পড়ে।

এক্ষণে এই পাঁচটী বিষয়ের প্রত্যেকটী পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাক। প্রথমে বলিয়াছি যে—

(ক) মানবদেহ ও ইঞ্জিন এতদুভয়েরই আহারের প্রয়োজন। আমাদের পক্ষে খাদ্যদ্রব্য, ইঞ্জিনের পক্ষে ইন্ধন বা কয়লা। কয়লা ব্যতীত যেমন ইঞ্জিন চলে না তেমনি আহার ব্যতীত আমাদের দেহ রক্ষা পায় না। ইঞ্জিনে যেমন কয়লা না দিলে আগুন নিভিয়া ইঞ্জিন অচল হইয়া পড়ে তেমনি অনাহারে থাকিলে আমাদের মৃত্যু ঘটে। আবার ইঞ্জিনের যেমন খাদ্য রূপে কয়লা, তেল ও জলের আবশ্যক, তেমনি আমাদেরও খাদ্যের জন্য তিন প্রকার খাদ্যের আবশ্যক; যথা—

(১) বলকারক (strength giving) বা অঙ্গার বাষ্পাত্মক খাদ্য (carbonaceous).

(২) মাংসবর্দ্ধক (flesh repairing) বা যবক্ষার বাষ্পাত্মক খাদ্য (nitrogenous).

(৩) স্বাস্থ্যপ্রদ (health preserving) বা খনিজ পদার্থ মিশ্রিত খাদ্য (mineral).

ইহার উপর প্রচুর পরিমাণে বায়ু এবং জলের আবশ্যক। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পরে জানিতে পারিবে। এক্ষণে দ্বিতীয় বিষয়টী আলোচনা করা যাক।

(খ) মানবদেহ ও ইঞ্জিন উভয়েই অসার অংশ পরিত্যাগ করে। তোমরা যদি কেহ কখন কোন রেলওয়ে ষ্টেশনে বেড়াইতে গিয়া থাক তবে অনেক সময় দেখিয়া থাকিবে যে গাড়ী ষ্টেশন হইতে চলিয়া গেলে যে স্থানে ইঞ্জিন দাঁড়াইয়াছিল সেখানে ছাই, হাঁপরের মল ও অর্দ্ধদগ্ধ কয়লা ইত্যাদি পড়িয়া আছে। কয়লা পুড়িয়া গেলে অবশিষ্ট অসার অংশ সকল ফেলিয়া না দিলে আগুনের তেজ বৃদ্ধি পায় না, সেজন্য এই সকল অসার অংশ ফেলিয়া দিতে হয়। মানুষেরও আহার্য্য দ্রব্য রক্তে পরিণত হইয়া অবশিষ্ট অসার অংশ সকল মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ও প্রশ্বাস ইত্যাদি নানা আকারে বহির্গত হয়। এইরূপে ইঞ্জিন ও মানবদেহ উভয়ের অসার অংশ সমূহ বিবিধ উপায়ে নির্গত না হইলে উহাদিগকে অকর্ম্মণ্য ও অসুস্থ করিয়া ফেলে। তৃতীয়তঃ—

(গ) মানবদেহ ও ইঞ্জিন উভয়কেই সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়। তোমরা কখনও পুরাতন অপরিষ্কার ইঞ্জিন দেখিয়াছ কি? এরূপ ইঞ্জিন চালান কি কষ্টকর! চলিবার সময় ঝন্ ঝন্ শব্দ করে, ক্রমাগত ঝাঁকিতে থাকে আর ছড়্ ছড়্ করে, খানিক দূর গিয়া হয়ত একদম আর চলে না। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখিলে জং বা মরিচা ধরে, ময়লা জমিলে অংশ সকল অচল হয় এবং ক্রমে সমস্ত ইঞ্জিনখানা একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে বা কোন অংশ একবারে ভাঙ্গিয়া যায়। ইঞ্জিনের যে দশা, অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন

রাখিলে মানুষের শরীরেরও ঠিক সেই দশা ঘটে। মানুষের শরীরের ভিতর এবং বাহির উভয়ই ধুইবার প্রয়োজন হয়। এই ধোয়ানর কাজ অনেক রকমে হইতে পারে। তবে জল দ্বারা ধৌত করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। কেন, তাহার কারণ পরে জানিতে পারিবে। এক্ষণে চতুর্থ বিষয়টী আলোচনা করা যাক।

(ঘ) মানবদেহ ও ইঞ্জিন উভয়ই ব্যবহারে কর্ম্মক্ষম থাকে। যত প্রকার যন্ত্র আছে সমস্তই যত ব্যবহার করা যায় ততই কর্ম্মক্ষম থাকে। বরং ব্যবহারেই শক্তির বৃদ্ধি এবং অব্যবহারেই অকর্ম্মণ্যতার বৃদ্ধি বা মৃত্যু উপস্থিত হয়। পৃথিবীতে এমন অনেক জন্তু আছে যাহাদের কোন কোন অঙ্গ অব্যবহারে একেবারে লোপ পাইয়াছে। তোমরা অনেক সময় দেখিয়া থাকিবে যে অনেকদিনের পোষা পাখীকে খাঁচার বাহিরে ছাড়িয়া দিলেও তাহার আর উড়িবার শক্তি থাকে না। আর উড়িতে পারিলেও অধিক দূর যাইবার ক্ষমতা থাকে না। এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে যাহা তোমরা বড় হইলে জানিতে পারিবে। শরীরের পক্ষে যেমন ব্যবহারেই শক্তির বৃদ্ধি এবং অব্যবহারেই মৃত্যু, ইঞ্জিনের পক্ষেও ঠিক তাই। ইঞ্জিন কিছুদিন ব্যবহৃত না হইলেই লোহাগুলিতে মরিচা পড়িয়া ক্ষয় হইতে থাকে, ময়লা জমিতে থাকে এবং ক্রমে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

পঞ্চমতঃ—

(ঙ) মানবদেহ ও ইঞ্জিন এই উভয়েরই প্রত্যেক অংশ অপর অংশের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। অর্থাৎ যে কোন

এক অংশ অকর্ম্মণ্য হইলে অপর অংশও তাহার ফলভাগী হয়। এমন কি কোন ইঞ্জিন বা যন্ত্রের একটী অতি সামান্য অংশ বিকল হইলেই সমস্ত ইঞ্জিন বা যন্ত্রটী একবারে অকর্ম্মণ্য বা শক্তিহীন হইয়া পড়ে। দেহ সম্বন্ধেও ঠিক তাই। এ বিষয়ে একটী গল্প বলিতেছি।

একবার এক ব্যক্তির হাত, পা, মাথা, নাক, মুখ ও চোখ প্রভৃতি সকলে মিলিয়া ভাবিল "আমরা সবাই মিলে খেটে মরি আর উদর বেটা বসে বসে মিঠাই মণ্ডা খেয়ে মজা ধরে। এবার বেটাকে আচ্ছা করে জব্দ করতে হবে।" তখন সকলে মিলিয়া যুক্তি ঠিক করিল যে "কেউ ও বেটাকে খেতে সাহায্য করব না। ও যদি নিজে পারে তবে যত ইচ্ছা পেটে পুরুক!" এই বলিয়া সকলে চুপ করিয়া রহিল। তখন মাথায় আর বুদ্ধি গজায় না, চোখ কিছু দেখায় না, পা আর চলে না, হাত আর নড়ে না, মুখ আর হাঁ করে না, দাঁত আর চিবায় না। এইরূপে সকলে মিলিয়া ধর্ম্মঘট করিল এবং উদরকে একঘরে করিয়া রাখিল। কয়েক দিন যায়, উদর ত ক্ষুধার জ্বালায় একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। কি করে সকলকে তখন কাকুতি মিনতি আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার কথা শোনে কে? হাত, পা ইত্যাদি সকলে মিলিয়া তখন বলিতে লাগিল—"বেটা যেমন রোজ রোজ আমাদের ফাঁকি দিয়ে মিঠাই মণ্ডা খেয়ে মজা করে, তেমনি আজ আচ্ছা জব্দ হয়েছে। না ভাই, আমরা আর কেউ ওর জন্য খাটব না।" তখন উদর বেচারা আর কি করে, নিরুপায় হইয়া চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু

কয়দিন যাইতে না যাইতেই মাথা ঘুরিতে লাগিল। কাণ ভোভোঁ করিতে লাগিল। চোখ সরিষা ফুল দেখিতে লাগিল। হাত পা শুকাইয়া নলি হইতে লাগিল। তখন সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোলাহল আরম্ভ হইল। উদরকে জব্দ করিতে গিয়া সকলেই জব্দ হইতেছে দেখিয়া তখন তাহাদের চৈতন্য হইল।

পৃথিবীতে কত সূক্ষ্ম এবং অতি আশ্চর্য্য-আশ্চর্য্য যন্ত্র সকল প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু মানবদেহের মত এমন আশ্চর্য্য কল আর একটীও নাই।

(২) দেহ-যন্ত্রই একমাত্র বর্দ্ধনশীল যন্ত্র

মানুষ যে যন্ত্র প্রস্তুত করে তাহা চিরদিনই সমআকৃতি-বিশিষ্ট থাকে, কখনও বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও যে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন হইতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া কেমন একজন যুবকে পরিণত হয়। ইঞ্জিন আর মানবদেহে ইহা একটী বিশেষ পার্থক্য। এই যে শিশু হইতে যুবক, যুবক হইতে প্রৌঢ়, এই বৃদ্ধিরও শেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ মানব-দেহ পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে আর তাহাকে বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য্য দেহযন্ত্রের আর এক প্রকার বৃদ্ধি আছে। মানবদেহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া যখন উহার পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় তখনও উহার বৃদ্ধির শেষ হয় না। তবে তখন তাহা আকারে বর্দ্ধিত না হইয়া শরীরকে ক্ষয় হইতে রক্ষা করে।

তোমরা বোধহয় জান যে ইঞ্জিনের একটী 'বয়লার' (boiler) বা পাকপাত্র থাকে, তাহাতে জল গরম হইয়া বাষ্প প্রস্তুত হয় এবং সেই বাষ্পের জোরে ইঞ্জিন চলে। এই 'বয়লার' অকর্ম্মণ্য হইয়া গেলে নূতন 'বয়লার' প্রস্তুত করিয়া ইঞ্জিন চালাইতে পারা যায়। ইঞ্জিন চলিবার সময় যদি কোন স্ক্রুপ ঢিলা হইয়া যায় বা ভাঙ্গিয়া যায় তবে ইঞ্জিন থামাইয়া তাহা মেরামত করিলে তবে তাহা আবার চলিতে পারিবে। তোমরা যদি কখনও রেলগাড়ীতে চড়িয়া কোথাও গিয়া থাক তাহা হইলে দেখিয়া থাকিবে যে কোন বড় ষ্টেশনে গাড়ী থামিলেই দুইজন লোক সমস্ত গাড়ীর তলা পরীক্ষা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে একজন হাতুড়ি দিয়া গাড়ীর চাকায় ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতে করিতে যায় এবং অপরজন তেল দিতে দিতে যায়। গাড়ীর কোথাও কিছু বেমেরামত হইল কিনা দেখিবার জন্য এইরূপ পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়। কারণ কলপ্রস্তুতকারী যতই সুচতুর হউন না কেন তাঁহার এমন শক্তি নাই যাহাতে তিনি এমনভাবে ইঞ্জিন প্রস্তুত করিবেন যে উহার কোন অংশ খারাপ বা বিকল হইয়া গেলে তাহা আপনা হইতেই সংশোধিত বা মেরামত হইতে পারে। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর আমাদের দেহ-যন্ত্র এমনভাবে সৃজন করিয়াছেন যে তাহাতে আপনা হইতে মেরামত হইবার শক্তি দেওয়া আছে। অবশ্য একখানা হাত কাটিয়া ফেলিলে তাহা পুনরায় গজাইবে না সত্য, কিন্তু একখানা হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা আপনি জোড়া লাগিয়া যাইবে।

(৩) বৃদ্ধি কি?

বলিয়াছি মানবদেহ বৰ্দ্ধনশীল যন্ত্র। এই বৰ্দ্ধনশীলতা বা বৃদ্ধি কি? তোমরা হয়ত বলিবে যে বৃদ্ধি কে না জানে? ছোট হইতে বড় হওয়ার নামই ত বৃদ্ধি। একথা কতক পরিমাণে সত্য বটে যে ছোট হইতে বড় হওয়া বা কৃশ হইতে মোটা হওয়ার নামই বৃদ্ধি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উহা বৃদ্ধির ফল বলা যাইতে পারে মাত্র। তবে এই বৃদ্ধির অর্থ কি?

পূর্ব্বে দুইপ্রকার বৃদ্ধির কথা বলিয়াছি। এক বৃদ্ধি—ছোট হইতে বড় হওয়া; আর এক বৃদ্ধি—ক্ষয়পূরণ করা। প্রথমতঃ ছোট হইতে বড় হওয়া যে বৃদ্ধি তাহার কথাই ধরা যাক। ছোট একটা জিনিসকে বড় করিতে গেলেই তাহাতে কিছু যোগ করা আবশ্যক। মনে কর তোমার হাতে এক খণ্ড মাংস রহিয়াছে। তুমি যদি উক্ত মংাসখণ্ডকে বড় করিতে চাও তবে তাহাতে আরো কিছু মাংস সংযুক্ত না করিলে তাহার কখনই বৃদ্ধি হইতে পারে না। সেইরূপ তোমার হাতে যদি একগজ কাপড় থাকে, আর তুমি তাহা আরো লম্বা করিতে চাও তবে তোমাকে তাহার সহিত আরো খানিকটা কাপড় শিলাই করিয়া লইতে হইবে। মনে কর তোমরা কয়জনে মিলিয়া খিচুড়ি রান্না করিতেছ। এমন সময় যদি অপর কয়েকজন লোক আসিয়া উপস্থিত হয় আর তাহাদিগকে খাইতে দিতে হয় তাহা হইলে অবশ্যই আরো অধিক খিচুড়ীর আবশ্যক হইবে। এমতাবস্থায় উহাতে আরো

ডাল ও চাউল না মিশাইলে কখনই সে খিচুড়ী বাড়াইতে পারিবে না। অতএব দেখা গেল যে সেই পুরাতন খিচুড়ীতে নূতন কিছু জিনিস মিশ্রিত করাতে সেই পুরাতন খিচুড়ীই এখন আকারে বৃদ্ধি পাইল। আবার ইহাও দেখা গেল যে পরে যে জিনিস পূর্ব্ব-মিশ্রিত ডাল চাউলের সহিত মিশ্রিত করা হইল তাহাও তথায় পৃথকভাবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পরে পূর্ব্বোক্ত খিচুড়ির সহিত মিশ্রিত হইয়া উহার আয়তন বৃদ্ধি করিল।

পৃথিবীতে মানবদেহ আছে, তেমনি তাহার চারিদিকেও আবার জল, বায়ু ও অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্যাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে। উক্ত বাহিরের পদার্থ সকল দেহের সঙ্গে মিশ্রিত হইলে অথবা দেহের সহিত উক্ত পদার্থ সকলের একীকরণ হইলে তবে মানব-দেহ বৃদ্ধিপায় অর্থাৎ উহারা তখন দেহের অংশে পরিণত হয়। এইরূপ নানাপ্রকার পদার্থ বহুবিধ উপায়ে দেহের অংশরূপে পরিণত হয় এবং অতি আশ্চর্য্য কৌশলে দেহের চারিদিকস্থ পদার্থ সকল হইতে সারভাগ গ্রহণ করিয়া দেহ পরিপুষ্ট হয়। এ বিষয়ে তোমরা পরে আরো অনেক কথা জানিতে পারিবে। মানবদেহ কি আশ্চর্য্য কৌশলে গঠিত যত জানিবে ততই বিস্ময়াবিষ্ট হইবে।

এক্ষণে ক্ষয়পূরণ করা সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। তোমরা পরে জানিতে পারিবে যে মানবদেহে দুইপ্রকার মাংসপেশীর ক্রিয়া হয় তাহাতেই দেহের সকলপ্রকার ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যখনই মাংস-পেশীর কোন ক্রিয়া হয় অর্থাৎ আমরা যখন কথা বলি, হাত নাড়ি

অথবা দেহের ভিতর অপর যে কোন ক্রিয়া হয় তখনই সেই পেশীর কিছু ক্ষয় হয়। এইরূপে ক্রমশঃ মাংসপেশীর ক্ষয় হইতে থাকে। কিন্তু আমরা যাহা খাই তাহার সারাংশ রক্তে পরিণত হয় এবং একদিকে যেমন ক্ষয় হয় তেমনি আবার এই রক্তদ্বারা তাহার পূরণ হইয়া থাকে। এইরূপে সমস্ত দেহে অনবরত ক্ষয় ও পূরণ ক্রিয়া চলিতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

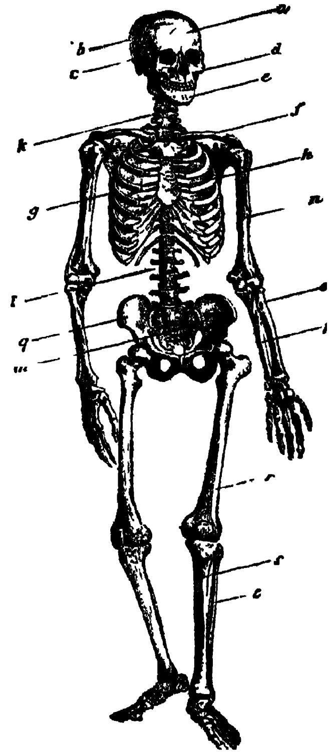
কঙ্কাল

তোমাদের মধ্যে যাহারা প্রতিমা গড়িতে দেখিয়াছ তাহারা জান যে প্রতিমা গড়িতে হইলেই প্রথমে কাঠাম তৈয়ারী করিতে হয়। তারপর তাহার উপর মাটির প্রলেপ দিয়া তবে ক্রমে সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। এই যে নরকঙ্কালটী (১নং চিত্র) দেখিতেছ উহা মানবদেহের কাঠাম মাত্র। এখন উহা দেখিতে বিকট দেখাইতেছে বটে, কিন্তু ইহারই উপর মাংস ইত্যাদি যুক্ত হইয়া কেমন দিব্যমূর্ত্তি মানবদেহ হয় তাহা যখন জানিতে পারা যায় তখন আর ইহাকে এত বিকট মনে করা সঙ্গত হয় না।

নানা আকারের কতকগুলি হাড় একত্রিত হইয়া তবে এই কঙ্কালটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই যে এক একটী হাড় অপর হাড়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে ইহাও অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। ৩২টি দাঁত সমেত ২৪৯ খানা পৃথক পৃথক হাড় সংযুক্ত হইয়া একটি নর-কঙ্কাল প্রস্তুত হইয়াছে। এই সমস্ত হাড়ের পৃথক পৃথক নাম জানা তোমাদের পক্ষে সম্ভব পর হইবে না, তবে বিশেষ আবশ্যকীয় কতকগুলি হাড়ের নাম জানিয়া রাখা ভাল; ক্রমশঃ তাহা বলিতেছি।

এই কঙ্কালই মানবদেহের প্রধান ভিত্তি বা অবলম্বন। ইহাই আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় বা যন্ত্র সকলকে আবেষ্টন করিয়া রক্ষা করে। ইহার জোরেই আমাদের আকৃতি বা অঙ্গের গঠনসমূহ অবিকৃত

a—ললাটাস্থি (frontal bone)
b—পার্শ্ব-কপালাস্থি (parietal bone
c—শঙ্খাস্থি (temporal bone)
d—গণ্ডাস্থি (malar)
e—অধঃহন্বস্থি (lower jaw bone)
f—কণ্ঠাস্থি (clavicle)
g—পঞ্জরাস্থি (ribs)
h—বুকাস্থি (sternum)
l—মেরুদণ্ড (vertical column)
m—ত্রিকাস্থি (sacrum)
n—ভুজাস্থি (humerus)
o—দণ্ডাস্থি (radius)
p—কূর্পরাস্থি (ulna)
q—নিতম্বাস্থি (hipbone)
r—ঊর্ব্বস্থি (femur)
s—অগ্রজঙ্ঘাস্থি (*tibia*)
t—পাদবদ্ধাস্থি (fibula)



১নং চিত্র—নর-কঙ্কাল।

থাকে এবং আমরা ইচ্ছামত অঙ্গচালনা ও চলাফেরা করিতে পারি। একবার ১নং চিত্রটীর দিকে তাকাও। দেখ পায়ের অঙ্গুলি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এই সুদৃঢ় অস্থিখণ্ডগুলি কেমন

দেহটীকে রক্ষা করিতেছে। এই সুদৃঢ় কাঠামটী না হইলে দেহটীর সোজা হইয়া দাঁড়ান অসম্ভব হইত। মস্তক ও বক্ষঃস্থলটীর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখ। মস্তিষ্ক এবং হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুস্‌ফুস্‌ যাহা দেহের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন তাহার রক্ষার নিমিত্ত কেমন দৃঢ় আবরণদ্বারা সেগুলি বেষ্টন করা হইয়াছে। আবার হস্তপদের অস্থিগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে দেহের এই অংশগুলির বিশেষ চালনা হয় বলিয়া এগুলি অধিক পুষ্ট এবং অধিক নাড়াচাড়া হয় বলিয়া অত্যন্ত মাংসল, কারণ মাংস এবং পেশীর জোরেই একখানি অস্থি অপর অস্থিখণ্ডের উপর অক্লেশে নড়িতে চড়িতে পারে।

(১) অস্থি কি ?

হাড় অতিশয় দৃঢ় এবং উহার রং শাদা। ইহাকে দেহের অংশ বলিয়া মনে হয় না। বরং দেখিতে অনেকটা কাঠ কিম্বা পাথরের টুকরার ন্যায় দেখায়। কিন্তু বাস্তবিক উহা দেহেরই অংশবিশেষ এবং দেহের সঙ্গে সঙ্গে ইহার বৃদ্ধি এবং পুষ্টিসাধন হয়।

জান্তব পদার্থ (organic matter) এবং আকরিক পদার্থের (mineral matter) সংমিশ্রণই অস্থির উপাদান। অর্থাৎ এক ভাগ জৈবিক পদার্থ বা যান্ত্রিক দ্রব্য এবং দুইভাগ খনিজ দ্রব্য বা মৃন্ময় পদার্থ সংমিশ্রণে অস্থি নির্ম্মিত হইয়াছে। তোমরা কখনও শিরিষের আঠা দেখিয়াছ কি ? বাছুরের খুর জ্বালদিয়া 'জেলি' (jelly) বা মোরব্বার ন্যায় যে পদার্থ প্রস্তুত হয় তাহারই নাম

'শিরিষ'। জ্বাল দিয়া খনিজ পদার্থ হইতে জৈবিক পদার্থ পৃথক করিলে এই মোরব্বার ন্যায় পদার্থ প্রস্তুত হয়। বয়স্ক ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা শিশুদিগের হাড়ে খনিজ পদার্থ খুব অল্প পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। শিশুদের হাড় অপেক্ষাকৃত অধিক কোমল এজন্য সহজে নোয়ান যায়। অনেক সময় কচি শিশু খাট হইতে পড়িয়া গেলে কিম্বা শিশুরা ক্রমাগত আছাড় খাইলেও যে অধিকাংশ স্থলেই হাত পা বা অপর কোন অঙ্গের হাড় ভাঙ্গিয়া যায় না অথবা ভাঙ্গিয়া গেলেও যে অতি সহজে জোড়া লাগে ইহাই তাহার কারণ।

খনিজ পদার্থের ভাগ যত অধিক হয় হাড়গুলি ততই শক্ত হইতে থাকে। সেজন্য বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অস্থির ভিতরে ক্রমশঃ খনিজ পদার্থের পরিমাণ বর্দ্ধিত হওয়াতে উহা এত ভঙ্গ-প্রবণ হয়। এবং এইজন্যই বৃদ্ধ বয়সে হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা সহজে জোড়া লাগে না। এ বিষয়ে দুইটী সহজ পরীক্ষা-প্রণালী এই :—

১ম—জ্বলন্ত আগুনের উপর একখানা হাড রাখিয়া দাও। কিছুকাল পুড়িবার পর উহা তুলিয়া লইলেই দেখিতে পাইবে যে উহা হালকা হইয়া ওজন তিন ভাগের এক ভাগ কমিয়া গিয়াছে। উহার ভিতরে যত জান্তব পদার্থ ছিল তাহা পুড়িয়া গিয়া কেবল খনিজ বা মৃন্ময় পদার্থ অবশিষ্ট আছে, হালকা হওয়ার ইহাই কারণ। এখন উহা এত ঠুন্‌কা হইয়া গিয়াছে যে পাথরের উপর পড়িলেই চূর্ণ হইয়া যাইবে।

২য়—একখানা হাড় জলমিশ্রিত সৈন্ধব দ্রাবকের (dilute Muriatic Acid) মধ্যে কয়েক সপ্তাহকাল ডুবাইয়া রাখ। তারপর তুলিলেই দেখিতে

পাইবে উহা এত হালকা হইয়াছে যে ওজনে তিনভাগের দুই ভাগ কমিয়া গিয়াছে। কারণ এখন উহার সমস্ত খনিজ পদার্থ এসিডে গলিয়া গিয়া কেবলমাত্র জান্তব পদার্থই অবশিষ্ট রহিয়াছে। এখন হাড়টী আকারে ঠিক পূর্ব্বের মত দেখাইলেও অতিশয় নরম হইয়া গিয়াছে। কাজেই উহা ইচ্ছা মত নোয়াইতে পারা যাইবে। এমন কি উহা এখন অতি সহজে দোম্‌ড়ান যাইবে এবং ছাড়িয়া দিলেই আবার সোজা হইয়া যাইবে।

জান্তব (organic) এবং খনিজ (mineral) পদার্থ যেমন অস্থির উপাদান তেমনি উহাতে দুই প্রকার দৈহিক সূত্র (tissue) বিদ্যমান আছে, যথা—(১) নিরেট দৈহিক সূত্র (compact tissue) এবং সচ্ছিদ্র বা ফোঁপাল দৈহিক সূত্র (spongy tissue)। হাড়ের সংযোগ-স্থানগুলি ফোঁপাল পেশী নির্ম্মিত, এজন্য এ গুলি দাঁত দিয়া অনায়াসে চিবাইতে পারা যায়। আর মধ্যভাগ গুলি নিরেট এজন্য উহা চিবাইতে পারা যায় না।

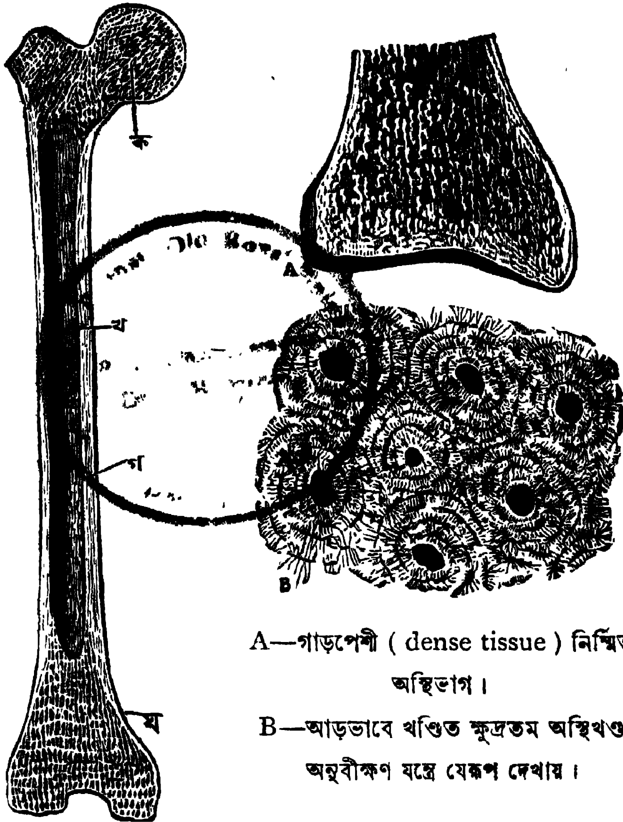
মানবদেহে তিন প্রকার অস্থি আছে, যথা ঃ—

(ক) ফাঁপা হাড় (hollow bone), যেমন পায়ের নলি।

(খ) চ্যাপ্টা হাড় (flat bone), যেমন মাথার খুলির উপরের অংশ।

(গ) অসমাকৃতি হাড় (irregular bone), যেমন মেরুদণ্ড।

(ক) ফাঁপা হাড় সাধারণতঃ হাত পা ইত্যাদির ভিতরেই থাকে এবং লম্বা ধরণের হয় (২নং চিত্র দেখ)। এই হাড়ের দুইদিকের শেষভাগ বা সংযোগ স্থানগুলি উপাস্থিময় (cartilage) অর্থাৎ মোরব্বার ন্যায় পদার্থবিশিষ্ট। ইহার ভিতরের ফাঁপা



A—গাঢ়পেশী (dense tissue) নির্ম্মিত অস্থিভাগ।

B—আড়ভাবে খণ্ডিত ক্ষুদ্রতম অস্থিখণ্ড অনুবীক্ষণ যন্ত্রে যেরূপ দেখায়।

২ নং চিত্র—লম্বাভাবে দ্বিখণ্ডিত উরুদেশের অস্থিদণ্ড (Femur)

ক—মুণ্ডভাগ, যাহা নিতম্বাস্থির সহিত সংযুক্ত থাকে ;

খ—মজ্জাময় খোল (Medullary Cavity) ;

গ—নিরেট অস্থিভাগ ; এবং

ঘ—নিম্নভাগ, যাহা জঙ্ঘাস্থির সহিত যুক্ত থাকে।

অংশে চর্ব্বি বা মেদময় একপ্রকার পদার্থ থাকে তাহাকে মজ্জা (marrow) বলে। তোমাদের অনেকেই হয়ত মাংসের ঝোল খাইবার সময় হাড় চিবাইতে ভালবাস। অনেক সময় এইরূপ ফাঁপাহাড় চুষিতে চুষিতে শাদা মজ্জা বাহির হইয়া পড়ে দেখিয়া থাকিবে। তোমরা হয়ত তাহা খাইতে খুব ভালবাস। ফাঁপা হাড়ের উপরের আবরণ নিরেট। চিত্রের 'ক' চিহ্নিত অংশ গাঢ়-পেশী (dense tissue) নিৰ্ম্মিত বা নিরেট। 'খ' চিহ্নিত অংশ উপাস্থিময় অর্থাৎ হাড় অপেক্ষা নরম পদার্থবিশিষ্ট। 'গ' চিহ্নিত অংশ মজ্জা বা অস্থিগত শস্য অর্থাৎ মেদময় পদার্থবিশিষ্ট।

(খ) চ্যাপ্‌টা হাড়ে সাধারণতঃ উপর নীচে দুইস্তর দৃঢ় অস্থিময় পেশী থাকে আর তাহার ভিতরে একস্তর পাতলা সচ্ছিদ্র হাড়ের ন্যায় পদার্থ থাকে। মাথার খুলির হাড়গুলিই ইহার দৃষ্টান্ত। মস্তিষ্কই জ্ঞানের আধার। তাই এই মাথার 'ঘি' বা মগজ রক্ষার নিমিত্ত মাথার খুলিটীকে একটী সুদৃঢ় বাক্‌সের ন্যায় প্রস্তুত করা হইয়াছে। আবার এই খুলির চ্যাপ্‌টা হাড়গুলির দুইদিকে দুইটী দৃঢ় স্তরের ভিতর একটী সচ্ছিদ্র স্তর (concellous) থাকাতে কোমলাঙ্গ মস্তিষ্ককে বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষা করে।

(গ) অসমাকৃতি হাড় আকৃতি ও প্রকৃতিতে নিতান্ত বিভিন্ন। এজন্য ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। তবে সাধারণতঃ এই হাড়গুলি সচ্ছিদ্র পেশী (spongy tissue) বিশিষ্ট এবং চতুর্দ্দিকে দৃঢ়পেশী বেষ্টিত। ইহার ফোঁপাল অংশ-

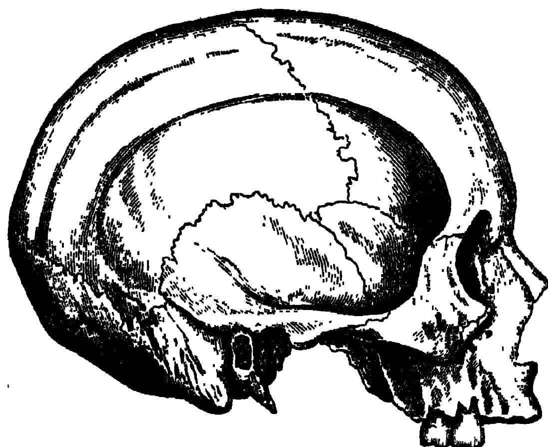
গুলিতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে এবং সেই ছিদ্রের ভিতরে একপ্রকার মজ্জার ন্যায় পদার্থ থাকে।

উপাস্থি (cartilage or gristle)—এই কোমল অস্থি এক প্রকার অতিশয় মজবুত, শক্ত এবং স্থিতিস্থাপক (elastic) দ্রব্যবিশেষ। ইহার রংও বিভিন্ন প্রকার। কোথাও বা ধব্‌ধবে শাদা, কোথাও বা হরিদ্রাভ। ইহা অস্থির ন্যায় সুদৃঢ় নয় এবং ইহাতে কোন শিরা বা রক্তকোষ নাই। সন্ধিস্থানের হাড়গুলি এই কোমল অস্থি দ্বারা আবৃত থাকে।

(২) মস্তক ও তদস্থি (Cranium)

তোমরা সকলেই জান যে মস্তকই দেহের অতি প্রয়োজনীয় এবং প্রধান অঙ্গ। কারণ এখানেই সকল ইন্দ্রিয়সমূহের মূলাধার মস্তিষ্কের স্থিতি। আমরা যে কর্ণদ্বারা শ্রবণ করি, নাসিকাদ্বারা আঘ্রাণ করি, চক্ষুদ্বারা দর্শন করি, জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন করি, এ সমস্তই মস্তকের অংশ। মস্তকের সম্মুখের ভাগে মুখমণ্ডল। মুখদ্বারা দেহে খাদ্য, বায়ু এবং জল প্রবেশ করে এবং তাহাতেই শরীর পুষ্ট হয়।

মাথার খুলি অস্থির একটী ডিম্বাকৃতি মালাবিশেষ। স্থূলচক্ষে দেখিলে ইহা বৃহৎ একখণ্ড অস্থি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক ৮টী পৃথক অস্থিখণ্ডদ্বারা উহা গঠিত। ৩ নং চিত্রটীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেই অনেকটা বুঝিতে পারিবে। এই আটটী অস্থি-খণ্ডের পৃথক পৃথক নাম আছে। যথা ঃ—



৩ নং চিত্র—করোটী।

ললাটাস্থি বা সম্মুখ-কপালাস্থি (Frontal bone)...এক।

পার্শ্ব-কপালাস্থি (Parietal bones) ...দুই।

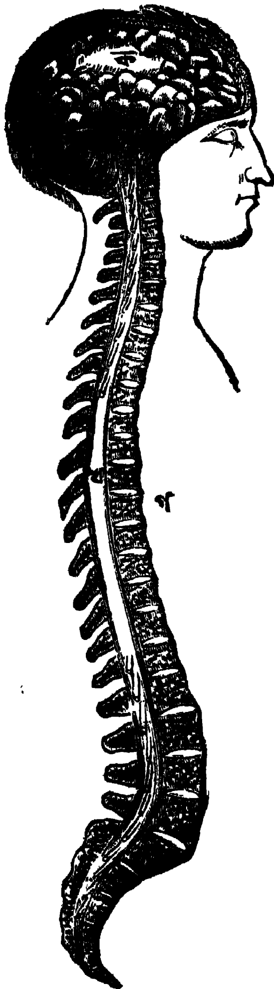
শঙ্খাস্থি বা রগ-সন্নিধানাস্থি (Temporal bones)...দুই।

পশ্চাৎ-মস্তকাস্থি (Occipital bone) ...এক।

কীলকাস্থি বা কোণাস্থি (Sphenoid bone)...এক।

ঝাঁজরাস্থি বা বহুচ্ছিদ্রাস্থি (Ethmoid bone)...এক।

ললাটাস্থি বা সম্মুখ-কপালাস্থি (forehead) দ্বারা মস্তকের সম্মুখভাগের ছাদ অর্থাৎ কপাল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই অস্থিখণ্ড যত উচ্চ হয় ততই ভিতরে মস্তিষ্কের স্থানাধিক্যবশতঃ উহার বৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করে। তবে কপাল উচু হইলেই যে বুদ্ধিমান হইবে এমন নয়, কারণ মস্তিষ্কের ব্যবহারেই বুদ্ধির প্রখরতা বৃদ্ধি পায়, আয়তনে নহে।



৪ নং চিত্র—মেরবিক স্নায়ু-রজ্জু। ক—মস্তিষ্ক, খ—স্নায়বীক রজ্জু, গ—মেরুদণ্ড।

পার্শ্ব-কপালাস্থি (Parietal bones) করোটীর পশ্চাৎ হইতে আরম্ভ করিয়া উপরিভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত দুইখণ্ড বৃহৎ অস্থিবিশেষ। ইহাদের দ্বারাই প্রধানতঃ মস্তিষ্ক-গহ্বরের ছাদ নির্ম্মিত হইয়াছে।

শঙ্খাস্থি বা রগ-সন্নিধানাস্থি (temples) কপালের পার্শ্বদ্বয় হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

পশ্চাদস্থি (Occipital bone) মস্তকের পশ্চাদ্ভাগস্থ নিম্নদেশে অর্থাৎ ঠিক ঘাড়ের উপরে অবস্থিত। ইহা মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের নিম্নদেশে বহু-দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই অস্থিটীর নিম্নভাগে প্রায় দেড় ইঞ্চি পরিমিত একটী ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র পথে মস্তিষ্ক হইতে মেরুদণ্ড বা পিঠের দাঁড়ার অস্থির ভিতর দিয়া শাদা মজ্জা একটী লম্বা দড়ীর মত হইয়া চলিয়া গিয়াছে (৪নং চিত্র দেখ)। এই মেরু বা মজ্জাকে মেরবিক স্নায়ুরজ্জু বা স্নায়বীকরজ্জু (Spinal Cord) বলে।

কীলকাস্থি (Sphenoid or wedge bone) করোটীর অধোভাগে অর্থাৎ মুখমণ্ডলের অস্থি এবং মস্তিষ্কের চতুষ্পার্শ্বস্থ অস্থিসমূহ এই উভয়ের মধ্যভাগে অবস্থিত। বস্তুতঃ উহা ঘাড়ের চারিদিকে যেখান হইতে চুল উঠিতে আরম্ভ হয় সেই স্থান হইতে চক্ষুকোটর এবং নাসিকার নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা একটী অসমাকৃতি অস্থি এবং তোমাদের বুঝিবার পক্ষে বড়ই কঠিন।

ঝাঁজরাস্থি (Ethmoid or seive-like bone) চালনীর ন্যায় সচ্ছিদ্র হাড়বিশেষ। ইহা মুখমণ্ডলের অস্থি ও মস্তকের মালার অস্থি এতদুভয়ের মধ্যভাগে ঠিক নাসিকার মূলদেশে অবস্থিত। ললাটাস্থি ও পার্শ্বাস্থি প্রভৃতি যেমন মস্তকের ছাদরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তেমনি এই ঝাঁজরিসদৃশাস্থি উহার মেজেরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অস্থির ছিদ্রগুলি দিয়া মস্তিষ্ক হইতে নাসিকা গহ্বরে গন্ধবহা শিরা সকল প্রবাহিত হইতেছে।

উল্লিখিত আটটী অস্থির সংযোজনাদ্বারা করোটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই অস্থিগুলির সংযোগ স্থানের তরঙ্গায়িত রেখাগুলি পাশাপাশি অবস্থিত দুইখণ্ড অস্থির মিলন বা সন্ধিজ্ঞাপক। দুই-খানা করাতের মুখ পরস্পর মিলিত হইয়া একের দাঁত অপরের দাঁতের ভিতর প্রবিষ্ট হইলে যে প্রকার হয়, এই সন্ধিগুলিও সেই-রূপ। ৩নং চিত্রটীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। এই জোড়গুলি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় হইতে থাকে। শিশুদিগের অস্থি কোমল এবং, পরস্পর সংযুক্ত নয়; কিন্তু প্রত্যেক হাড়ের ধারগুলিতে খাঁজ কাটা। শিশুদিগের মস্তকে এই খাঁজগুলি

পরস্পর স্পর্শ করিয়া আছে মাত্র, কিন্তু পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের মস্তকে এই খাঁজগুলি একেবারে কাপে কাপে বসিয়া যায় এবং আঁট হইয়া লাগিয়া থাকে।

শিশুর বয়স যখন চারি বৎসর হয় তখন এই জোড়ের মুখ-গুলি পরস্পর লাগিতে আরম্ভ হয় এবং সাত বৎসর পূর্ণ হইলে একেবারে আঁটিয়া যায়। এজন্য ছোট ছেলেকে কাণমলা দেওয়া কিম্বা মাথায় ঘুসি বা কোন আঘাত দেওয়া অতিশয় নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ। কারণ শিশুদিগের হাড় সাধারণতঃ কোমল থাকে। কাজেই খুলিতে কোনরূপ আঘাত পাইলে মস্তিষ্কের এমন অনিষ্ট হইতে পারে যাহা চিকিৎসাতেও কখন আর আরোগ্য না হইতে পারে। ছোট শিশুদিগকে সর্ব্বদা এক কাতে শুইতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ উহাতে মাথার একদিকেই কেবল বালিসে চাপা থাকে। ইহাতে একদিকের হাড় অপরদিগের হাড় হইতে ছোট হইয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে মস্তিষ্কেরও অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

(৩) মুখমণ্ডল ও তদস্থি (Face)

মুখমণ্ডলে নিম্নলিখিত ১৪ খানা অস্থি আছে, যথা :—

নাসাস্থি (Nasal bone)...দুই।
পেঁচাল অস্থি (Inferior Turbinated)...দুই।
আশ্রবাস্থি (Lachrymal bone)...দুই।
ফালাকারাস্থি বা নাসারন্ধ্রাস্থি (Vomer bone)...এক।
গণ্ডাস্থি (Malar bone)...দুই।
ঊর্দ্ধহন্বস্থি (Upper Maxillary bone)...দুই।
তালব্যাস্থি (Palate bone)...দুই।
অধঃহন্বস্থি (Lower Maxillary bone)...এক।

নাসাস্থি (nose bones)—এই দুইখানা হাড় নাকের উপরের অংশ বা নাসিকাদণ্ডরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ৩ নং চিত্রটির প্রতি একবার লক্ষ্য করিয়া দেখ।

পেঁচাল অস্থি (Inferior Turbinated or scroll-like bones)—এই হাড় দুইখানা নাকের ভিতরে থাকে। এ হাড়গুলি পাকান অর্থাৎ এমনভাবে পেঁচাল যে উহাতে নাসারন্ধ্রে বায়ু-প্রবেশ-পথের দৈর্ঘ্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। বায়ুপ্রবেশের পথ এতটা লম্বা হওয়ার বিশেষ আবশ্যক এই যে আমরা যে নিশ্বাস গ্রহণ করি তাহা নাকের এই ঘুরান রাস্তা দিয়া প্রবেশ করিলে ফুস্ফুস্ পর্য্যন্ত পঁহুছিতে অনেকটা সময় লাগে এবং বায়ু এইরূপে দেহের ভিতরে অধিক কাল থাকাতে ক্রমশঃ গরম হইয়া ভিতরে ঢুকে। ইহাতে ফুস্ফুসে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া অনিষ্ট ঘটিতে পারে না। এজন্য আমাদের মুখ দিয়া নিঃশ্বাস গ্রহণ না করিয়া সর্ব্বদাই নাক দিয়া নিঃশ্বাস নেওয়া উচিত।

অশ্রূৎপাদকাস্থি (Lachrymal or tear bones)—এই দুইখানি ক্ষুদ্র অস্থিময় নালী চক্ষুকোটর হইতে নাসারন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। উহারা যেন চক্ষু হইতে নাসা পথে অশ্রু বহিয়া আনিবার দুইটী জল-প্রণালীবিশেষ। তোমরা অধিক কাঁদিবার সময় যে চক্ষের জল মুছিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত নাক ঝাড়িতে থাক তাহার কারণ বোধ হয় এইবারে বুঝিতে পারিলে। কাঁদিবার সময় যে তোমাদের নাক দিয়া জল পড়ে তাহার কারণ এই যে চক্ষু হইতে যে জল নিঃসৃত হয় তাহা এই

অস্থিময় নালীদ্বয় দিয়া প্রবাহিত হয় এবং সেই সময় কতক জল নাক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

নাসারন্ধ্রাস্থি (Vomer or ploughshare-bone)—ইহা নাসারন্ধ্রদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান স্বরূপ পাতলা অস্থিবিশেষ। ইহার আকৃতি লাঙ্গলের ফালের ন্যায়। ৩ নং চিত্রটীতে এই হাড়টী দেখিতে পাইতেছ না, কারণ উহা নাসিকার ভিতরে অবস্থিত। নাক বড়, ছোট এবং লম্বা বা খাট হওয়া না হওয়া সবই এই অস্থিটীর উপর নির্ভর করে।

গণ্ডাস্থি (Malar or cheek-bone)—৩নং চিত্রটীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেই ইহার অবস্থান বুঝিতে পারিবে। কোন কোন জাতির গালের হাড় খুব উচু। বাস্তবিক অনেক সময় মুখমণ্ডলের অস্থির গঠন ও আয়তনের বিভিন্নতাদ্বারা জাতির পরিচয় হয়।

ঊর্দ্ধহন্বস্থি (Upper Maxillary or jaw-bone)—ইহাকে প্রধান হন্বস্থি বা অগ্রমাঢ্যস্থিও বলে। উপর চোয়ালের এই হাড় দুইটীতেই উপর পাটির দাঁতগুলি বসান থাকে। চিবুকের এই এক একটী হাড়ে পূর্ণবয়স্ক লোকের ৮টি করিয়া দাঁত থাকে। উপর চোয়ালের এই হাড় দুখানা অনড় অর্থাৎ চিবাইবার সময় উহা ঠিক একভাবে থাকে একটুও নড়চড় হয় না।

তালব্যাস্থি (palate forming roof of the mouth)—তালুর অস্থির বিষয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। কারণ মুখের ভিতরে উপরের দিকে আঙ্গুল দিলেই তালুর হাড়ে ঠেকিবে। এই তালুর হাড় দুইটী দুইদিক হইতে আসিয়া মাঝখানে

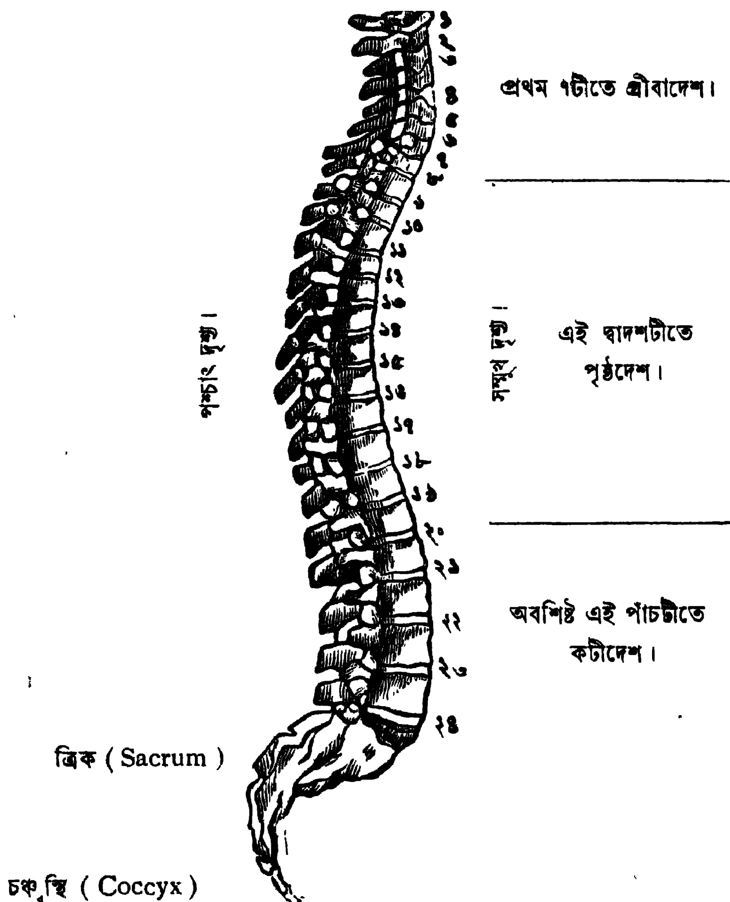
জোড়া লাগিয়াছে। এক জন হাঁ করিয়া থাকিলে তাহার তালুর দিকে চাহিলেই ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবে।

অধঃহন্বস্থি (Lower Maxillary or jaw-bone)— অধোমাড়ীতে নিম্নদন্তপাটী প্রোথিত থাকে। ইহাতে ১৬টী দাঁত আছে। নীচের চিবুকের এই হাড়টী উপরে নীচে এবং এ পাশ ও পাশে ইচ্ছানুযায়ী নড়াচড়া করিতে পারে। চিবাইবার সময় দেখিতে পাইবে যে উপর চোয়ালটী নড়া চড়া না করিয়া ঠিক একভাবে থাকে আর নীচের চোয়ালটী যেমন ইচ্ছা তেমনি নড়ে। কাণের কাছে দুই চোয়ালের সংযোগ স্থান।

(৪) মেরুদণ্ড (**Vertebral column or Spine**)

দেহকাণ্ড (The Trunk) বা ধড় মস্তককে ধারণ করিয়া আছে। হস্ত এবং পদও এই দেহকাণ্ডেই সংলগ্ন হইয়া আছে। ইহার দুইটী প্রকোষ্ঠ বা গহ্বর আছে। উহার উর্দ্ধাংশ বক্ষঃস্থল (thorax or chest) এবং নিম্নাংশ কুক্ষি (abdomen) বা উদর। দেহকাণ্ডে সর্ব্বসমেত ৫৩টী অস্থি আছে। তন্মধ্যে গলদেশে ৭টী, বক্ষঃস্থলে ৩৭টী এবং কুক্ষিতে ৯টী।

দেহকাণ্ডের মূল অস্থি মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া। ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ডদ্বারা গ্রথিত একখানি অস্থিমালা-বিশেষ (৫ নং চিত্র দেখ)। ইহার প্রত্যেক খণ্ডের নাম কশেরুকা (Vertebra)। এই গ্রন্থিল দণ্ড বা পৃষ্ঠবংশ (spine) চারি প্রদেশে বিভক্ত, যথা—গ্রীবা, পৃষ্ঠ, কটী এবং ত্রিক (Sacrum)। প্রত্যেক



৫নং চিত্র—মেরুদণ্ড।

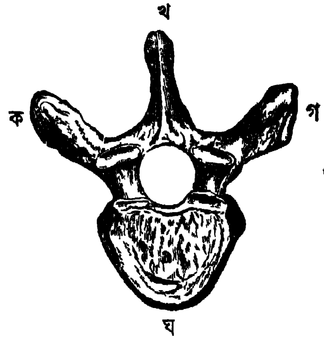
কশেরুকাকে একটী কাঠিমের (reels of cotton) সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ইহাদের একটীর উপর একটী

দণ্ডায়মানভাবে অবস্থিত। এইরূপে কশেরুকাগুলির পরস্পর সংযোগে একভাগে একটী নালী এবং অপর ভাগে একটী নিরেট দণ্ড গঠিত হইয়াছে (৫ নং চিত্র দেখ)। এই নালী স্নায়বীয় মজ্জায় পূর্ণ থাকে (৪ নং চিত্র)।

মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়ার (back-bone) সর্ব্বসমেত ৩৩টী অস্থি বা কশেরুকা আছে। তন্মধ্যে প্রথম ৭টী গ্রীবাদেশে, তৎপরের ১২টী পৃষ্ঠদেশে। পৃষ্ঠদেশস্থিত কশেরুকার সহিত পঞ্জর সংলগ্ন। ইহার নিম্নে কটীদেশে ৫টী কশেরুকা আছে। ইহাদের সহিত পঞ্জর সংলগ্ন নাই। কটীদেশের কশেরুকার অব্যবহিত পরেই আরো ৫টী কশেরুকা আছে। ইহারা শৈশবাবস্থায় পৃথক থাকে বটে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে একীভূত হইয়া একখণ্ড অস্থিরূপে পরিণত হয়। এই অস্থি খণ্ডের নাম ত্রিকাস্থি (Sacrum)। সর্ব্ব নিম্নে ৪টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি। অন্যান্য জীবের এখান হইতেই লাঙ্গুলের উৎপত্তি। এই অস্থিগুলি ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। এগুলিও শৈশবাবস্থায় পৃথক পৃথক থাকে। কিন্তু কিছুকাল পরেই এক খণ্ড অস্থিতে পরিণত হয়।

কশেরুকার অস্থি অসমাকৃতি। প্রত্যেক কশেরুকার কতক গুলি প্রবর্দ্ধন (processes) আছে। তন্মধ্যে তিনটীই প্রধান (৬ নং চিত্র দেখ)। কশেরুকার কেন্দ্রস্থিত নিরেট অংশকে উহার "দেহ" কহে। এই দেহের উপরের দিক খোল অর্থাৎ একটু গর্ত্তের ন্যায়। এই অংশ উপাস্থিময় (cartilagenous)। একটী কশেরুকা অপর কশেরুকার এই উপাস্থিময় অংশে যুক্ত

হইয়া থাকে। কশেরুকার যে অংশ বলয়াকার বা ফাঁপা তাহাকে "স্নায়বীয় খিলান" বলে। চিত্রস্থিত 'খ' প্রবর্দ্ধনটী এই স্নায়বীয় খিলানের মধ্যভাগ হইতে বহির্গত হইয়াছে। ইহার দুই পাশে দুইটী (চিত্রস্থ ক ও গ) সংযোগ-প্রবর্দ্ধন আছে। উহারা দুইটী বাহ্যাভিমুখে প্রবাহিত অনুপ্রস্থ প্রবর্দ্ধন (transverse process)। ইহাদের প্রান্তস্থিত অণ্ডাকৃতি অংশের সহিত পঞ্জরাস্থি বা পর্শুকার মুণ্ড সংযুক্ত থাকে।



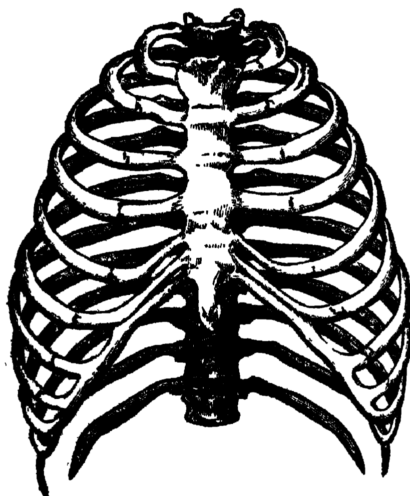
৬নং চিত্র—কশেরুকা (Vertebra)
ক ও গ—সংযোগ—প্রবর্দ্ধন (transverse processes), খ—মেরবীক প্রবর্দ্ধন (spinus process), ঘ—দেহ, মধ্যভাগের গোল অংশ—স্নায়বীয় খিলান।

কশেরুকার প্রত্যেকটীর আকৃতি ও ব্যবহারে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। গ্রীবাদেশের প্রথম কশেরুকাটী কটীদেশের পঞ্চম কশেরুকার তুলনায় অতিক্ষুদ্র। নীচের কশেরুকাগুলি যাহাতে উপরের কশেরুকাগুলির ভার বহন করিতে পারে এজন্য আয়তনে বৃহৎ এবং অধিক মজবুত। আবার দেখ আমরা গলা কেমন দ্রুত এবং অক্লেশে নড়াইতে পারি। আমাদের মাথা আমরা কেমন এপাশ ওপাশে ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি। উচু নীচু করিতে পারি, পিঠের দিকে হেলাইতে পারি এবং সম্মুখের দিকে নোয়াইয়া বুকে চিবুক ঠেকাইতে পারি। ইহার কারণ এই যে গলার হাড়গুলি অতি ছোট এবং

তুলনায় অনেকগুলি। বিশেষতঃ গলার প্রথম দুইটী হাড়ের গড়ন অপরগুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এইজন্যই এত সহজে পাশ ফিরান যায়। কিন্তু পিঠের গড়ন ওরূপ নয় বলিয়াই গলার মত এপাশ ওপাশ ফিরাইতে পারা যায় না।

(৫) বক্ষঃপঞ্জর (The Ribs)

পৃষ্ঠদেশের বিপরীতদিকে মেরুদণ্ডের ন্যায় অপর একখানি গ্রন্থিল অস্থি আছে তাহার নাম বক্ষাস্থি (Sternum)। তোমরা সকলেই জান যে গলার সম্মুখের দিকে দুই কণ্ঠার ঠিক মধ্যস্থলে একটী গর্ত্ত বা ক্ষুদ্র খাঁজ আছে। এই খাঁজটীতে বৃদ্ধাঙ্গুলীর চাপ দিয়া যদি হাত খানা বুকের উপরে রাখ তাহা হইলে কড়ে আঙ্গুলটী ঠিক বক্ষাস্থির শেষভাগে পড়িবে।



৭ নং চিত্র—বক্ষঃ-পঞ্জর।

পৃষ্ঠদেশস্থ ১২টী কশেরুকার প্রত্যেকটীর সহিত একজোড়া করিয়া লম্বা, চ্যাপটা এবং বাঁকান হাড় আছে তাহাদিগকে পর্শুকা (ribs) বা পঞ্জরাস্থি বলে। এই পর্শুকা

বা পঞ্জরাস্থির একদিক মেরুদণ্ডের পৃষ্ঠদেশস্থ কশেরুকার সহিত এবং অপরদিক বক্ষাস্থির সহিত সংযুক্ত থাকে (৭নং চিত্র দেখ)।

বক্ষাস্থির ঊর্দ্ধভাগ অর্থাৎ যে ভাগ গলার দিকে থাকে তাহা ফোঁপড়া (spongy) এবং নিম্নভাগ অর্থাৎ চলিত ভাষায় যাহাকে 'বুকের কড়া' বলে তাহা উপাস্থিময় (cartilage)। কশেরুকা, বক্ষাস্থি এবং পর্শু কাদ্বারা বক্ষঃপঞ্জর গঠিত হইয়াছে। ইহাদ্বারাই বক্ষোগহ্বর (thorax) স্থিত ফুস্ফুস্ ও হৃৎপিণ্ড সুরক্ষিত থাকে।

মানবদেহে ১২ জোড়া অর্থাৎ ২৪টী পর্শুকা আছে। ইহার মধ্যে ঊর্দ্ধদিকের অর্থাৎ গলার দিক হইতে ৭ জোড়া পর্শুকা তাহাদের নিম্নপ্রান্তস্থিত উপাস্থিদ্বারা বক্ষাস্থির সহিত যুক্ত এজন্য এই ১৪টী পর্শুকাকে প্রকৃত পর্শুকা (true ribs) বলে এবং নিম্নদিকের অপর ৫ জোড়া পর্শুকা বক্ষাস্থির সহিত মিলিত নয় বলিয়া (৭নং নং চিত্র দেখ) উক্ত ১০টী পর্শুকাকে অপ্রকৃত পর্শুকা (false ribs) বলে। অপ্রকৃত পর্শুকার মধ্যে আবার ১১ ও ১২ নং অর্থাৎ সর্ব্বনিম্নস্থ পর্শুকা দুইটী সম্মুখের দিকে কাহারো সহিত যুক্ত না হইয়া একেবারে অলগ্ন রহিয়াছে (৭নং চিত্র দেখ)। এজন্য উহাদিগকে প্লবমান পর্শুকা (floating ribs) বলা হয়।

তোমাদের মধ্যে যাহারা মাংস খাইতে ভালবাস তাহারা জান যে পাঁঠার বুকের দিকের হাড়গুলি এবং ছাটনির হাড়গুলির ধারের দিক খাইতে কেমন ভাল লাগে এবং অতি সহজে

চিবাইতে পারা যায়। এই অংশগুলি উপাস্থিময় বলিয়াই এত নরম। চলিত ভাষায় পঞ্জরাস্থিকেই 'ছাতি' বলে এবং বক্ষাস্থির কোমল অংশগুলিকে 'কচ্‌কচে' বলে।

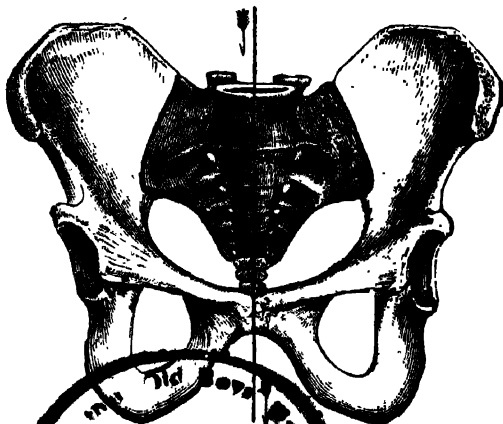
পঞ্জরাস্থিগুলির একদিক পৃষ্ঠদেশের কশেরুকার সহিত এমন ভাবে সংযুক্ত থাকে যে উহারা অনায়াসে অধঃঊর্দ্ধ ভাবে নড়িতে পারে। একটী পর্শুকা হইতে অপর পর্শুকার মধ্যে যে ব্যবধান আছে সেই স্থানগুলি পাতলা অথচ দৃঢ় মাংসপেশী দ্বারা আবৃত থাকে। একস্তর মাংসপেশী পর্শুকাগুলিকে উত্তোলিত করে। অপর স্তর উহাদিগকে অবনমিত করে। ইহাতেই পঞ্জরাস্থি উঠা নামা করে। প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সময় ইহা স্পষ্ট দেখা গিয়া থাকে। পঞ্জরাস্থিগুলি যখন ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় তখন বক্ষো-গহ্বর বিস্তারিত হয়, এবং সেই সময় এই বক্ষোগহ্বরস্থিত ফুস্‌ফুস্‌ও স্ফীত হইয়া এক দমক বাতাস্ ভিতরে টানিয়া লয়। পর মুহূর্ত্তেই পঞ্জরাস্থিগুলি অবনমিত হয় এবং তদ্দ্বারা বক্ষোগহ্বর সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তখন ফুস্‌ফুসে চাপ লাগিয়া কতক বায়ু মুখ ও নাসারন্ধ্র দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। ইহাতেই নিঃশ্বাস প্রশ্বাস-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে।

(৬) বস্তিদেশ

(The Body Basin or the Pelvis)

দেহকাণ্ডের সর্ব্বনিম্নভাগে অর্থাৎ তলপেটে চারিখানা নিশ্চল দৃঢ়বদ্ধ অস্থির সংযোগে বস্তিকোটর (pelvis) নির্ম্মিত হইয়াছে। এই চারিখানি হাড় এমন ভাবে সংলগ্ন যেন দেখিতে ঠিক একটী

জলপাত্রের ন্যায় বোধ হয় (৮ নং চিত্র দেখ)। কেবল তফাৎ এই যে উহার তলা নাই। এই চারিখানি অস্থির দুখানা উরু-সন্ধির



৮ নং চিত্র—বস্তিদেশ।

নির্নামাস্থি [("Nameless bone" (ossa innominata)]; একখানা ত্রিকাস্থি (Sacrum) এবং অপরখানি পৃষ্ঠবংশের অধঃস্থ চঞ্চ্বস্থি (coccyx)। বস্তুতঃ ত্রিকাস্থি ও উভয় পার্শ্বস্থ নির্ণামাস্থি দ্বারা বস্তিপ্রদেশ গঠিত। নির্ণামাস্থিদ্বয়ের বহির্ভাগে দুইটী কোটর আছে। এই অস্থি-গহ্বর বা স্থালীর মধ্যে ঊর্ব্বাস্থির (thigh bone) ঊর্দ্ধ প্রান্তস্থিত গোলার ন্যায় মুণ্ড প্রবিষ্ট হইয়া উরুসন্ধি বা 'কুঁচকি' নির্ম্মাণ করে।

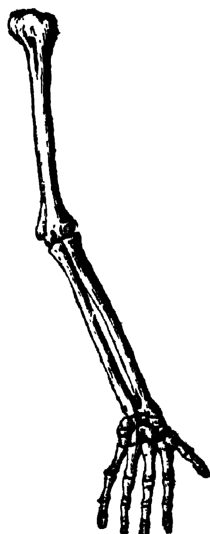
তোমরা পূর্ব্বে জানিয়াছ যে মস্তিষ্ক একটী সুদৃঢ় হাড়ের বাক্স-সদৃশ করোটীর ভিতর (৩ নং চিত্র দেখ) এবং হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুস্‌ফুস্ বক্ষঃপঞ্জরাস্থিদ্বারা (৭ নং চিত্র দেখ) সুরক্ষিত। স্নায়বীয়

মজ্জা যাহা দেহকে মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত করে তাহাও মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়ার কশেরুকার ভিতরে সুদৃঢ় আবরণে আবৃত থাকে (৪ নং চিত্র দেখ)। এইরূপ দেহের অত্যাবশ্যক অংশগুলি বিশেষভাবে সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে। এই বস্তিকোটরও অনেক গুলি কোমল যন্ত্রের (tender organs) সুদৃঢ় আবরণ স্বরূপ। তবে অন্য যন্ত্রের আবরণ হওয়া ব্যতীত ইহার আর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। তাহা এই যে উহা সমস্ত দেহের ভারকেন্দ্র স্বরূপ। যদি বস্তিদেশ না থাকিত তবে আমাদের দুখানা পাও হইতে পারিত না। কারণ বস্তিদেশ না থাকিলে মেরুদণ্ড লম্বাভাবে নীচে নামিয়া আসিত; তাহাতে পা বসাইবার স্থান থাকিত না। তাহা হইলে আমাদিগকে সাপ বা মাছের মত দেখাইত। ১ ও ৪ নং চিত্রের প্রতি চাহিয়া দেখিলেই এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে। আমাদের পা দুখানা যেন দুটী থাম। সেই থামের উপর বস্তিদেশ যেন ঠিক একটী সাঁকোর ন্যায় অবস্থিত আছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি মেরুদণ্ডের তলভাগের কশেরুকা সমূহ উপরিভাগের কশেরুকা হইতে সুদৃঢ় এবং বৃহৎ। উহাদিগকে উপরের অস্থি সমূহের ভার বহন করিতে হয় বলিয়াই উহাদের অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। এই কারণেই বস্তি-দেশের অস্থিসমূহও অধিক দৃঢ় এবং পুষ্ট। কারণ উহাকে সমস্ত দেহের ভার বহন করিতে হয়। আবার দুখানা পা সেই সমস্ত ভার সমান দুইভাগে বহন করিয়া থাকে।

(৭) হস্ত (The Arms)

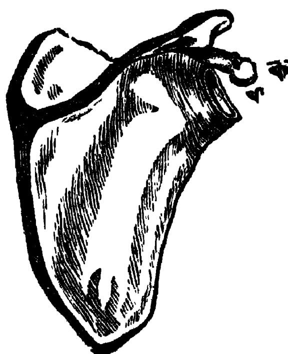
তোমরা সকলেই জান যে আমাদের দুইখানা বাহু (কাঁধ হইতে কনুই পর্য্যন্ত যে অংশ), দুইখানা প্রকোষ্ঠ (কনুই হইতে কব্জি পর্য্যন্ত যে অংশ) এবং দুইখানা কর আছে। কিন্তু একথা নিশ্চয়ই জান না যে এই দুখানা করিয়া বাহু, প্রকোষ্ঠ ও কর গড়িতে এক এক দিকে ৩২ খানা করিয়া মোট ৬৪ খানা হাড় লাগিয়াছে। ঊর্দ্ধশাখা (upper limbs) বা হস্তদ্বয় স্কন্ধদ্বারা দেহ-কাণ্ডের সহিত সংলগ্ন (১ নং চিত্র দেখ)। স্কন্ধ, ফলকাস্থি ও কণ্ঠাস্থি এই দুইখানা অস্থিদ্বারা গঠিত। এক এক হস্তে যে ৩২ খানা করিয়া অস্থি আছে তাহার নাম নিম্নে দেওয়া গেল। যথা ঃ—



৯ নং চিত্র—হস্ত (arm)।

বাহু (upper arm)	১ ফলকাস্থি বা স্কন্ধাস্থি (Scapula)
	১ জত্রুস্থি বা কণ্ঠাস্থি (Clavicle)
	১ প্রগণ্ডাস্থি বা ভুজাস্থি (Humerus)
প্রকোষ্ঠ (fore-arm)	১ কূর্পরাস্থি বা কফোণি অস্থি (Ulna)
	১ দণ্ডাস্থি বা চক্রদণ্ডাস্থি (Radius)
কর (hand) ...	৮ মণিবন্ধাস্থি (Carpal bones)
	৫ করভাস্থি (Metacarpal bones)
	১৪ পংক্তি বা অঙ্গুলাস্থি (Phalanges)

ফলকাস্থি (Scapula or shoulder-blade)—১০ নং চিত্রটীর প্রতি একবার চাহিয়া দেখ। এই ফলকাস্থি বা স্কন্ধের হাড় চ্যাপ্‌টা এবং ত্রিকোণাকৃতি-বিশিষ্ট। উহার সরুদিকটা নীচের দিকে থাকে। এই হাড়খানা বক্ষঃ-পঞ্জরের ঠিক বাহিরে এবং বক্ষঃ-গহ্বরের (thorax) পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত। ইহার একদিকটা একটু পুরু এবং তাহার ধারে একটু গর্ত্তের ন্যায় আছে, তাহাতে ভুজাস্থি প্রবিষ্ট থাকে (চিত্রের খ অংশ) এবং উহার উপরিভাগে কণ্ঠাস্থির সংযোগস্থল (চিত্রের ক অংশ)।

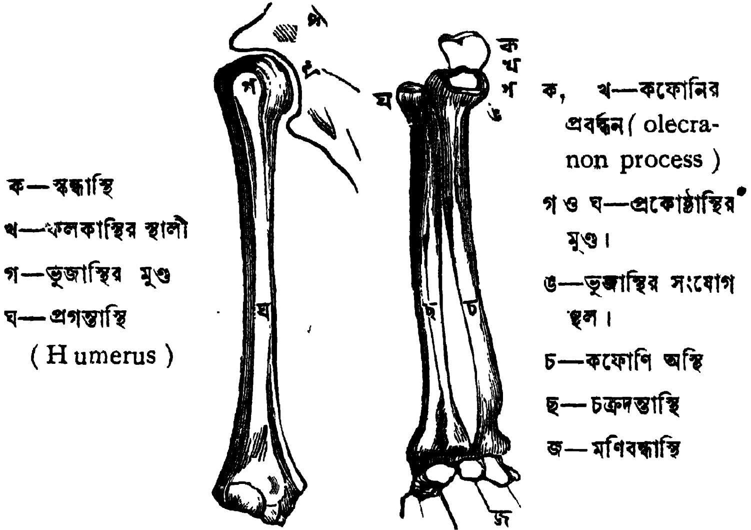


১০ নং চিত্র—ফলকাস্থি (Scapula)।

কণ্ঠাস্থি (Clavicle or collar-bone)—কণ্ঠার এই হাড়খানি একটী লম্বা বক্রাকার অস্থি। ইহার একদিক বক্ষাস্থির উপরিভাগে সংযুক্ত (১ নং চিত্র দেখ) এবং অপর দিক ভুজাস্থি ও ফলকাস্থির সংযোগস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই কণ্ঠাস্থি এক-খানি খিলানের ন্যায় ফলকাস্থি, বক্ষাস্থি ও ভুজাস্থিকে স্বস্থানে রক্ষা করিতেছে।

ভুজাস্থি (Humerus or upper arm bone)—ইহা বাহুদেশের একটী লম্বা, সুদৃঢ় ফাঁপাল হাড়। ইহার উভয় প্রান্ত দুইটী মধ্যভাগ হইতে স্থূল। ইহার উপরের দিক গোলাকার মুণ্ডের ন্যায় এবং নিম্ন প্রান্ত সম্মুখ এবং পশ্চাদ্ভাগে চাপা

(১১ নং চিত্র দেখ)। ঊর্দ্ধদিকস্থ গোলাকার মুণ্ড ফলকাস্থির গহ্বর বা স্থালীর (socket) মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সন্ধি নির্ম্মাণ



১১ নং চিত্র—বাহুর অস্থি খণ্ড। | ১২ নং চিত্র—প্রকোষ্ঠের অস্থিদ্বয়।

করে। তোমরা যদি কখনও কাহারো কাঁধের হাড় ভাঙ্গিয়া বা মচ্‌কিয়া যাইতে শুনিয়া থাক তবে বুঝিতে হইবে যে এই ভুজাস্থির গোলার ন্যায় মুণ্ড ফলকাস্থির গহ্বর বা স্থালীর ভিতর হইতে সরিয়া গিয়াছে। চাপ দিয়া উহা পুনরায় স্বস্থানে বসাইয়া দিলেই সারিয়া যাইবে।

কফোণি অস্থি (Ulna or elbow bone)—দুইটা লম্বা অস্থিদ্বারা প্রকোষ্ঠ (fore-arm) গঠিত হইয়াছে। এই দুইখানা হাড়ের মধ্যে যেটা অধিক লম্বা (১২ নং চিত্র দেখ)

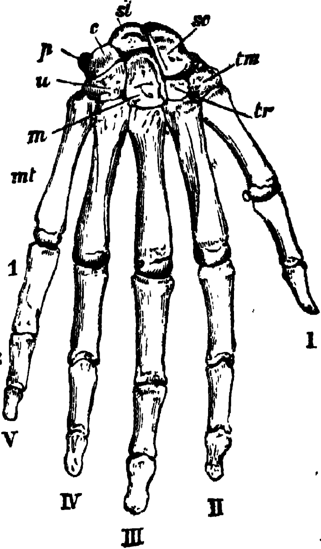
সেইটিই কফোণি অস্থি (Ulna)। ইহার একদিকে একটি গোলাকার মুণ্ড এবং ইহাই কনুই এবং ভুজাস্থির সহিত কব্জার ন্যায় এমনভাবে সংযুক্ত যে এই হাড়খানা সম্মুখের দিকে যেরূপ কাঁধ পর্য্যন্ত গুটান যায় পিছনের দিকে সেইরূপ পারা যায় না।

চক্রদণ্ডাস্থি (Radius or spoke bone)—ইহা প্রকোষ্ঠের লম্বা ঈষৎ বক্র অস্থিখণ্ডবিশেষ। ইহা কফোণি অস্থি হইতে খাট এবং ইহার আকার অনেকটা গাড়ীর চাকার দন্তের ন্যায়। ইহার উপর প্রান্তে একটী বাটির ন্যায় গর্ত্ত আছে। ইহার ঊর্দ্ধদিক কফোণি অস্থি (Ulna) এবং ভুজাস্থি (Humerus) এই উভয়ের সহিত সংযুক্ত এবং নিম্নদিক ঊর্দ্ধদিক হইতে বৃহৎ এবং মণিবন্ধ (wrist) বা কব্জির অস্থি সমূহের সহিত সংবদ্ধ (১২ নং চিত্রের 'জ' অংশ দেখ)।

মণিবন্ধাস্থি (Carpal or wrist bone)—কব্জির এই ৮ খানি হাড় ৪ খানা করিয়া দুই সারিতে সজ্জিত আছে। ১৩ নং চিত্রটীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। ইহারা পরস্পর মাংস-শিরা বা বন্ধনি (ligaments) দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত।

কর তিনভাগে বিভক্ত, যথা—(ক) কব্জি বা মণিবন্ধ, (খ) করতল বা হাতের তালু এবং (গ) অঙ্গুলিসমূহ। এই মণিবন্ধাস্থি হইতে কর আরম্ভ হইয়াছে। মণিবন্ধাস্থির একদিক কফোণি অস্থি ও চক্রদণ্ডাকার অস্থির শেষভাগে এবং অপরদিক করতলের অস্থির সহিত বন্ধনিদ্বারা সংযুক্ত।

করভাস্থি (Metacarpal or palm bones)—হস্ততল ৪খানা দীর্ঘাকার এবং ১খানা খর্ব্বাকার অস্থিদ্বারা গঠিত। এই অস্থিকেই করভাস্থি বলে (১৩ নং চিত্র দেখ)। উহারা চর্ম্ম ও মাংসদ্বারা এক সঙ্গে আবৃত থাকে। ইহাদের একদিক মণিবন্ধাস্থির শেষভাগে এবং অপর দিক অঙ্গুলাস্থির সহিত সংযুক্ত আছে। হাতের তালুর প্রত্যেকটী হাড় একটী করিয়া অঙ্গুলি ধারণ করে, যথা—



১৩ নং চিত্র—কর (পৃষ্ঠ ভাগ)।

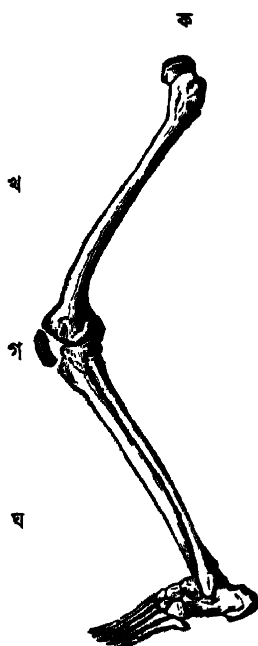
I—অঙ্গুষ্ঠ (বৃদ্ধাঙ্গুলি), II—তর্জ্জনী, III—মধ্যমা, IV—অনামিকা ও V—কনিষ্ঠা।

অঙ্গুলাস্থি (Phalanges or finger bones)—আমাদের পাঁচটী আঙ্গুলের মধ্যে বুড়ো আঙ্গুল ছাড়া অপর চারিটীতে ৩টী করিয়া হাড় আছে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে মাত্র ২টী করিয়া হাড় আছে। ১৩ নং চিত্রের 'গ' অংশের প্রতি চাহিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। হাত মুঠা করিয়া ধরিলেই দেখিতে পাইবে যে ঐ হাড়গুলি কেমন তিনটী পংক্তিতে সাজান আছে।

মণিবন্ধ, হস্ততল এবং অঙ্গুলিসমুহের হাড়গুলি দৃঢ় এবং নমনীয় (flexible) বন্ধনিদ্বারা এমন ভাবে সংযুক্ত যে উহারা সূক্ষ্ম সূচী কার্য্য হইতে হাতুড়ির ঘা অবধি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৮) পদ (The Legs)

ঊর্দ্ধশাখার (upper limbs) সহিত অধঃশাখার (lower limbs) অনেকটা সাদৃশ্য আছে। হস্ত যেমন বাহু, প্রকোষ্ঠ ও করে বিভক্ত, পদও তেমনি উরু, জঙ্ঘা এবং চরণে বিভক্ত। বাহুর ন্যায় উরুতে একটী মাত্র দীর্ঘাকার অস্থি এবং জঙ্ঘাতে প্রকোষ্ঠের ন্যায় দুইখানা দীর্ঘাস্থি আছে। আবার কর যেমন কব্‌জি, হস্ততল এবং অঙ্গুলিতে বিভক্ত, চরণও তেমনি গুল্‌ফ, পদতল এবং পদাঙ্গুলীতে বিভক্ত (১৬ নং চিত্র দেখ)। ঊর্দ্ধশাখায় যেমন ৩২ খানা অস্থি আছে, অধঃশাখায়ও প্রত্যেক দিকে তেমনি ৩০ খানা অস্থি আছে। নিম্নে তাহাদের নামোল্লেখ করা যাইতেছে—



১৪ নং চিত্র—পদ (leg)

উরু (thigh) ... ১ ঊর্ব্বাস্থি (Femur)

জঙ্ঘা (lower leg). . { ১ জানুসন্ধ্যস্থি (Patella)
১ অগ্রজঙ্ঘাস্থি বা বেণ্বস্থি (Tibia)
১ পাদবন্ধাস্থি (Fibula)

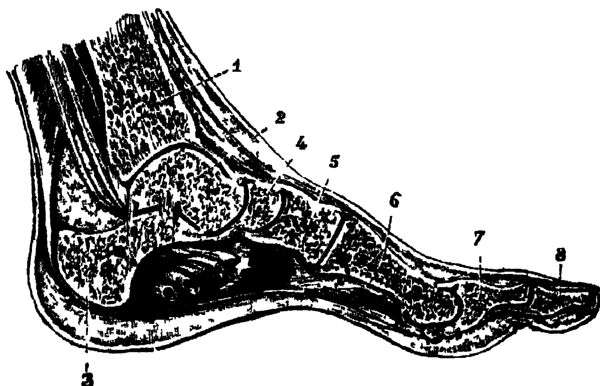
চরণ (foot) ... { ৭ গুল্‌ফসন্ধ্যস্থি (Tarsal bones)
৫ চরণপংক্ত্যস্থি বা পদতলাস্থি (Metatarsal bones)
১৪ পদাঙ্গুল্যস্থি (phalanges of the toes)

ঊর্ব্বাস্থি (Femur or thigh-bone)—শরীরের মধ্যে উরুদেশের এই অস্থিটী সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল, দৃঢ় এবং দীর্ঘাকার। ইহা উরুসন্ধি (hip-joint) বা কুঁচ্‌কি হইতে জানু (হাঁটু) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার ঊর্দ্ধ প্রান্তে গোলার ন্যায় একটী মুণ্ড আছে (১৪ নং চিত্রের 'ক' চিহ্নিত অংশ দেখ) তাহা উরুসন্ধির স্থালীর (acetabulum or cup of the hip-bone) মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সন্ধি নির্ম্মাণ করে। বাহুর অস্থির গোলমুণ্ড ও স্কন্ধফলকাস্থির গহ্বরের মিলনস্থান অপেক্ষা উরুসন্ধির গহ্বরটী গভীর, এজন্য হাতের ন্যায় পা অত সহজে ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যায় না।

জানুসন্ধ্যস্থি (Patella or knee-cap)—জানুসন্ধি বা হাঁটুর এই ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ডটী চ্যাপ্‌টা এবং প্রায় ত্রিকোণাকৃতি। ১৪ খানা সুদৃঢ় শিরা-সন্ধিদ্বারা উহা স্বস্থানে রক্ষিত আছে (১৪ নং চিত্রের 'গ' চিহ্নিত অংশ দেখ)।

অগ্রজঙ্ঘাস্থি বা বেণৃস্থি (Tibia or shin-bone)—ইহা জঙ্ঘার সম্মুখ ভাগের দীর্ঘাস্থি (১৪ নং চিত্রের 'ঘ' অংশ দেখ)। চলিত ভাষায় ইহাকে 'পায়েব নলি' বলে। ইহা একটী কব্জা সন্ধিদ্বারা উর্ব্বাস্থিব সহিত সংযুক্ত আছে। ইহাকেই দেহেব সমস্ত ভার বহন করিতে হয়।

পাদবদ্ধাস্থি (Fibula or splint-bone)—এই লিক্‌লিকে লম্বা হাড়খানি জঙ্ঘার পশ্চাৎভাগে বেণৃস্থির সহিত সমান্তবালে স্থিত (১৪ নং চিত্রের 'ঙ' অংশ দেখ) এবং ইহার দুই প্রান্ত অচল ভাবে সংবদ্ধ আছে।



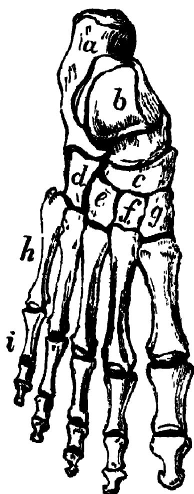
১৫ নং চিত্র—চরণ (পার্শ্বের দৃশ্য)।

1.—বেণৃস্থি (tibia or shin-bone), 2.—গুল্‌ফসন্ধ্যাস্থি (astragalus or ankle bone), 3.—গুল্‌ফাস্থি (os calcis or heel-bone), 4.—গুল্‌ফসন্ধ্যাস্থি (Scaphoid), 5.—অভ্যান্তব কীলকাস্থি (internal cuneiform), 6.—চরণপংক্ত্যস্থি (Metatarsal). 7 & 8.—পদাঙ্গুল্যাস্থি (Phalanges)

গুল্‌ফসন্ধ্যস্থি (Tarsal or ankle-bones)—৭খানা অস্থিদ্বারা গুল্‌ফ-সন্ধি গঠিত। ১৬ নং চিত্রটীর (a, b, c, d, e, f, g) প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই উহাদের অবস্থান বুঝিতে পারিবে। গুল্‌ফ-সন্ধির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অস্থি-খণ্ডদ্বারা গোড়ালি নির্ম্মিত হইয়াছে।

চরণপংক্ত্যস্থি বা পদতলাস্থি (Metatarsal or instep bones)—পদতল ৫খানা অস্থিদ্বারা গঠিত (h চিহ্নিত অংশ)। এই অস্থিখণ্ডগুলির প্রত্যেকে একটী করিয়া অঙ্গুলি ধারণ করে। ইহারাও ঠিক করভাস্থির ন্যায় চর্ম্ম এবং মাংস দ্বারা একত্রে আবৃত থাকে।

পদাঙ্গুলাস্থি (Phalanges or toe bones)—পাঁচটী অঙ্গুলিতে সর্ব্বসমেত ১৪টী ক্ষুদ্র অস্থি আছে। এই হাড়গুলি হাতের আঙ্গুলের হাড় অপেক্ষা খাট (*i* চিহ্নিত অংশ) এজন্য হাতের আঙ্গুলের ন্যায় পায়ের আঙ্গুল ইচ্ছামত সহজে নাড়া যায় না।



১৬ নং চিত্র—চরণ (উপর হইতে যেরূপ দেখায়)।

১৫নং চিত্রটীর প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে পায়ের তলার দিকটা কেমন একটী খিলানের ন্যায়। এজন্য হাঁটিবার

সময় গোড়ালি এবং অঙ্গুলি-সন্ধির নিম্নভাগ (ball of the foot) মাত্র মাটিতে ঠেকে কিন্তু মাঝখানটা ফাঁক হইয়া থাকে। পায়ের তলার দিকে খিলানের মত হওয়াতে হাঁটিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। কারণ যখন দেহের সমস্ত ভার পায়ের উপরে পড়ে তখন ইহা স্প্রিংএর (elastic spring) ন্যায় কার্য্য করে। এইজন্যই হাঁটিবার বা দৌড়িবার সময় আমাদের শরীরে কোন প্রকার ঝাঁকি লাগে না এবং পিচ্ছিল পথে আমরা পা টিপিয়া চলিতে পারি। তাহা না হইলে ক্রমাগত আছাড় খাইতে হইত তাহা বোধ হয় বুঝিতে পার।

অস্থি-সন্ধি—করোটী, মুখমণ্ডল, দেহকাণ্ড এবং ঊর্দ্ধ ও অধঃশাখা অনেকগুলি অস্থির সংযোগে গঠিত একথা তোমরা জানিয়াছ। এই অস্থিসংযোগ বা সন্ধি তিন প্রকার, যথা—

(১) সঞ্চালনবিহীন বা অচল সন্ধি। ললাটাস্থির সীবনী ইহার দৃষ্টান্ত।

(২) নমনীয় বা স্বল্প সঞ্চালনযুক্ত সন্ধি। কশেরুকার দেহ সমূহের সন্ধি এই প্রকার।

(৩) সচল বা ক্রীড়া-সন্ধি। স্কন্ধ-সন্ধি ও উরু-সন্ধি প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। কব্জি, কনুই, গোড়ালি ও হাঁটুর সন্ধি ইহার অপর দৃষ্টান্ত।

সন্ধিস্থলের অস্থিগুলি বন্ধনী নামক শ্বেতবর্ণ তন্তুগুচ্ছের (Synovia) দ্বারা পরস্পর আবদ্ধ, এজন্য ইহারা স্ব স্ব স্থান-ভ্রষ্ট হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়

মাংসপেশী (Muscles)

তোমরা দেহের কাঠাম (কঙ্কাল) অর্থাৎ যে ভিত্তির উপর দেহ দণ্ডায়মান আছে সে সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিয়াছ। দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকে ততক্ষণ শরীর সর্ব্বদাই সবল অবস্থায় থাকে অর্থাৎ দেহের গতির বিরাম নাই। এই গতি নানারূপ। একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমনকালে, আহারের সময়, কথা বলিবার সময় কিম্বা লিখিবার বা অন্য কোন কাজ করিবার সময় যে ক্রিয়া হয় এই সকল স্বেচ্ছাধীন গতি। ইহা ছাড়া আর একরূপ গতি দেহে সর্ব্বদাই চলিতেছে, তাহা আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। যেমন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সময় বক্ষঃস্থলের ক্রিয়া এবং সমস্ত দেহে রক্ত-সঞ্চালনজনিত হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া।

তোমরা জান যে হাড়গুলি ঠিক কাঠের টুকরার মত শক্ত জিনিস। উহাদের কখনই নড়িবার শক্তি নাই। এ অবস্থায় এই শরীর যে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সর্ব্বদা সচল অবস্থায় থাকে এবং আমরা যে হাত পা ইত্যাদি ইচ্ছামত নড়াচড়া করিতে পারি ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ? কোন কারণে যদি কাহারো একটা হাত কাটিয়া ফেলা হয় তাহা হইলে তাহাকে যদি দুই টুকরা কাঠ ঠিক

হাতের মত করিয়া কাটিয়া তাহাতে কব্জা আঁটিয়া দেওয়া যায় তবে সেই ব্যক্তি তাহা হাতের ন্যায় ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারিবে কি ? তোমরা নিশ্চয় বলিবে "কখনই নয়"। তবে ছায়াবাজীর পুতুলের ন্যায় তাহাতে নানা যায়গায় যদি এমনভাবে তার বাঁধা যায় যে একটী তার ধরিয়া টানিলে উহা বাঁকিয়া যাইবে, আবার আর একটী ধরিয়া টানিলে উহা পুনরায় সোজা হইয়া যাইবে, তাহা হইলে অনেকটা হইতে পারে বটে। কিন্তু তাহাতেও ঠিক হইল না। কারণ আমরা ইচ্ছা করিবা মাত্র ঠিক তারটী টানা হইবে কি করিয়া এবং কেই বা তাহা ইচ্ছা মাত্র টানিয়া দিবে ? এইখানেই মানবদেহ এবং মনুষ্যকৃত যন্ত্রসমূহের অতি আশ্চর্য্য প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

কব্জা আঁটিয়া দুইখানা কাষ্ঠখণ্ড একত্রে জোড়া দিলে যেরূপ হয় এই অস্থি-সংযোগগুলিও অনেকটা তাই। উপরে যে তারের কথা উল্লেখ করিলাম মানবদেহে সেইগুলি এক একটী জীবন্ত তার। এই দেহ-ঘরের ভিতরে যে 'আমি'র বাস সেই 'আমি'র ইচ্ছামাত্র এই সকল তার নিজেরা নিজেকে টানিয়া থাকে এবং তাহাতেই অঙ্গ সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

দেহের মাংসপেশী (muscles) ও শিরা (sinews) সকলই সেই জীবন্ত তার। পাঁঠার ছাল ছাড়াইয়া নিলে যে মাংস দেখিতে পাও উহারই অপর নাম মাংসপেশী। দেহের সর্ব্বত্র অঙ্গ সমূহের পরিচালনা করাই এই মাংস বা মাংসপেশীর প্রধান কাজ। দেহের যে সকল অঙ্গ নড়াচড়া করিতে পারে তাহাদের সেই

সঞ্চালনক্রিয়া বিশেষ বিশেষ মাংসপেশীর দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই জন্যই হস্ত ও পদের মাংসপেশী সমূহ সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় এবং বৃহৎ ইহা বোধ হয় সহজেই বুঝিতে পারিবে। কামারকে সর্ব্বদা হাতুড়ির ঘা দিয়া লোহা পিটাইতে হয় বলিয়া উহাদের বাহু অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় এবং উহার গড়ন কেমন নিরেট। এইরূপে পেশীসমূহের যত চালনা হয় ততই উহার শক্তিবৃদ্ধি পায়।

তোমাদের একখানা হাত মেলিয়া তারপর যদি সম্মুখের দিকে ভাঁজ কর (১৭ নং চিত্র দেখ) তাহা হইলে বাহুর মধ্যভাগে একভাগ দৃঢ় মাংসপিণ্ড দেখিতে পাইবে এবং সেই সঙ্গে ইহাও দেখিবে যে উক্ত পেশীখণ্ড আকারে কত ছোট হইয়া গিয়াছে। অঙ্গ সঞ্চালন ক্রিয়ার ইহাই গূঢ় রহস্য। পেশী খণ্ডের মধ্যভাগ খাট এবং স্থূল হওয়াতেই দুই প্রান্তকে কাছে টানিয়া আনে। আবার যখন হস্ত প্রসারণ করিবে তখন অপর একখণ্ড মাংসপেশীর ক্রিয়া দেখিতে পাইবে। বাহুর পিছনের দিকে যে পেশীখণ্ড আছে তাহা তখন উহাকে বিপরীত দিকে টানিয়া লইবে এবং তখন



১৭ নং চিত্র—হস্তের (বাহু) মাংসপেশীর দৃশ্য।

ক—চক্রদণ্ডাস্থি, খ—কফোণি অস্থি, গ—দ্বিমুণ্ড মাংসপেশী (Biceps muscle), ঘ—ভুজাস্থি, ঙ—ত্রিমুণ্ড মাংসপেশী (Triceps muscle)

আবার সম্মুখের দিকের পেশীখণ্ড নরম এবং শিথিল হইয়া পড়িবে। এক এক খণ্ড পেশীর কেবল এক দিকেই টানিয়া লইবার শক্তি আছে। এজন্য সন্ধিস্থান আকুঞ্চন এবং প্রসারণ করিবার জন্য সাধারণতঃ একজোড়া করিয়া পেশী থাকে।

তোমরা অনেকেই হয়ত মোজা বাঁধিবার জন্য 'ইলাষ্টিক' (elastic) ব্যবহার করিয়া থাক। এই মাংসপেশীগুলিও যেন ঠিক সেই 'ইলাষ্টিক'। ইহার সহিত মাংসপেশীর সাদৃশ্য এই যে 'ইলাষ্টিকে'র ন্যায় পেশীরও সঙ্কোচন এবং সম্প্রসারণ শক্তি আছে অর্থাৎ কখনও লম্বা কখনও খাট হইতে পারে। দেহের প্রত্যেক স্থানে এই মাংসপেশী রহিয়াছে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির এবং ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন কাজে লাগিয়া থাকে। তবে মোটামুটি উহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(১) স্বেচ্ছানুবর্ত্তী মাংসপেশী (willing or voluntary muscles)

(২) স্বতঃপ্রবৃত্ত মাংসপেশী (wilful or involuntary muscles)

অর্থাৎ এক প্রকার মাংসপেশী আমাদের ইচ্ছার উদ্রেক হইলে পরে কার্য্য করে এবং অপর প্রকার মাংসপেশী আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া বা আমাদের অজ্ঞাতে আপনা হইতেই তাহার ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

(১) স্বেচ্ছানুবর্ত্তী মাংসপেশী

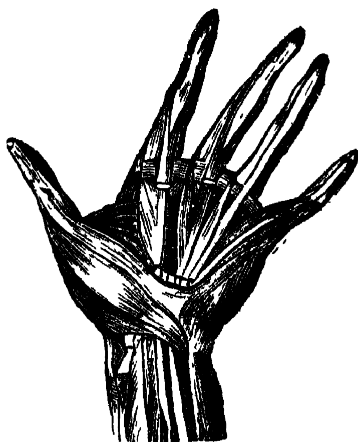
যে সকল মাংসপেশী আমাদের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে তাহাদিগকে স্বেচ্ছানুবর্ত্তী মাংসপেশী বলে। দেহের

মাংসল ভাগ এই পেশীদ্বারা গঠিত এবং উহা দ্বারাই অস্থিময় কঙ্কাল আবৃত থাকে। এই পেশীগুলি আমাদের নিতান্ত আজ্ঞাধীন। আমরা যখন যাহা বলি উহারা তৎক্ষণাৎ ঠিক তাহা করে। অনেক সময় এমন হয় যে আমরা কখন যে হুকুম করিয়াছি তাহা নিজেই জানিতে পারি নাই। এরূপ হওয়ার কারণ এই যে আমরা সদা সর্ব্বদা যে কাজ করিতে বলি বা অভিপ্রায় করি তাহা এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে তাহারা আর নূতন করিয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না। ইঙ্গিত করিতে না করিতেই তাহার কাজ হইয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের হাত পা গুটাইবার বা মেলিবার জন্য দুই প্রকার পেশী ব্যবহৃত হয়। এই স্বেচ্ছানুবর্ত্তী মাংস-পেশীও আবার দুই প্রকার, যথা—

(১) আকুঞ্চন পেশী [Bending muscles (flexor)] এবং

(২) প্রসারণ-পেশী [Extending muscles (extensor)]



১৮ নং. চিত্র—হস্তের (করতল) মাংস-পেশীর দৃশ্য।

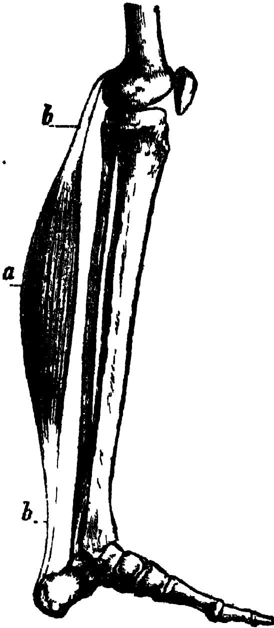
আমাদের আঙ্গুল মুঠো করিবার সময় আকুঞ্চন-পেশীর ক্রিয়া হয়। আবার খুলিবার সময় বিপরীত দিক হইতে প্রসারণ পেশীর ক্রিয়া হইয়া থাকে (১৮ নং চিত্র দেখ)। যখনই আমরা মুঠো

করিতে ইচ্ছা করি তখনই আমাদের মস্তিষ্ক হইতে অঙ্গুলীর উপর হুকুম জারি হয়। আর সেই মুহূর্ত্তেই হাতের তলার আকুঞ্চন-পেশীগুলি কুঁকড়িয়া খাট হইয়া যায় এবং হাতের পিছন দিকের প্রসারণ-পেশীগুলির বিস্তার হয়, অর্থাৎ যত টান পড়ে তত লম্বা হয়। মুঠা খুলিবার সময় আবার ঠিক ইহার বিপরীত ক্রিয়া হইয়া থাকে। হাত গুটাইতে বা মেলিতেও ঠিক এইরূপ ক্রিয়া হয় (১৭ নং চিত্র দেখ)।

পূর্ব্বে বলিয়াছি হাত গুটাইলে বাহুর মধ্যস্থিত মাংসখণ্ড স্থূল আকার ধারণ করে। মাংসপেশীর এই স্থূল অংশকে পেশীর 'উদর' (belly of the muscle) বলা হয় এবং উহার দুই প্রান্তের যে অংশ ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে (১৭ ও ১৯ নং চিত্র) মাংসপেশীর সেই অগ্রভাগের যে দিক অচল অস্থির সহিত সংযুক্ত থাকে তাহাকে পেশরী 'মূল (origin) এবং অপর যে দিক সচল অস্থির সহিত সংযুক্ত থাকে তাহাকে পেশীর 'অনুপ্রবেশ' (insertion) বলে। মাংসপেশীর দুই প্রান্তের সরু অংশ পেশি-বন্ধনী (tendon) দ্বারা অস্থির সহিত সংযুক্ত থাকে।

দেহের সর্ব্বত্র এই মাংসপেশী বিদ্যমান আছে। ইহাব সংখ্যা এত অধিক যে প্রায় পাঁচশতের ন্যূন হইবে না। ইহাদের মধ্যে পায়ের গোছের পেশীখণ্ডই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পেশীটী সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ (১৯ নং চিত্র দেখ)। ইহার নিম্নদিকের শির গোড়ালির অস্থির ভিতরে প্রবিষ্ট থাকে এবং ঊর্দ্ধদিকের শির উরতের অস্থির সহিত সংযুক্ত থাকে।

হাঁটিবার সময় প্রত্যেক সম্মুখীন পদক্ষেপে এই পেশী এবং ইহার সুদৃঢ় পেশীবন্ধনীটাকে সমস্ত দেহের ভার তুলিয়া ধরিতে হয়।



১৯ নং চিত্র—পদ ও চরণতলে পায়ের ডিম বা গোছের মাংস পেশীর দৃশ্য।
a—পেশীর উদর, b (উর্দ্ধ-ভাগে)—পেশীর মূল, b (নিম্ন-ভাগে)—পেশীর অনুপ্রবেশ।

গলার সুদৃঢ় পেশী সকল মস্তককে সোজা করিয়া রাখে এবং ইচ্ছামত এপাশ ওপাশ করায়। মুখমণ্ডলেও অনেকগুলি ঘনবিন্যস্ত তন্তুবৎ পেশী আছে যদ্দারা আমাদের শোক, দুঃখ; হর্ষ, বিষাদ ইত্যাদি যাবতীয় মানসিক ক্রিয়ার বাহ্য প্রকাশ হয়। আমরা যে আমাদের আহার্য্য চিবাইয়া খাই তাহাও চোয়ালের পেশীর ক্রিয়ামাত্র। আমরা জিহ্বাদ্বারা যে বাক্যোচ্চারণ করি তাহাও পেশীর ক্রিয়া। তোমরা পূর্ব্বে জানিয়াছ যে আমাদের দেহ-কাণ্ডের যে দুইটী কক্ষ আছে তাহার উর্দ্ধভাগ বক্ষোগহ্বর (thorax) এবং নিম্নভাগ কুক্ষি (abdomen) বা উদর। এই বক্ষোগহ্বর ও উদরকে পৃথক করিবার জন্য যে দেয়াল বা পর্দ্দা আছে তাহা একখণ্ড পাতলা চৌরস মাংসপেশী ভিন্ন আর কিছুই নয়। উহাকে উদর-বক্ষ-ব্যবধায়ক পেশী বা 'ডায়েফ্‌রাম (Diaphragm) বলে।

(২) স্বতঃপ্রবৃত্ত মাংসপেশী

যে সমস্ত মাংসপেশীর ক্রিয়া আপনা হইতেই হয় অর্থাৎ আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা রাখেনা এবং অধীনে নয়, তাহাদিগকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত মাংসপেশী (wilful muscles) বলা যায়। ইহাদের ক্রিয়া আমরা ইচ্ছা করিয়া বন্ধও করিতে পারি না, এমন কি ঘুমের ভিতরেও ইহাদের ক্রিয়া হয়। পাকস্থলী (stomach), অন্ত্র (intestines), পিত্তকোষ (gall bladder) ফুস্‌ফুস্ (lungs), হৃদ্‌যন্ত্র (heart) এবং নেত্র-পটল (iris of the eye) এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল মাংসপেশীর কোন মাংসবন্ধনী (tendon) নাই। ধমনী (artery), হৃদ্‌যন্ত্র, পাকস্থলী এবং পিত্তকোষ প্রভৃতির পেশী সমূহকে কখন কখন জান্তব পেশী (organic muscles) বলা যায়। ইহাদের সঙ্কোচনকালে এই সমস্ত যন্ত্রের ভিতরস্থিত পদার্থ সকলকে চাপিয়া বাহির করিয়া দেয়। এই উপায়ে হৃদ্‌যন্ত্র হইতে রক্ত, পাকস্থলী হইতে খাদ্য ইত্যাদি, এইরূপ সকল যন্ত্রস্থিত পদার্থ সবেগে বাহির হইয়া পড়ে এবং ইহাতেই রক্ত-সঞ্চালনক্রিয়া ও পরিপাক-ক্রিয়া ইত্যাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই মাংসপেশীগুলি যদি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন না হইয়া আমাদের ইচ্ছাধীন হইত তাহা হইলে নিদ্রাকালে ইহাদের ক্রিয়ার বিরাম হইত এবং উহার শেষ পরিণাম মৃত্যুবই আর কিছুই হইত না। এই জন্যই পাকযন্ত্র এবং রক্তসঞ্চালনযন্ত্রের ক্রিয়া অনবরত হইয়া থাকে, আমাদের

ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর কিছু মাত্র নির্ভর করে না। এই স্বেচ্ছাধীন বা স্বতঃপ্রবৃত্ত মাংসপেশীসকল কোন হাড়ের সহিত সংযুক্ত থাকে না এবং ইহাদের দ্বারা হাত পা বা মাথা ইত্যাদি নড়ে না।

মাংস অধিক সিদ্ধ হইয়া গেলে বড় বড় ডেলাগুলি কেমন ছিব্ড়ে ছিব্ড়ে হইয়া পৃথক হইয়া পড়ে। তখন উহাতে কত সরু সরু আঁশ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮ নং চিত্রটীর প্রতি চাহিলে দেখিতে পাইবে উহাতে কত অসংখ্য আঁশ দেখা যাইতেছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখিলে এই প্রত্যেকটী আঁশের ভিতরে আরো কত সরু সরু আঁশ দেখা যাইবে। হাতের এক খণ্ড স্বেচ্ছানুবর্ত্তী মাংসপেশী এবং রক্তকোষের একখণ্ড স্বতঃপ্রবৃত্ত মাংসপেশী অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে—

(১) স্বেচ্ছানুবর্ত্তী মাংসপেশীগুলি ডোরাকাটা (striped) এবং

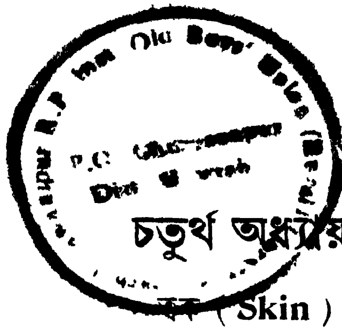
(২) স্বতঃপ্রবৃত্ত মাংসপেশী গুলি সমান বা চৌরস (smooth)

ইহাদের পার্থক্য এখন তোমরা বুঝিতে পারিবে না।

স্বতঃপ্রবৃত্ত পেশীর ক্রিয়া যদিও আমাদের ইচ্ছাধীন নয় তথাপি অনেক সময় আমাদের মনে কোন ভাবের উদয় হইলে স্বতঃপরত তাহার ক্রিয়া হইয়া থাকে। যেমন ভয় পাইলে এই স্বেচ্ছাধীন পেশীর সঙ্কোচন হয় এবং তাহাতেই লোম সোজা হইয়া দাঁড়ায়। ইহাকেই রোমাঞ্চ বা 'গা কাঁটা দিয়া উঠা' বলে। হঠাৎ ভয় কিম্বা গুরুতর শোকসংবাদ পাইলে মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে মনের ভাবানুযায়ী

তখন রক্তকোষের স্বতঃপ্রবৃত্ত পেশী সকলের ক্রিয়া হয় অর্থাৎ উহাদের সঙ্কোচন হয়। তাহাতে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে এবং তখন রক্তবহা শিরাসকল রক্তশূন্য হইয়া পড়াতে 'ফ্যাকাসে' দেখায়। এইরূপে গুরুতর ভয়ে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটিতেও দেখা গিয়াছে। এজন্য শিশুদিগকে হঠাৎ ভয় দেখান কর্ত্তব্য নয়।

চর্ব্বি (fat)—ত্বক এবং মাংসপেশীর মধ্যস্থলে পেশীর সহিত সংযুক্ত হইয়া মানুষ মাত্রেরই শরীরে অল্পাধিক পুরু এক পরত (layer) চর্ব্বি আছে। এই চর্ব্বিতে চেহারার লাবণ্য এবং শ্রীবৃদ্ধি হয়। চর্ব্বি উত্তাপের পরিচালক নয় (conductor of heat) বলিয়া ইহা দৈহিক উত্তাপ রক্ষার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। যদি একজন সুস্থদেহ লোককে অনাহারে রাখা যায় তাহা হইলে রক্ত তাহার শরীরের চর্ব্বিগুলিকে ক্রমশঃ শুষিয়া লইবে এবং দেহের প্রয়োজনীয় উত্তাপ রক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে। মোটা মানুষের গায় অধিক চর্ব্বি থাকে, এজন্য রোগা মানুষদের চাইতে তাহাদের শীত অত্যন্ত কম। কারণ অধিক চর্ব্বিতে গা গরম রাখে।



চতুর্থ অধ্যায়

ত্বক (Skin)

ত্বক বা চামড়া কাহাকে বলে তাহা আর তোমাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। শরীরের ভিতরে কি আছে না আছে তাহা না জানিলেও গায়ের চামড়া কাহাকে বলে তা বেশ জান। চিম্‌টি কাটিলে যে চামড়ায় লাগে তাও অবশ্য জানিতে বাকি নাই। সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদিরা 'খোলস ছাড়ে' তাহা অবশ্যই জান। তোমরা সকলেই হয়ত সাপের খোলস দেখিয়াছ। এই খোলস চামড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। খোলস ছাড়িবার পর সাপের গায়ে কেমন কোমল চক্‌চকে চামড়া থাকে তাহা বোধ হয় দেখিয়াছ। আমরা সাপের মত খোলস না ছাড়িলেও প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া আমাদের পুরাতন চামড়া খসিয়া যায়। এই পুরাতন চামড়া অতি পাতলা আঁইসের মত বা ধূলিকণার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে গা হইতে উঠিয়া আসে এবং তাহার নীচে নূতন চামড়া গজাইতে থাকে। প্রতিদিন যে আমাদের গা ধোওয়া এবং পরিবার কাপড় বদলান উচিত ইহাই তাহার একটী কারণ।

দেহের উপরের আবরণটীর দুইটী স্তর আছে। উপরের স্তরটী অতি পাতলা। আঁইসের ন্যায় যে পদার্থ উঠিয়া আসে তাহা সকলের উপরের স্তর। ইহাকে ছাল বা উপত্বক

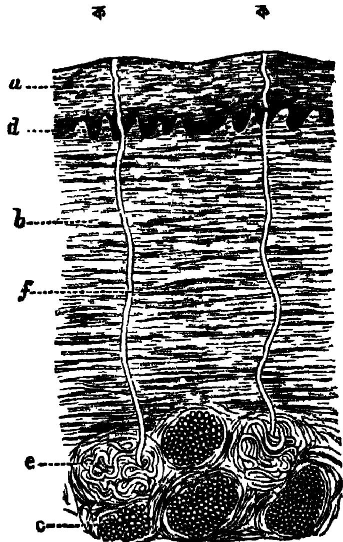
(Cuticle or Epidermis) বলে। নীচের অর্থাৎ ভিতরের স্তরকে চামড়া বা প্রকৃত ত্বক (Cutis or Dermis) বলে।

(১) ছাল বা উপত্বক

ছাল বা সকলের উপরের যে পাতলা আবরণটী আছে তাহা অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে ঠিক মাছের আঁইস বা সাপের খোলসের ন্যায় দেখায়। ইহার ঠিক নীচেই অর্থাৎ ছাল ও চামড়ার মাঝখানে একটী অতি পাতলা স্তর আছে তাহাকে মূলঝিল্লি (basement membrane) বা 'বর্ণকোষ' (colour cells) বলে। এই 'বর্ণকোষ' উপত্বকদ্বারা আবৃত হইয়া রক্ষিত হইতেছে। আগুনে পুড়িয়া ফোস্কা পড়িলে এই উপত্বকই (Epidermis) উচু হইয়া উঠে এবং ভিতরে জলপূর্ণ হয়। তোমরা 'মুনছাল' উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয়ই জান। এই মুনছাল উপত্বক ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহাতে স্নায়ু (nerve) বা রক্তবহা-নাড়ী (blood-vessels) নাই, এজন্য উহাতে সূঁচ বা আলপিন ফুটাইয়া দিলেও রক্ত পড়িবে না।

এই ছাল বা উপত্বক দেহের সকল স্থানে সমান পুরু নয়। যে স্থান অতি নরম সে স্থানে এক ইঞ্চির দুইশত ভাগের একভাগ পুরু, আবার হাতের তলা ইত্যাদিতে এক ইঞ্চির কুড়িভাগের একভাগ পুরু। ২০নং চিত্রটির প্রতি চাহিয়া দেখ। ইহা একখণ্ড চামড়াকে প্রায় কুড়িগুণ বিস্তৃত করিয়া আঁকা হইয়াছে। ইহার কোন অংশ কি তাহা চিত্রেরপার্শ্বে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

চিত্রস্থিত 'd' অংশের প্রতি চাহিয়া দেখ। 'a' অংশ উপ-ত্বক, ইহার ঠিক নীচেই 'd' অংশকে বর্ণকোষ (colour cells) বলে। এই কোষ-গুলির ভিতরেই রং ফলাইবার পদার্থ আছে, তাহাতেই ফরসা কাল ইত্যাদি দেহের বিভিন্ন রং হইয়া থাকে। আফ্রিকাবাসী নিগ্রোরা কাল, আমেরিকার আদিম নিবাসীরা কটা বা তাম্র বর্ণ, চীণেরা পীতবর্ণ, ইংরেজেরা শ্বেতবর্ণ ইত্যাদি বিবিধ বর্ণ হইবার ইহাই কারণ। এই বর্ণকোষের স্তরটী যদি তুলিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে সকলের দেহই শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট হইতে পারে।



২০ নং চিত্র—চর্ম্মের গঠনপ্রণালী।

a—উপত্বক (Epidermis), b—ত্বক (Dermis), c—মেদ-কোষ (fat cells), d—বর্ণকোষ (colour cells), e—স্বেদ-গ্রন্থি (sweat glands), f—ঘর্ম্মবহা প্রণালী (sweat ducts).

(২) চামড়া বা প্রকৃত ত্বক

ফোস্কার ছাল বা নুনছাল উঠিয়া গেলে তাহাতে হাত দিলে জ্বালা করে একথা তোমরা সকলেই জান। তখন উহাতে কোন-রূপ আঘাত লাগিলে রক্তও বাহির হয়। ত্বকের এই সর্ব্বনিম্ন

স্তরটী স্নায়ু এবং রক্তকোষে পরিপূর্ণ; জ্বালা বোধ হওয়া এবং রক্ত বাহির হইবার ইহাই কারণ। চামড়া বা প্রকৃত ত্বকের চুলের মত সরু সরু এত অসংখ্য রক্তকোষ আছে যে দেখিলে মনে হয় যেন শুধু রক্তকোষ দিয়াই উহা প্রস্তুত হইয়াছে। এই রক্তকোষগুলির সহিত স্নায়ুসূত্রগুলি (nerve fibres) গায় গায় ঠেকান ঘন বুনট করা জালের মত। এইজন্য একটুখানি সূঁচ ফুটিলেই কোন না কোন রক্তকোষে আঘাত লাগিয়া রক্ত বাহির হইবে এবং কোন না কোন স্নায়ুতে লাগিয়া বেদনা অনুভূত হইবে।

২০ নং চিত্রটীর প্রতি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে 'd' চিহ্নিত বর্ণকোষগুলির উপরের দিক কেমন সমান। কিন্তু নীচের দিকগুলি নিতান্ত আবরুখাবরু। আবার স্থানে স্থানে প্রকৃত ত্বক বর্ণকোষের ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে এবং কোন কোন স্থানে বা বর্ণকোষ প্রকৃত ত্বকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত ত্বকের উপরের দিকে মাঝে মাঝে যে ঢিপির মত উচু হইয়া উঠিয়াছে সে গুলিকে আঙ্গুলের ডগে, হাতের তেলোয়, পায়ের তলায়, জিহ্বার এবং ঠোঁঠের আগায় দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ হওয়াতে স্নায়ু এবং রক্তকোষগুলির উপত্বকের কাছে যাইবার পক্ষে সুবিধা হইয়াছে। স্নায়ুদ্বারাই আমাদের স্পর্শানুভূতি হইয়া থাকে। কাজেই এরূপ বন্দোবস্ত থাকাতে স্পর্শানুভূতি বৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করে। এই স্নায়ুগুলির যাহাতে কোন অনিষ্ট না হয় সেজন্য উপত্বক দ্বারা ঢাকা থাকে।

(৩) লোমকূপ—ঘর্ম্মনিঃসরণ-প্রণালী

২০ নং চিত্রটির প্রতি তাকাইলে দেখিতে পাইবে যে 'f' চিহ্নিত দুইটী লম্বা রেখা উপর হইতে নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে উহার যে অংশ উপত্বকের ভিতর দিয়া গিয়াছে ('a' চিহ্নিত অংশ) তাহা পাকান পাকান। যে অংশ বর্ণকোষের ভিতর দিয়া গিয়াছে ('d' চিহ্নিত অংশ) তাহা একেবারে সোজা এবং যে অংশ প্রকৃতত্বকের ভিতর দিয়া গিয়াছে ('b' চিহ্নিত অংশ) তাহা ঢেউ খেলান। এই রেখা-গুলির শেষভাগে অর্থাৎ চর্ব্বির স্তরের কাছে তাল পাকান আছে। এই রেখাগুলিই ঘর্ম্মবহা প্রণালী (sweat ducts) আর কুণ্ডলি পাকান অংশগুলি স্বেদ-গ্রন্থি (sweat glands) অর্থাৎ এই খানে ঘাম জমা হয়। উপত্বকের ঠিক উপরে 'ক' চিহ্নিত ছিদ্রগুলি এই ঘর্ম্ম-নিঃসরণ-প্রণালীর মুখ অর্থাৎ লোমকূপ। ঘর্ম্মবহা নালীগুলি লম্বায় এক একটী এক-জ অর্থাৎ সিকি ইঞ্চি পরিমিত হইবে। কিন্তু সমস্ত দেহের নালীগুলি যদি একসঙ্গে জোড়া যায় তাহা হইলে উহা লম্বায় ৩০ মাইল হইবে। ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছ আমাদের ত্বকের ভিতরে কত অসংখ্য ঘর্ম্মবহা নালী রহিয়াছে। এই নালী আবার শরীরের কোন অংশে অধিক এবং কোন অংশে অল্প পরিমাণে আছে। পা এবং পীঠে প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ছয়শত হইবে, কিন্তু হাত ও পায়ের তলায় ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক। এক হাতের তলাতেই

প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে প্রায় আড়াই হাজার হইবে। ত্বকে ময়লা জমিলে লোমকূপগুলি বন্ধ হইয়া যায়, কাজেই ঘর্ম্মনিঃসরণে ব্যাঘাত ঘটে। ঘাম না হইলে শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হইতে পারে না, তাহার ফলে আমাদের পীড়া জন্মে। এখন বোধ হয় বুঝিলে আমাদের শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা কত আবশ্যক।

ত্বক কেবল মাত্র দেহের আবরণ নয়। ইহা দেহের মল-নিঃসরণ যন্ত্রবিশেষ। রক্তের দূষিত পদার্থ সকলকে বাহির করিয়া দেওয়াই ইহার কাজ। আমাদের শরীর হইতে যে ঘাম বাহির হয় ইহাই ত্বকের মল-নিঃসরণ-ক্রিয়া। লোমকূপদ্বারাই উহা দেহের বাহির হইয়া যায়। আমরা যখন গুরুতর পরিশ্রম করি তখনই লোমকূপ দিয়া বিন্দু বিন্দু ঘাম বাহির হয়। কিন্তু দিবা-রাত্রি সকল সময়েই, ঘুমন্ত বা জাগরণকালে, রক্ত হইতে দূষিত পদার্থ সকল জলের আকারে বাহির হইতেছে। আমাদের সহজ অবস্থায় যখন ত্বকের উপরে ঘামের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না তখনও দেহের ভিতরে এই ঘর্ম্মবহা-নালীর ক্রিয়ার বিরাম নাই। এইরূপে প্রতিদিন দেহ হইতে অন্ততঃ প্রায় এক-পাঁট (আন্দাজ আড়াই পোয়া) ঘাম বাহির হয়।

(৪) নখ ও চুল

নখ এবং চুল উপত্বকের রূপান্তর মাত্র। নখ কি তাহা অবশ্য তোমাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। ইহার বৃদ্ধির শেষ নাই, তাহা বোধ হয় তোমরা সহজেই বুঝিতে পার। কারণ

শিশুকাল হইতে আমরা যে নখ কাটিতে আরম্ভ করি বৃদ্ধকাল বা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই নখ কাটার আর বিরাম নাই। কয়েক দিন না কাটিলেই উহা আবার বাড়িয়া উঠিবে তাহা সকলেই জান। ইহার মূল (root), দেহ (body) এবং আগা (free edge) এই তিন অংশ। আমরা যাহা কাটিয়া ফেলি তাহা নখের আগা। মাংসের উপরে যে অংশ থাকে তাহা দেহ, এবং চামড়ার ঠিক নীচে উহার মূল বা গোড়া। উপত্বক রূপান্তরিত হইয়া ইহার দেহ গঠিত হয়। চলিত ভাষায় ইহাকে 'কাঁচা নখ' বলে। ইহা কাটিলেই রক্ত বাহির হয়।

চুলও নখের ন্যায় উপত্বকের রূপান্তর-বিশেষ। অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে উহার ভিতরে একটি 'মাইজ' (pith) এবং তাহার চারিদিকে 'বাকলের' ন্যায় একটী স্তর আছে। এই খোসা চালের খোলা সাজাইবার মত একটীর উপর আর একটী করিয়া সাজান আছে। নখের ন্যায় চুলের চিরকাল বৃদ্ধি হয় না। প্রত্যেকটি চুলের পরিমিত বৃদ্ধি আছে। একটী চুলের বৃদ্ধির শেষ হইলেই সেটি পড়িয়া যায় এবং তাহার স্থানে নূতন আর একটি চুল গজায়। চুল, চামড়া বা প্রকৃত ত্বকের একবারে তলার দিকে ক্ষুদ্র থলির ভিতরে টের্‌চা ভাবে থাকে।

স্ত্রীলোকদিগের লম্বা এবং ঘন চুল কে না পছন্দ করিয়া থাকে? দেশ বিদেশে মেয়েদের চুল বাঁধিবার প্রণালীই বা কত? চুলের পারিপাট্যে জাপানী রমণীগণই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই

লম্বা এবং ঘন চুল হওয়ার একটী উপায় বলিয়া দিতেছি। গরম জলে সোডা (Sodi Bicarb) মিশ্রিত করতঃ তদ্দারা মাথা ধুইলে এবং মাথায় ক্রমাগত চিরুণী দিলে চুল ঘন এবং লম্বা হয়। এক কথায় যত্নেই উহার বৃদ্ধি। যত পাট করিবে চুল তত ঘন এবং লম্বা হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

পরিপাক-ক্রিয়া

আমাদের দেহের অনবরত ক্ষয় হইতেছে একথা তোমরাও জানিয়াছ। এই ক্ষয় পূরণ করিবার জন্য খাদ্যের আবশ্যক হইয়া থাকে। আহার্য্য দ্রব্য রক্তে পরিণত হইয়াই শরীরের পুষ্টিসাধন করে। আমরা মুখ দিয়া আহার গ্রহণ করি একথা অবশ্য সকলেই জান। নলের মত যে রাস্তা দিয়া খাদ্য সকল মুখ হইতে অন্ত্রের নিম্নভাগে গমন করে ভুক্ত দ্রব্যের এই পথটিকে (food passage) অন্নবহানালী (alimentary canal) বলা হয় (২১ নং চিত্র দেখ)। এই নালীর উপরিভাগ অর্থাৎ মুখের ঠিক পশ্চাদ্ভাগকে গলাগ্র (pharynx) বলে এবং উহার ঠিক নিম্নের অংশকে গল-নালী (gullet) বলে। এই গল-নালী বক্ষোগহ্বরের (thorax) ভিতর দিয়া চলিয়া উদর-বক্ষ-ব্যবধায়ক পেশী বা বক্ষস্থল ও কুক্ষির মধ্যবর্ত্তী পর্দ্দা (diaphragm) ভেদ করিয়া অবশেষে উদরে (abdomen) প্রবিষ্ট হইয়া পাকস্থলীতে পৌঁছিয়াছে। এই অন্নবহা নালীর অবশিষ্ট অংশই বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র অন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। আহার্য্য দ্রব্য মুখের ভিতর দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া বহু প্রক্রিয়ার পর অবশেষে বৃহদন্ত্রে (large intestine) নীত হয়।

মুখের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিবার সময় দাঁতগুলি যাঁতার কাজ করে এবং জিহ্বা সেঁকুড় দেওয়ার কাজ করে। অর্থাৎ দাঁত আহার্য্য দ্রব্যগুলিকে পিষিয়া চূর্ণ করিয়া দেয় এবং জিভ ঠেলিয়া যাঁতার নীচে ফেলিয়া দেয়। তার পর সেগুলি লালা-রসে মিশ্রিত হইয়া পাকস্থলীতে প্রবিষ্ট হয়, এবং সেখানে তখন পাকক্রিয়া আরম্ভ হয়। এখন এই ভুক্ত দ্রব্যের গন্তব্য পথের বিশেষ বিবরণ উল্লেখ করা যাইতেছে।



২১ নং চিত্র—অন্নবহানালী
(alimentary canal)।

(১) দন্তাবলী

তোমরা সকলেই জান যে তোমাদের দুধের দাঁত পড়িয়া গিয়া আবার নূতন দাঁত উঠিয়াছে। এই প্রথম দাঁত বা 'দুধের' দাঁত শিশুর বয়ঃক্রম ছয় মাস হইতে এক বৎসরের মধ্যে উঠিয়া থাকে। এই দাঁতের গোড়া বা শিকড় থাকে না এবং শিশু পাঁচ বৎসরের হইলেই পড়িতে আরম্ভ হয়। এই 'দুধের দাঁত' কুড়িটী থাকে এবং সে সমস্ত পড়িয়া গিয়া পুনরায়

আটাশটি স্থায়ী দাঁত উঠে। তারপর একুশ বৎসর বয়সের সময় আবার চারিটী দাঁত উঠে, উহাদিগকে 'আক্কেল দাঁত' বলে। কারণ লোকের বিশ্বাস যে এই দাঁত উঠিলেই বুদ্ধি বাড়ে। মানুষের বত্রিশটী দাঁত তোমরা হয়ত সকলেই শুনিয়াছ। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিরই বত্রিশটী দাঁত হয় এখন তাহা বুঝিলে।

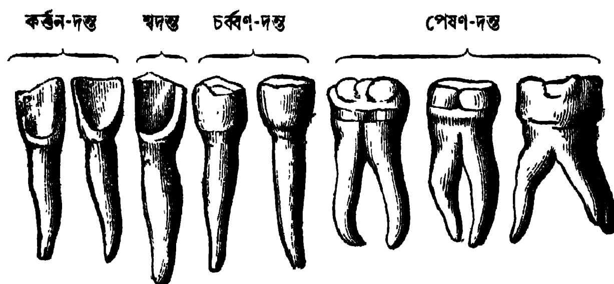
এই বত্রিশটী দাঁতকে তাহাদের কার্য্যানুযায়ী চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—

কর্ত্তন-দন্ত (Incisors or biters)—৮
চর্ব্বণ-দন্ত (Bicuspids or chewers)—৮
শ্বদন্ত (Canine teeth or tearers)—৪
পেষণ-দন্ত (Molars or grinders)—১২

কর্ত্তন-দন্তগুলি ঠিক মুখের সম্মুখের দিকে উপরের মাড়ীতে ৪টী এবং নীচের মাড়ীতে ৪টী করিয়া থাকে। এই কর্ত্তন বা দংশন দন্তগুলি ধারাল বাটালির ন্যায়। কোন জিনিস কামড়াইয়া বা কাটিয়া লইবার সময় এগুলির ব্যবহার হয়। একখানা রুটী কিম্বা লুচি পুরু ভাঁজ করিয়া তাহা হইতে খানিকটা দাঁত দিয়া কাটিয়া লইলে তাহাতে উপর নীচে স্পষ্ট ৮টী দাঁতের চিহ্ন দেখিতে পাইবে। ইঁদুর, খরগোস, কাঠবিড়ালী এবং বীবর প্রভৃতি যে সকল জন্তু সর্ব্বদা নানাবিধ জিনিস কাটে তাহাদের এই দাঁতগুলি খুব তীক্ষ্ণ এবং বড় বড় হয়।

শ্বদন্ত বা ছেদন-দন্ত খুব লম্বা এবং আগার দিকটা চোখাল হয়। এগুলি এক এক মাড়ীতে ঠিক কর্ত্তন বা দংশন-দন্তের দুই পাশে দুইটী করিয়া থাকে। উপর ও নীচের মাড়ীর এই চারিটী

দাঁত মাংস প্রভৃতি ছিঁড়িবার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। কুকুর, বিড়াল এবং ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসভোজী জন্তুদিগের এই দাঁত কয়টী বিশেষ পুষ্ট থাকে। এই জন্যই ইহাদের নাম শ্বদন্ত হইয়াছে। মানুষেরও চারিটী শ্বদন্ত আছে বলিয়া মানুষও মাংসভোজী হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে অনেকে একথা বলেন।



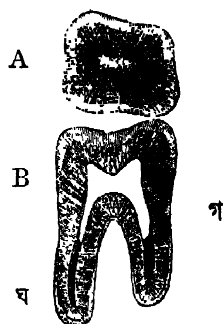
২২ নং চিত্র—দন্তাবলি।

এই চিত্রে উপর এবং নিম্ন চোয়ালের প্রত্যেকের আধপাটি করিয়া মোট ৮টী দাঁত দেখান হইয়াছে। কাজেই যদিও এখানে ৩টী পেষণ-দন্ত, ২টী চর্ব্বণ-দন্ত, ১টী শ্বদন্ত এবং ২টী কর্ত্তন-দন্ত দেখান হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দুই পাটি দাঁতে ইহার প্রত্যেকের চারিগুণ করিয়া দাঁত আছে।

চর্ব্বণ-দন্ত ৮টী শ্বদন্ত ও কসের দাঁতের মাঝখানে এক এক দিকে দুইটী করিয়া থাকে। এই দাঁতগুলির 'মুকুট' (crown) অর্থাৎ উপরিভাগে দুইটী করিয়া উচু তীক্ষ্ণ গুটিকা বা প্রবর্দ্ধন (caps or ridges) আছে। এজন্য এই আটটী দাঁতের আগা অসমান হওয়াতে চর্ব্বণ ক্রিয়ার সহায়তা করে। উপর চোয়ালের দাঁতগুলির একটী করিয়া শিকড় (root or fang)।

পেষণ-দন্ত বা কসের দাঁত গুলির 'মুকুট' (crown) বা

উপরিভাগ অধিক চওড়া এবং ইহাতে চারি পাঁচটী করিয়া প্রবর্দ্ধন (caps or ridges) আছে এজন্য কসের দাঁতদ্বারা সহজে খাদ্যদ্রব্য চূর্ণ করিতে ও পিষিয়া ফেলিতে পারা যায়। শিশুদিগের এই দাঁত আটটী মাত্র থাকে। তৎপরে বয়োবৃদ্ধি সহকারে আরো চারিটী দাঁত উঠিয়া থাকে। এই দাঁতগুলির তিন চারিটী করিয়া শিকড় থাকে। যে সমস্ত প্রাণী তৃণভুক্ অর্থাৎ ঘাস, লতাপাতা ও শস্যাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করে তাহাদের পেষণ-দন্তগুলি বিশেষ পরিপুষ্ট থাকে।



২৩ নং চিত্র—
একটী ছেদিত দন্ত।
A—আড়ভাবে ছেদিত দন্ত-খণ্ড, B—লম্বভাবে ছেদিত দন্তখণ্ড, গ—গ্রীবা, ঘ—মূল বা গোড়া, B চিত্রের উপরিভাগের গর্ত্তভাগ—মুকুট।

প্রত্যেকটী দাঁতকে তিন অংশে বিভক্ত করা যায়, যথা—

(১) মূল বা গোড়া (root or fang)
(২) গ্রীবা (neck) এবং
(৩) মুকুট (crown)

দাঁতের যে অংশ মাঢ়ীর ভিতর পোতা থাকে তাহাকে 'মূল' বা 'গোড়া', যে অংশ উপরে থাকে তাহাকে 'মকুট' এবং মূল ও মুকুটের সন্ধি-রেখাকে 'গ্রীবা' বলে। কর্ত্তন-দন্ত এবং শ্বদন্তের একটী করিয়া গোড়া থাকে এবং চর্ব্বণ-দন্ত ও কসের দাঁতের দুই হইতে পাঁচটী গোড়া থাকে। এই গোড়া স্নায়ু এবং রক্ত-কোষের সহিত সংযুক্ত থাকে।

দাঁতগুলি দেখিতে যদিও অনেকটা হাড়ের মত কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে উহারা ঠিক একই উপাদানে গঠিত নয় এবং ইহাদের গঠন কৌশলও বিভিন্ন। নলাকার এক প্রকার কঠিন পদার্থ ইহাদের প্রধান উপাদান। ইহাকে 'ডেন্‌টিন্' (dentine) বলে। এই পদার্থটী খোলা থাকিলে অতি সহজে ক্ষয় হইয়া যায় এইজন্য উহা একস্তর ধব্‌ধবে শাদা অতি কঠিন ঠুন্‌কা পদার্থদ্বারা আবৃত থাকে, তাহাকে 'মিনা' অর্থাৎ এনামেল (enamel) বলে। এই বাহিরের আবরণটীর যদি কোনও প্রকার অপচয় হয় বা চলা উঠিয়া যায় তাহা হইলে আর পুনরায় ইহার বৃদ্ধি হয় না। তখন ভিতরের অপেক্ষাকৃত নরম 'ডেন্‌টিন্' অতি সত্বরে নষ্ট হইয়া যায়।

দাঁতের ঠিক মধ্যস্থলে একটী গর্ত্তের ন্যায় আছে (২৩ নং চিত্রের 'B' খণ্ডের মধ্যভাগস্থ শাদা অংশ) উহা দন্ত-শাঁসে পূর্ণ থাকে। এই দন্ত-শাঁস (tooth-pulp) এক স্তূপ স্নায়ু এবং রক্তকোষবিশেষ। ইহাদ্বারাই দন্তের পুষ্টিবিধান হইয়া থাকে। দাঁতের গোড়া 'সিমেণ্ট' (cement) নামক একটী পদার্থের পাত্‌লা প্রলেপদ্বারা চিবুকের হাড়ে আবদ্ধ থাকে। এই সিমেণ্টের উপকরণ হাড়েরই অনুরূপ।

দাঁতের বাহিরের আবরণ মিনা বা এনামেল যাহাতে ক্ষয় বা নষ্ট হইয়া না যায় সেজন্য আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ যদি কোনও রূপে ইহার চল্‌টা উঠিয়া যায় তাহা হইলে ডেন্‌টিনে বায়ু প্রবেশ করিয়া ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়।

কখনও বা এমন ছিদ্র হইয়া যায় যে তাহাতে বায়ু, থুথু, খাদ্য প্রভৃতি প্রবিষ্ট হইয়া দন্ত-শাঁসের ভিতরে গিয়া ঠেকে এবং তখনই দাঁত কন্‌কন্‌ করিতে থাকে। কারণ দন্ত-শাঁস স্নায়ু ও রক্তকোষে পূর্ণ থাকায় বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। দাঁত দিয়া সুপারি বা অন্য কোন কঠিন জিনিস ভাঙ্গিতে গিয়া অতি সহজে এনামেলের চটা উঠিয়া যাইতে পারে। তোমরা সকলেই জান যে মাংস খাইবার সময় অথবা ডাঁটা বা তদ্রূপ কোনও জিনিস চিবাইবার সময় দাঁতের ফাঁকে বা মাড়িতে ছিব্‌ড়া আট্‌কাইয়া গেলে কেমন উচ্‌পিচ্‌ বা অস্বস্তি বোধ হয়। দাঁতের গোড়ায় এরূপ কোনও জিনিস থাকিতে দিলে ক্রমে এনামেল নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার ফলে দাঁতের অনিষ্ট ঘটে। ভাল দাঁত পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও মুখের বিশেষ শোভাও বটে। অতএব দন্তরক্ষার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত।

আল্‌পিন্‌ বা সূঁচ দিয়া দাঁত খোটান অত্যন্ত অনিষ্টকর। প্রতিদিন দুইবার করিয়া দাঁত মাজিলে দাঁত খুব ভাল থাকে এবং অধিক দিন স্থায়ী হয়। আহারের পর ভাল করিয়া কুল্‌কুচা করা কর্ত্তব্য। তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে ঘুম হইতে উঠিয়া মুখ না ধুইয়াই পড়িতে বসে বা বাসি মুখেই খাইতে আরম্ভ করে? এরূপ করা যে অনিষ্টকর তাহা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না। যে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সে অনেক রোগের হাত এড়াইতে পারে। এখন হইতে

তোমরা ঘুম হইতে উঠিয়াই মুখ ধুইবে এবং দাঁতন-কুচি দিয়া দাঁত মাজিবে।

(২) জিহ্বা

জিহ্বাকে রসনেন্দ্রিয় বলে, কারণ জিহ্বাদ্বারাই আমাদের আস্বাদনক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই স্বাদগ্রহণ ব্যতীত ইহার আরও দুইটী কাজ আছে। বাক্যোচ্চারণে সাহায্য করা ইহার একটী কাজ। কারণ জিহ্বার সাহায্যেই আমরা কথা বলিতে পারি। চর্ব্বণ-ক্রিয়ার সাহায্য করা ইহার অপর কাজ। চিবাইবার সময় জিহ্বাই আহার্য্য দ্রব্যকে এপাশে ওপাশে লইয়া যায় এবং ওলট্ পালট্ করিয়া দেয়।



২৪ নং চিত্র—জিহ্বার উপরের দৃশ্য।

ক—কণ্টক-প্রাকার (circumvallate papilloe), খ—ছত্রক সদৃশ দানাসমূহ (fungiform papilloe), গ—সূত্রবৎ দানাসমূহ (filiform papilloe)।

জিহ্বা কেবল মাংস-পেশীদ্বারাই নির্ম্মিত বলিলেই হয়। মাংসপেশী কি এবং উহার সংকোচন এবং সম্প্রসারণ ক্রিয়ার কথা হয়ত তোমাদের বেশ মনে আছে। জিহ্বার পেশীগুলি অতি সহজে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে এবং মুখের ভিতরে আহার্য্য দ্রব্যকে

ক্রমাগত নাড়া চাড়া করিতে সাহায্য করে। তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে জিহ্বার উপরিভাগ সূক্ষ্ম কাঁটার অগ্রভাগের ন্যায় দানা দানা দেখায়। এই দানাগুলি জিহ্বার গোড়ার দিকের কতক অংশে একটু মোটা মোটা এবং আগার দিকের অংশে অতি সূক্ষ্ম। ২৪ নং চিত্রটি দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারিবে। আবার ব্যাঙের ছাতার ন্যায় কতগুলি চওড়া দানা আছে সেগুলি প্রায় সমস্ত জিহ্বা জুড়িয়া আছে। মোটা দানাগুলি সংখ্যায় অতি অল্প এবং জিহ্বার গোড়ার দিকে দুই লাইনে টের্‌চাভাবে সাজান আছে (২৪ নং চিত্রের ক অংশ দেখ)। উহাদিগকে কণ্টকপ্রাকার (circumvallate papillœ) বলে। কারণ উহাদের প্রত্যেকটী চারিদিকে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীদ্বারা প্রাচীরের ন্যায় বেষ্টিত আছে। এগুলিদ্বারা তিক্তস্বাদ অনুভূতি হয়। অপেক্ষাকৃত লম্বা বলিয়া চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম দানাগুলিকে সূত্রবৎ দানা (filiform papillœ) বলে (২৪ নং চিত্রের গ অংশ দেখ)। এগুলি দ্বারা নোস্তা এবং মিষ্টস্বাদ অনুভূত হয়।

জিহ্বাই খাদ্যদ্রব্যকে প্রয়োজন মত এক এক প্রকার দাঁতের কাছে নিয়া উপস্থিত করে। অর্থাৎ মাংস প্রভৃতি ছিঁড়িবার জন্য শ্বদন্তের কাছে অথবা কোনও জিনিস কাম্‌ড়াইবার প্রয়োজন হইলে কর্ত্তন-দন্তের কাছে, চিবাইবার প্রয়োজন হইলে চর্ব্বণ-দন্তের কাছে এবং পিষিয়া চূর্ণ করিবার প্রয়োজন হইলে পেষণ-দন্তের কাছে লইয়া যায়। ইহা খাদ্যদ্রব্যকে ক্রমাগত উলট্ পালট্ করে এবং মুখের ভিতরে চারিদিকে ঘুরাইতে ফিরাইতে

থাকে। একথা বোধ হয় তোমরা সকলেই জান যে খাবার গ্রাসে যদি কখনও হাড়ের কুচি, মাছের কাঁটা বা অন্য কোনও শক্ত জিনিস থাকে তবে জিভ তাহা কেমন নাড়াচাড়া করিতে করিতে গ্রাসের ভিতর হইতে পৃথক করিয়া ফেলে এবং আগায় করিয়া এমনভাবে ঠোঁটের দিকে ঠেলিয়া দেয় যে তখন আমরা অনায়াসে তাহা হাত দিয়া বাহির করিয়া দিতে পারি।

অপর সকল মাংসপেশী অপেক্ষা জিহ্বার পেশীগুলিরই বোধ হয় অধিক ক্রিয়া হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মানুষ যখন বক্তৃতা করে তখন ইহার ক্রিয়া কত দ্রুত হইয়া থাকে। কিন্তু এই পেশীগুলি বিশেষ সবল বলিয়া সহজে ক্লান্ত হয় না। খাইবার বা কথা বলিবার সময় একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে জিহ্বা কেমন তাড়াতাড়ি নড়িয়া থাকে। এখানে আর একটী কথা তোমাদিগকে বলিয়া রাখি। কুল-গাছ-তলায় গেলে কিংবা মিঠাইএর দোকানের কাছে গেলেই জিহ্বা বড় কুমন্ত্রণা দেয়। ইহার কুপরামর্শে তোমরা কখন কিছু লুকাইয়া খাও নাই ত? ভাল খাবার দেখিলে জিভে জল আসে একথা তোমরা সকলেই জান। বিশেষতঃ টক হইলে ত কথাই নাই।

(৩) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও লালা-গ্রন্থি

তোমরা সকলেই জান যে শরীরের যে অংশ আমরা দেখিতে পাই তাহার সমস্তই চামড়া দিয়া ঢাকা। কোনও স্থান বা নরম এবং মসৃণ এবং কোনও স্থান কর্কশ এই মাত্র প্রভেদ। দেহের

বাহিরের যে চাম্‌ড়া সদা সর্ব্বদা দেখ তাহা ছাড়া দেহের ভিতরে যে পথ দিয়া খাদ্যদ্রব্য মুখ হইতে অন্ত্রের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত গমন করে, ভুক্ত দ্রব্যের এ পথটিতে এবং অপর আরও কয়েক স্থানে আর এক প্রকার চামড়া আছে তাহাকে সিক্তচর্ম্ম বা আর্দ্রত্বক (wet skin) বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (mucous membrane) বলে। দেহের ভিতরের এই চাম্‌ড়াটী সর্ব্বদা ভিজা থাকে। বাস্তবিক ইহা ত্বক নয় বলিয়া এই ভিতরের চামড়াকে 'ঝিল্লী' (membrane) বলা হইয়া থাকে। যে তরল পদার্থদ্বারা এই ঝিল্লী সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে তাহাকে 'শ্লেষ্মা' (mucous) বলে। এজন্যই ইহার নাম শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী।

শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র সাহায্যকারী যন্ত্র আছে তাহাদিগকে গ্রন্থি (glands) বলে। এই গ্রন্থিগুলির জন্যই শ্লৈষ্মিকঝিল্লীগুলি সর্ব্বদা ভিজা থাকে। রক্ত হইতে উহার অপ্রয়োজনীয় অংশ সকল টানিয়া লইয়া তাহার বহিষ্করণ অথবা তদ্দ্বারা অপর উপাদান প্রস্তুত করা গ্রন্থি সকলের কাজ। তোমরা পূর্ব্বে স্বেদ-গ্রন্থি (sweat glands) এবং তাহার ক্রিয়া সম্বন্ধে জানিতে পারিয়াছ। এইরূপে স্বেদ-গ্রন্থি ঘর্ম্মনিঃসরণ করে, যকৃৎ পিত্ত নিঃসরণ করে, মূত্র-গ্রন্থি (kidneys) মূত্র-নিঃসরণ করে ইত্যাদি।

মুখের ভিতর তিন জোড়া ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে তাহাদিগকে লালা-গ্রন্থি (salivary glands) বলে। ইহাদের মধ্যে প্রধান গ্রন্থিদ্বয় প্রত্যেক কাণের নীচে ঠিক অধঃহন্বস্থির (lower jaw-

bone) পশ্চাতে অবস্থিত। পড়িবার বা কথা বলিবার সময় এই গ্রন্থিদ্বয় হইতে লালারস নিঃসৃত হইয়া মুখ জলসিক্ত হয় এবং তদ্বারা কথা বলিবার পক্ষে সহায়তা করে।

অপর দুইজোড়া গ্রন্থির এক জোড়া চোয়ালের নীচে অবস্থিত। এই গ্রন্থি দুইটী লম্বায় প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ হইবে এবং জিহ্বার নিম্নেই ইহাদের মুখ বা দ্বার (openings)। একখানা আয়নার সম্মুখে যদি মুখ হাঁ করিয়া জিভ উপরের ঠোঁটে ঠেকাও তাহা হইলেই তোমরা অপর দুইটী গ্রন্থি স্পষ্টই দেখিতে পাইবে। যে ক্ষুদ্র চর্ম্মখণ্ডদ্বারা জিহ্বা নীচের চোয়ালের সহিত যুক্ত হইয়া আছে ঠিক সেইস্থানে জিহ্বার দুই পাশ দিয়া এই দুইটি গ্রন্থি অবস্থিত আছে। হঠাৎ কোন ভয় বা শোক সংবাদ পাইলে যে জিভ মুখ শুকাইয়া যায় তাহার কারণ এই যে, যে সকল স্নায়ু এই লালা-স্রাবি নালীগুলিকে নিয়মিত করে সেই স্নায়ুগুলি তখন অসাড় হইয়া পড়ে। কাজেই উহাদের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাওয়াতে আর লালা নিঃসৃত হইতে পারে না এবং তাহার ফলে মুখ এবং জিভ শুষ্ক হইয়া যায়।

এই লালা-গ্রন্থি সকল হইতে এক প্রকার স্বচ্ছ পাতলা তরল পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে তাহাকে লালা (saliva) বা নিষ্ঠীবন (spittle) অর্থাৎ থুথু বলে। আমরা যখন কিছু চিবাইয়া খাই তখনই লালা উক্ত ভুক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাকে সিক্ত করে, ডেলা পাকাইয়া দেয় এবং খাদ্যের শ্বেত-সার (starch) ভাগকে শর্করায় পরিণত করে। এই শ্বেতসার

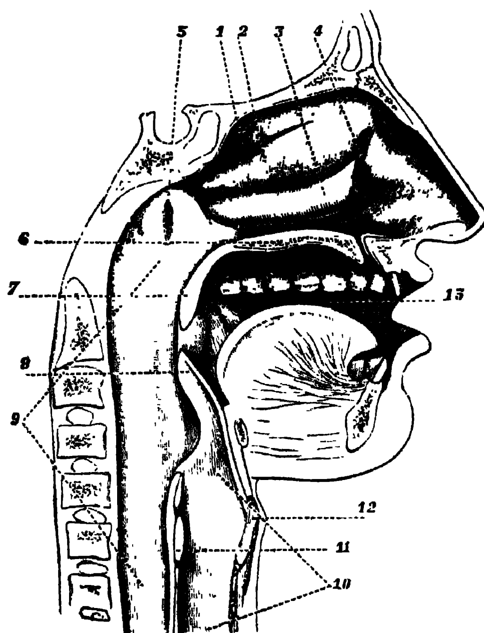
পদার্থ লালা-রসের সহিত মিশ্রিত হইবার পূর্ব্বে অদ্রবণীয় থাকে। কিন্তু যথন উহা শর্করায় পরিণত হয় তখন পাকস্থলীতে অতি সত্বরে গলিয়া যায় এবং পরিশেষে রক্তে পরিণত হয়। শিশুর বয়স ৫।৬ মাস না হইলে এরারুট, বার্লি প্রভৃতি শ্বেত-সার পদার্থ খাইতে দেওয়া উচিত নয়, কারণ ইহার পূর্ব্বে শিশুদের লালা-গ্রন্থির ক্রিয়া আরম্ভ হয় না। সিম, কড়াইশুঁটী, মটর, আলু, চাল, গোধুম, ভুট্টা প্রভৃতি শ্বেতসারবিশিষ্ট। মটর-ভাজা চিবাইলেই দেখিতে পাইবে যে উহা ডেলা বাঁধিয়া গিয়াছে। খানিকক্ষণ চিবাইলে মুখে কতকটা মিষ্ট আস্বাদন টের পাইবে।

এখন বুঝিতে পারিতেছ, লালা-রস শ্বেতসার পদার্থকে কেমন শর্করায় পরিণত করে। এই জন্যই খাইবার সময় ভাল করিয়া না চিবাইয়া তাড়াতাড়ি গিলিলে খাদ্যের সহিত লালা-রস মিশ্রিত হইতে পারে না। কাজেই পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে এবং তাহার ফলে পেটব্যথা ইত্যাদি নানা অসুখের সূত্রপাত হয়।

(৪) আলজিভ—গল-কক্ষ—লগনালী

একখানা আয়না মুখের কাছে ধরিয়া হাঁ করিয়া এ,—এ—এ—শব্দ করিলেই যে স্থান হইতে গলার ছিদ্র আরম্ভ হইয়াছে ঠিক সেই স্থানে একটী ক্ষুদ্র লম্বা কোমল মাংসখণ্ড তালু হইতে ঝুলিতেছে দেখিতে পাইবে। ইহাকেই আলজিভ (uvula) বলে (২৫ নং চিত্রের 7 চিহ্নিত অংশ) একথা বোধ হয় সকলেই জান। কিছু গিলিবার সময় আলজিভটী উপর দিকে উঠিয়া যায়।

তখন আহার্য্য দ্রব্য অতি সহজে গলপথে ঢুকিতে পারে। তালুর শেষভাগে (soft palate) আলজিভের নীচে এবং জিভের



২৫ নং চিত্র—মুখ, নাসিকাগহ্বর, গলনালী, কণ্ঠনালী প্রভৃতির অবস্থান দৃশ্য।

1, 2 & 3.—নাসার পেঁচাল অস্থিত্রয় (turbinal bones), 4.—বামদিকের অশ্রুবহা নালীর রন্ধ্র মূল (opening of the left lachrymal duct), 5.—কর্ণরন্ধ্র (Eustachiantube), 6.—কোমল তালু (soft palate), 7.—আলজিভ (uvula), 8.—উপজিহ্বা (epiglottis), 9.—উর্দ্ধভাগ গল-কক্ষ বা গলাগ্র (Pharynx), নিম্নভাগ গল-নালী (œsophagus or gullet) 10.—শ্বাস-নালী (Larynx or windpipe), 11.—কণ্ঠা (trachea), 12.—কণ্ঠ-নালীর উপাস্থি (thyroid cartilage of the larynx), 13.—জিহ্বা।

গোড়ার পিছন দিকে পত্তর দেওয়া ডালার ন্যায় একখণ্ড উপাস্থিময় পর্দ্দা আছে, তাহাকে উপজিহ্বা (epiglottis) বলে (২৫ নং চিত্রের ৪ চিহ্নিত অংশ)। গিলিবার সময় এই পর্দ্দাখানাকে মাংসপেশীতে পিছনদিকে ঠেলিয়া ধরে এবং তদ্বারা শ্বাস-নালীর (২৫ নং চিত্রের 10 চিহ্নিত অংশ) দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। আহার্য্য দ্রব্যটী গল-পথে চলিয়া যাওয়া মাত্রই ইহা পুনরায় উপর দিকে লাফাইয়া উঠিয়া স্বস্থান অধিকার করে। তখন ক্ষণকালের জন্য যে শ্বাস-ক্রিয়া বন্ধ হইয়াছিল তাহা পুনরায় চলিতে থাকে।

মুখের ঠিক পশ্চাদ্ভাগস্থিত গলদেশের অংশকে গলাগ্র বা গল-কক্ষ (pharynx) বলে (২৫ নং 9 চিহ্নিত অংশের ঊর্দ্ধভাগ)। ইহার আকৃতি কলিকা বা ধুতুরা ফুলের ন্যায়। ইহাতে পাঁচটি ছিদ্র পথ আছে, যথা—(১) একটী কর্ণরন্ধ্র (eustachian tube) হইতে আসিয়াছে, (২) একটী নাসারন্ধ্র (nasal passage) হইতে আসিয়াছে। (৩) একটী কণ্ঠ-নালীতে (larynx) গিয়াছে। (৪) একটী মুখ-বিবর হইতে আসিয়াছে এবং (৫) একটী পাকস্থলীতে গিয়াছে।

'বিষম লাগা' কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় সকলেই জান, কারণ তোমাদের মধ্যে কাহারও কখনও বিষম লাগে নাই এমন হয়ত কেহই নাই। মুখে জল পুরিয়া হাসিলে নাক মুখ দিয়া জল বাহির হইয়া কেমন কাণ্ড বাধে তাহা সকলেই দেখিয়াছ। মুখে

গ্রাস পুরিয়া বিষম খাইলে কেমন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়, কাসি আসে এবং মুখ দিয়া ফর্ ফর্ করিয়া ভাত বাহির হইতে থাকে। আবার নাক দিয়াও দুএকটা ভাত বাহির হইয়া পড়ে এবং তখন নাকের ভিতর কেমন জ্বালা করিতে থাকে। গিলিবার সময় ভুক্তদ্রব্য গল-কক্ষ হইতে গল-নালী দিয়া পাকস্থলীতে না গিয়া যদি অপর ছিদ্র-পথে ঢুকিয়া পড়ে তবেই এইরূপ হইয়া থাকে। এই সকল ছিদ্র-পথের বিশেষ বিবরণ পরে জানিতে পারিবে।

গল-নালী (Œsophagus or gullet) প্রায় ৯ ইঞ্চি লম্বা একটী সরু থলির ন্যায়। পাতকূয়ার পাটের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট মাংস-পেশীখণ্ডদ্বারা উহার দেয়াল প্রস্তুত হইয়াছে। এই পেশীগুলি স্পর্শ মাত্র ঢেউ খেলানর মত কুঁচ্কিয়া যায় এবং এইরূপে ভুক্তদ্রব্যগুলিকে পাকস্থলীর দিকে ঠেলিয়া দেয়। এই পেশীগুলির আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, ভুক্তদ্রব্য যেমন নীচের দিকে চলিয়া যায় অমনি উপরের পেশীগুলি এমনভাবে সঙ্কুচিত হইয়া চাপিয়া ধরে যে উহার ক্রমাগত নীচের দিকে যাওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না।

এই গল-নালীর তিনটী আস্তর (coats) আছে। প্রথম অর্থাৎ বাহিরের আস্তরটী সূত্রবৎ স্বতঃপ্রবৃত্ত মাংসপেশী (in-voluntary muscle fibres) দ্বারা নির্ম্মিত। এই পেশী-তন্তুর কতকগুলি নালীটির উপর নীচে লম্বাভাবে গিয়াছে, আর কতকগুলি গোলাকারে বেষ্টন করিয়া আছে। গল-নালীর চক্রাকার

পেশীগুলির সঙ্কোচন হইয়াই ভুক্তদ্রব্যকে চিপিয়া পাকস্থলীতে নামাইয়া দেয়। এই জন্যই আমরা শায়িত অবস্থায় পান বা আহার করিলেও গলায় ঠেকিয়া থাকে না। ঘোড়া বা গরুতে জল খাইবার সময় উহাদের গলার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে নীচুদিক হইতে জলগুলি কেমন উপরের দিকে উঠিতে থাকে। মুখ উচু বা নীচু করিয়া খাওয়াতে কোনও তফাৎ না হওয়ার কারণ বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিলে।

গল-নালীর দ্বিতীয় অর্থাৎ ভিতরেব আস্তরটী শ্লৈষ্মিক (mucous)। ইহাতে শ্লেষ্মা-নিঃসারক বহু গ্রন্থি (glands) আছে। মুখের ভিতরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ন্যায় উহা মসৃণ নয়, কিন্তু ভাঁজে ভাঁজে কুচ্‌কান। ইহা সমান থাকিলে যতটা লম্বা হইত কুচ্‌কান থাকাতে তাহার চেয়ে অধিক লম্বা হইয়াছে, এবং ইহাতে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা-নিঃসারক গ্রন্থি থাকাতে বহু শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া ইহাকে সর্ব্বদা সিক্ত রাখে। এতদ্দ্বারা ভুক্তদ্রব্য সহজে চলাচল করিবার পক্ষে সহায়তা করে।

গল-নালীর তৃতীয অর্থাৎ মধ্যভাগের আস্তরটী পেশলও (muscular) নয়, শ্লৈষ্মিকও (mucous) নয়। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় আস্তর দুইটী যাহাতে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া না থাকিতে পারে এমনভাবে মধ্যভাগে থাকিয়া তৃতীয় আস্তরটী প্রথম ও দ্বিতীয় আস্তর দুইটী স্পর্শ করিয়া আছে মাত্র। ভুক্তদ্রব্যটী গল-নালীর ভিতরের আস্তরটীর দুইপাশে না ঠেকিলে মধ্যভাগের আস্তরটী টের পায় না, আবার বাহিরের পেশল আস্তরটীও

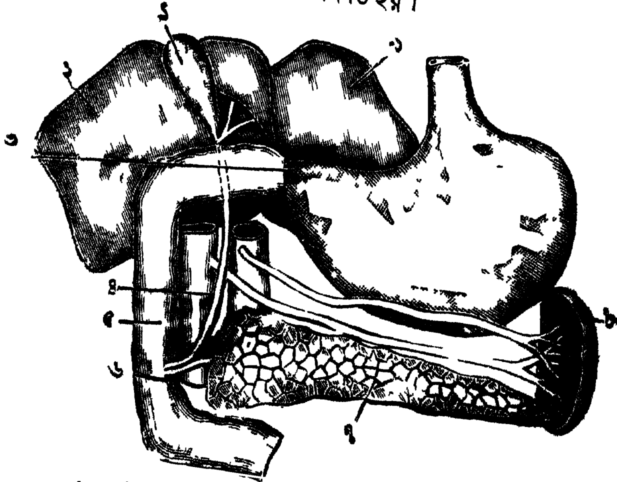
তাহার সাড়া না পাইলে উক্ত পেশীর সঙ্কোচন হইয়া পাকস্থলীতে প্রবেশের উপায় হয় না। এইজন্যই অতি ক্ষুদ্র বটিকা ইত্যাদি মুখে জল না পূরিয়া শুধু মুখে গিলিতে পারা যায় না।

(৫) পাকস্থলী

ভুক্তদ্রব্য মুখ হইতে গল-নালী দিয়া পাকস্থলীতে আসে, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই পাকস্থলীর বিশেষ বিবরণ বলিবার পূর্ব্বে উহার অবস্থান সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। পাকস্থলী হইতে আরম্ভ করিয়া ভুক্তদ্রব্যের গন্তব্য অবশিষ্ট পথ দেহকাণ্ডের যে অংশে থাকে দেহ-ঘরের নীচের তলার সেই কামরাটীকে উদর (abdomen) বলে। এই উদরভাগে পাকস্থলী (stomach), অন্ত্র (intestines) যকৃৎ (liver), পিত্ত-কোষ (gall-bladder), ক্লোম-গ্রন্থি (pancreas), প্লীহা (spleen), মূত্রাশয় (bladder) এবং মূত্র-গ্রন্থি (kidneys) প্রভৃতি আছে। ইহাদের বিশেষ বিবরণ ক্রমে জানিতে পারিবে। এক্ষণে পাকস্থলীর কথা বলা যাইতেছে।

পাকস্থলী একটী বড় থলিবিশেষ (২৭ নং চিত্রের 2 চিহ্নিত অংশ)। দেখিতে অনেকটা ভিস্তীর মোষকের ন্যায়। ইহা উদরের (abdomen) ঊর্দ্ধভাগে বামপাশে ঠিক উদর-বক্ষ-ব্যবধায়ক পেশীর (diaphragm) নীচে অবস্থিত। গল-নালী ডায়েফ্রাম্‌কে ভেদ করিয়া পাকস্থলীতে সংযুক্ত হইয়াছে। পাক-স্থলী পরিপাকের সর্ব্বপ্রধান যন্ত্র। ভুক্তদ্রব্য চর্ব্বিত হইয়া লালা-

রসের সংমিশ্রণে ডেলা বাঁধিয়া গল-নালী দিয়া (২৭ নং চিত্রের 1 চিহ্নিত অংশ) পাকস্থলীতে প্রবেশ করিবামাত্র উহার পেশী-তন্তুনির্ম্মিত আস্তরটীর অনবরত ক্রিয়া হওয়াতে ভুক্ত দ্রব্যগুলি ক্রমাগত আলোড়িত হইতে থাকে, এবং অপরদিকে জারক-গ্রন্থি (gastric or peptic glands) হইতে নিঃসৃত প্রচুর পাচক-রসে (gastric juice) মিশ্রিত হইয়া তরল আকার ধারণ করে; তৎপর ক্রমে রক্তে পরিণত হয়।



২৬ নং চিত্র—যকৃৎ, পাকস্থলী, শ্লেমগ্রন্থি (pancreas), প্লীহা এবং দ্বাদশাঙ্গুলী-নলের (duodenum) অবস্থান দৃশ্য।

১—পিত্ত-কোষ, ২ ও ৯—যকৃৎ, ৩—নির্গমদ্বার (pylorus), ৪—পিত্ত-বহানালী (bile duct), ৫—দ্বাদশাঙ্গুলী-নল (duodenum), ৬—শ্লেম নালী (pancreatic duct), ৭—শ্লেম-গ্রন্থি (pancreas), ৮—প্লীহা।

ইহার আগম ও নিগম দুইটী দ্বার। গল-নালী যেখানে শেষ হইয়াছে অর্থাৎ যে পথ দিয়া ভুক্তদ্রব্য গল-নালী হইতে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে সেইটীই আগমদ্বার। ইহাকে পাকস্থলীর হৃদ্‌যন্ত্রের সন্নিকটস্থ প্রবেশদ্বার (cardiac orifice) বলে।

দ্বিতীয়টী নিগমদ্বার। এই দ্বারটী পাকস্থলী হইতে ক্ষুদ্র-অন্ত্রের প্রবেশের পথ। ইহাকে পাকস্থলীর নির্গমন-দ্বার (pylorus) বলে (২৬ নং চিত্রের ৩ চিহ্নিত অংশ)। এই দ্বারটী দেহের অন্য স্থানের পথের ন্যায় পতর দেওয়া পর্দ্দার মত নয়, কিন্তু আমাদের মুখ যেমন হাঁ হয় ও আবার বুজিয়া যায় ইহাও ঠিক তেমনি। বুজিবার সময় কুঁচ্‌কিয়া ছিদ্র-পথ বন্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ শীস্‌ দিবার সময় মুখের যে আকার হয় এই নির্গমন-দ্বারটীও সংকুচিত হইয়া ঠিক সেই আকার ধারণ করে।

পাকস্থলীর চারিটী আস্তর আছে। তন্মধ্যে তিনটী ঠিক গল-নালীর তিনটী আস্তরের ন্যায় এবং তাহাদের ক্রিয়াও তদ্রূপ। ইহার সর্ব্বনিম্ন অর্থাৎ ভিতরের দিকের শ্লৈষ্মিক আস্তরটী দেখিতে অনেকটা মৌচাকের মত হাজার হাজার গর্ত্তে পূর্ণ। পাঁঠার ভুঁড়ি চিরিয়া তাহার ময়লা ধুইয়া ফেলিলে ভিতরটা কিরূপ দেখায় কখনও যদি দেখিয়া থাক তবে একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। মৌচাকের ছিদ্রের ন্যায় যে গর্ত্তগুলি আছে তাহার প্রত্যেকটীতে ৫।৬টী করিয়া নালী বা গ্রন্থির মুখ আছে। যখন পরিপাক-ক্রিয়া চলিতে থাকে তখন এই গ্রন্থিগুলি হইতে অনবরত একপ্রকার তরল পদার্থ নির্গত হইতে থাকে, তাহাকে

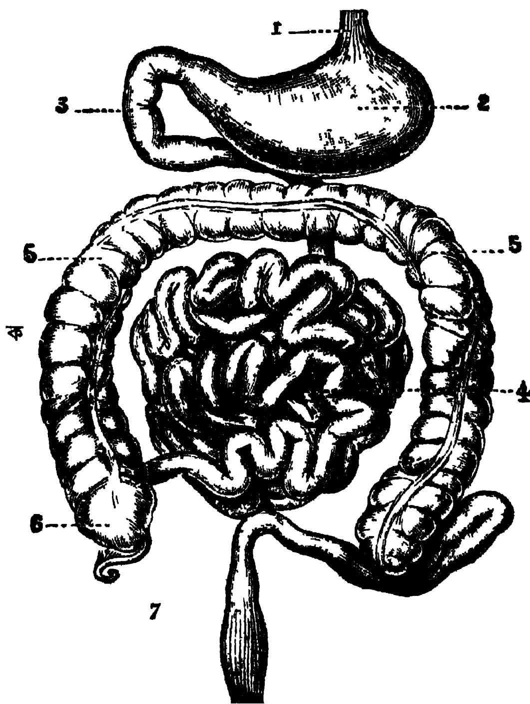
পাচক-রস (gastric juice) বলে। দিবারাত্রি অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার ভিতর এক একটী লোকের পাকস্থলীতে ৪।৫সের বা ততোধিক পাচক-রস নির্গত হইয়া থাকে। যে গ্রন্থি হইতে পাচক-রস নির্গত হয় তাহাকে জারক-গ্রন্থি (peptic glands) বলে।

পাচক-রস দেখিতে জলের মত অর্থাৎ উহার বিশেষ কোনও রং নাই। কিন্তু উহা তীব্র অম্লাস্বাদ বিশিষ্ট। চর্ব্বি এবং শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্যে (starchy matters) ইহার কোনও ক্রিয়া হয় না। কিন্তু মাংস, রুটী, পণির প্রভৃতি জন্তু ও উদ্ভিদ শরীরের সার পদার্থবিশিষ্ট খাদ্যকে (proteid matters) অতি সহজে 'পেপ্‌টোন্' (peptone) নামক দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত করে।

পাকস্থলীতে আসিয়া ভুক্তদ্রব্যের সকল অংশই একবারে তরল আকার ধারণ করে না। অর্দ্ধজীর্ণ যে ভুক্তদ্রব্য অবশিষ্ট থাকে তাহাকে 'খাদ্যমণ্ড' (chyme) বলে। কারণ পাকস্থলীতে ভুক্তদ্রব্য পাচক-রসে সিক্ত হইয়া ঘোল মওয়ার মত আলোড়িত হইতে থাকে। তাহার ফলে সমস্ত দ্রব্য মণ্ড বা কাইয়ে পরিণত হয়। ইহার কতক অংশ একবারে গলিয়া তরল আকার ধারণ করে এবং কতক অংশ মণ্ডের আকারে থাকিয়া যায়। এই খাদ্যমণ্ড বা লেইএর ন্যায় পদার্থটী তৎপরে পাকস্থলী হইতে নির্গমন-দ্বার (pylorus) দিয়া বেগে বাহির হইয়া ক্ষুদ্রঅন্ত্রের প্রথম অংশে (duodenum) নীত হয়।

(৬) অন্ত্র

অন্ত্রই (intestines) অন্নবহানালীর (alimentary canal) সর্ব্বনিম্ন অংশ। পাকস্থলীর পরেই অন্ত্রের আরম্ভ।



২৭ নং চিত্র—উদরস্থিত অন্নবহানালী (পাকস্থলী ও অন্ত্রসমূহ)।

1.—গল-নালী, 2.—পাকস্থলী, 3.—দ্বাদশাঙ্গুলী-নল (duodenum) 4.—ক্ষুদ্রঅন্ত্র (small intestines), 5.—অনুপ্রস্থ অন্ত্র-ভাগ (trans verse colon). 6.—একবন্ধ থলি (Cæcum), 7.—সরলান্ত্র (rectum), ক—ঊর্দ্ধগামী অন্ত্র-ভাগ (ascending colon), খ—অধোগামী অন্ত্র-ভাগ (descending colon).

এই অন্ত্র বা আঁতড়ী (bowels) একটী লম্বা নল বা নালী-বিশেষ। এই কোঁচ্কান নলটী নানাদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া উদরের অধিকাংশ স্থল পূর্ণ করিয়া আছে (২৭ নং চিত্র দেখ)। ইহাকে সোজাভাবে টানিয়া লম্বা করিলে আয়তনে প্রায় ১২ গজ হইবে। এত লম্বা নলটীকে পেটের ভিতর পূরিয়া রাখিতে হইয়াছে বলিয়া জড়ান পাকানভাবে রাখিবার প্রয়োজন হইয়াছে বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ। চলিত ভাষায় ইহাদিগকে 'নাড়ী-ভুঁড়ি' (entrails) বলে। আঁতড়ীকে আয়তন অনুসারে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার প্রথম বা সরু অংশকে ক্ষুদ্রঅন্ত্র (small intestine) এবং অবশিষ্ট অপেক্ষা-কৃত মোটা অংশকে বৃহদন্ত্র (large intestine) বলা হয়।

ক্ষুদ্রঅন্ত্র (small intestine) পাকস্থলীর ডানদিক হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই নলটীর ব্যাস এক ইঞ্চির কিছু অধিক এবং লম্বায় প্রায় ২০ ফিট হইবে (২৭ নং চিত্রের 4 চিহ্নিত অংশ)। অৰ্দ্ধজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীর নিগমদ্বার দিয়া বাহির হইয়া প্রথমেই এই ক্ষুদ্রঅন্ত্রে প্রবেশ করে। ইহার প্রথম অংশ অর্থাৎ ক্ষুদ্রঅন্ত্র যেখান হইতে জড়ান অবস্থায় আছে তাহার ঊর্দ্ধ ভাগকে দ্বাদশাঙ্গুলি-নল বা 'ডিওডিনাম্' (duodenum) বলে। পাকস্থলীর নিগমদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রঅন্ত্রের অংশটী (২৬ নং চিত্রের ৫ চিহ্নিত এবং ২৭ নং চিত্রের 3 চিহ্নিত অংশ) আয়তনে প্রায় ১২ অঙ্গুলি (১০ ইঞ্চি) পরিমিত বলিয়া ইহার এই নামকরণ হইয়াছে।

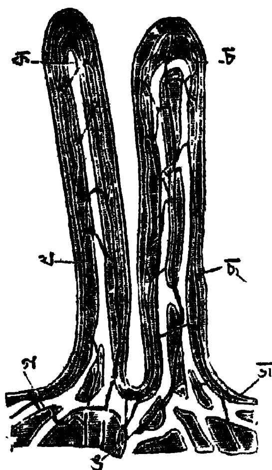
ইহাতে দুইটী ক্ষুদ্র নালী আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। এই নালী দুইটীর একটী (২৬ নং চিত্রের ৪ চিহ্নিত অংশ) পিত্ত-কোষ হইতে আসিয়াছে এবং অপরটী (২৬ নং চিত্রের ৬ চিহ্নিত অংশ) ক্লোম-গ্রন্থি হইতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। প্রথমটী দিয়া সবুজবর্ণ তিক্তাস্বাদযুক্ত একপ্রকার রস নির্গত হইয়া আসে তাহাকে পিত্ত (bile) বলে এবং দ্বিতীয়টী দিয়া (২৬ নং চিত্রের ৬ চিহ্নিত অংশ) লালা-রসের ন্যায় একপ্রকার রস নির্গত হইয়া আসে, তাহাকে ক্লোম-রস (pancreatic juice) বলে। ক্ষুদ্রঅন্ত্রের শ্লৈষ্মিক স্তর হইতেও একপ্রকার রস নির্গত হইয়া থাকে তাহাকে অন্ত্র-রস (intestinal juice) বলে। ইহাতে লালা, পাচক-রস, পিত্ত এবং জারক-রস ইত্যাদি সকল রসের উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়। ভুক্তদ্রব্যের যে অংশের উপর অন্য সকল রসের বিশেষ কোনও ক্রিয়া হয় নাই এই অন্ত্র-রসে তাহার উপরও অনেকটা ক্রিয়া হইয়া থাকে।

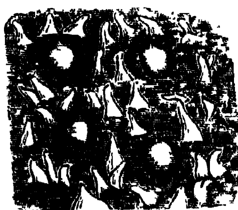
পাকস্থলীর ন্যায় অন্ত্র সমূহেরও শ্লৈষ্মিক এবং পেশল ইত্যাদি ঠিক চারিটী আস্তর আছে এবং তাহাদের ক্রিয়াও ঠিক সেইরূপ। পাকস্থলী এবং অন্ত্র উভয়ই দুপরতা একটী ঝিল্লীর আবরণ দ্বারা উদরভাগে আবৃত থাকে। ইহাকে অন্ত্রাবরণ-ঝিল্লী (pere-toneum) অর্থাৎ উদরের বেষ্টন-ঝিল্লী বলে। এই বেষ্টন-ঝিল্লীর একটী অংশদ্বারা ক্ষুদ্রঅন্ত্র মেরুদণ্ডের সহিত আবদ্ধ হইয়া ঝুলিয়া আছে। উক্ত ঝিল্লী অংশকে 'মেসেন্টারি' (mesentary) বলে।

পাকস্থলীর ন্যায় অন্ত্রের পেশীগুলিরও ক্রিয়া প্রায় অনবরত হইয়া থাকে। গল-নালী এবং পাকস্থলীর যেমন তরঙ্গবৎ গতি ইহাদেরও ঠিক তদ্রূপ। কেঁচো চলিবার সময় যেমন আঁকিয়া বাঁকিয়া যায় সমস্ত অন্ত্র-নালীগুলি ক্রমাগত সেইরূপ তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। ইহাতে অর্দ্ধজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলী হইতে অন্ত্রে আসিবার পর অন্ত্র-রসে সিক্ত হইয়া পুনরায় আলোড়িত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ নিম্নের দিকে অর্থাৎ অন্ত্রের নিম্নভাগে অগ্রসর হইতে থাকে। এইরূপে সমস্ত অন্ত্রপথ ঘুরিয়া খাদ্যের অসার অংশ মলরূপে বৃহদন্ত্রে নীত হয়।

বৃহদন্ত্র (large intestine) যদিও ক্ষুদ্রঅন্ত্র হইতে খাট কিন্তু উহা হইতে অনেকটা মোটা। ইহা লম্বায় প্রায় ৬ ফিট্ এবং ইহার বেড় ২ হইতে ৩ ইঞ্চির ভিতর। প্রথমে ইহা উদরের ডানদিকে নীচ হইতে উপরের দিকে উঠিয়াছে তৎপর মোড় ফিরিয়া যকৃত ও পাকস্থলীর নিম্নদেশ দিয়া আড়াআড়ি ভাবে উদরের বাম দিকে চলিয়া গিয়াছে এবং সেখান হইতে পুনরায় মোড় ফিরিয়া নীচের দিকে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে (২৭ নং চিত্রের ক, খ, চিহ্নিত অংশ)। বৃহদন্ত্রের এক একটী অংশকে অন্ত্র-ভাগ (colon) বলে। বৃহদন্ত্রের 5—6 চিহ্নিত অংশকে ঊর্দ্ধগামী অন্ত্র-ভাগ (ascending colon), 5—5 চিহ্নিত অংশকে অনুপ্রস্থ অন্ত্র-ভাগ (transverse colon) এবং 5 হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত খ চিহ্নিত অংশকে অধোগামী অন্ত্র-ভাগ (descending colon) বলা হয়।

গল-নালীর ভিতরের দিকের প্রথম আস্তরটীর ন্যায় ক্ষুদ্র-অন্ত্রের ভিতরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিময় আস্তরটীও কুচি দেওয়া অর্থাৎ ভাঁজ করা। অধিক পরিমাণে অন্ত্র-রস নিঃসারক গ্রন্থি সকলের স্থান করিবার জন্যই এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থির





২৯ নং চিত্র—ক্ষুদ্রঅন্ত্রের (small intestines) একখণ্ড ভিতরের স্তর (শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী)।

২৮ নং চিত্র—ক্ষুদ্র অন্ত্রের ভিতরের স্তরের দুইটী সূত্রবৎ প্রবর্দ্ধন বা উন্নয়ন (villi or shaggy hairs) শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া অঙ্কিত।

ক, চ, গ, ঘ ও জ—শোষক-নালী (lacteals),
খ, ছ ও ঙ—রক্ত-বহানালী (blood-vessels).

সহিত কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম লক্ষ লক্ষ পেশী-তন্তু সকল পাশাপাশি মিশিয়া আছে। এজন্য ক্ষুদ্রঅন্ত্রের ভিতরের দিকের আস্তরটী থস্‌থসে এবং শুঁয়া শুঁয়া, দেখিতে অনেকটা ঝাঁক্‌ড়া চুলের ন্যায় (shaggy hairs) দেখায় (২৯ নং চিত্র)। ইহারা অঙ্গুলাকৃতি

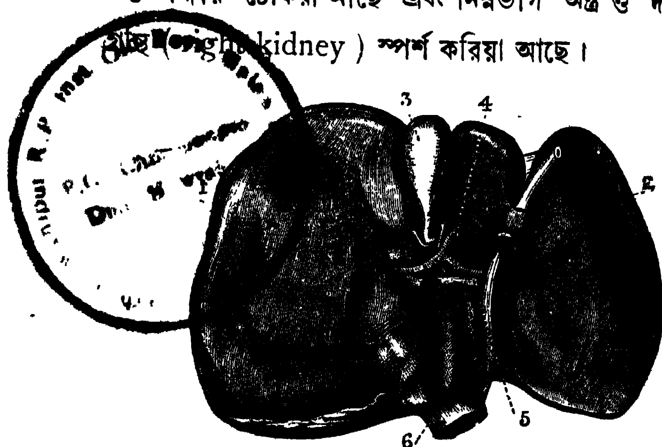
লক্ষ লক্ষ উদ্ভেদ বা প্রবর্দ্ধনবিশেষ। ইহাদিগকে উন্নয়ন (villi) বলে। অন্ত্র হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লওয়াই ইহাদের কাজ।

২৮ নং চিত্রে উন্নয়ন (villi) দুইটীকে শতগুণ বর্দ্ধিত আকারে চিত্রিত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যভাগে যে সাদা নালীর মত দেখাইতেছে উহাদিগকে দুগ্ধবৎ অন্ন-রসবহা নালী বা শোষক-নালী (lacteals) বলে। এক একটী উন্নয়ন বা 'ভিল্লির' ভিতরে কখনও বা একটী কখনও বা দুইটী করিয়া এইরূপ শোষক-নালী থাকে। চিত্রস্থিত কালরেখাগুলি অতি-সূক্ষ্ম রক্ত-বহানালী (blood-vessels) বিশেষ। অন্ত্রে ভুক্তদ্রব্য প্রবিষ্ট হওয়ার পর যেমন তরল অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে তেমনি উহার কতক অংশ অন্ন-রসবাহী শিরাতে এবং কতক অংশ ধমনীতে প্রবেশ করিতে থাকে। তৎপর যে অংশ ধমনীতে প্রবেশ করে তাহা যকৃতে নীত হয় এবং যে অংশ দুগ্ধবৎ অন্ন-রসবহানালীতে প্রবেশ করে তাহা খাদ্যের মেদময় পদার্থ।

পাকস্থলী হইতে যে অর্দ্ধজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য বা 'খাদ্যমণ্ড' (chyme) ক্ষুদ্রঅন্ত্রে প্রবেশ করে তাহা পিত্ত এবং জারক-রসে মিশ্রিত হইয়া ফিকা জরদা রং বিশিষ্ট এক প্রকার গাঢ় দুগ্ধবৎ সারাংশে পরিণত হয়। ইহাকে তখন অন্ন-রস (chyle) বলে। নবনীসদৃশ এই অন্ন-রস অন্ত্রের গোলাকার পেশী সমূহের সঙ্কোচনক্রিয়াদ্বারা যেমন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে তেমনি ইহার পুষ্টিকর অংশ সমূহকে বিন্দু বিন্দু করিয়া অন্ন-রসবাহী নালী সকল শুষিয়া লয়।

(৭) যকৃৎ—পিত্ত-কোষ

যকৃৎ (liver) ঈষৎ লাল পিঙ্গলবর্ণ প্রশস্ত যন্ত্রবিশেষ। উদরের ঊর্দ্ধভাগে ডানপাশে উদর-বক্ষ-ব্যবধায়ক পেশীর (diaphragm) ঠিক নিম্নভাগে ইহা অবস্থিত। ইহার ঊর্দ্ধভাগ উক্ত পর্দ্দায় ঠেকিয়া আছে এবং নিম্নভাগ অন্ত্র ও দক্ষিণ মূত্র-গ্রন্থির (right kidney) স্পর্শ করিয়া আছে।



৩০ নং চিত্র—যকৃতের তলদেশের দৃশ্য।

1.—দক্ষিণ বর্ত্তুলাংশ বা খণ্ড (right lobe), 2.—বাম বর্ত্তুলাংশ বা উপখণ্ড (left lobe), 3.—পিত্ত-কোষ (gall-bladder), 4.—যকৃৎ-ধমনী (hepatic artery), 5.—শিরা-তোরণ (portal vein), 6.—অধস্তন শিরা (inferior vena cava).

ইহা দুইভাগে বিভক্ত। ইহার যে ভাগ ডানদিকে থাকে সেই ভাগটী বাম পার্শ্বস্থিত ভাগ অপেক্ষা বৃহৎ (৩০ নং চিত্রের 1 চিহ্নিত অংশ)। ইহার প্রত্যেক ভাগকে বর্ত্তুলাংশ বা খণ্ড (lobe) বলে। অন্ত্রাবরণ-ঝিল্লির (Peritoneum)

দ্বারা আবৃত হইয়া ইহা স্বস্থানে রক্ষিত হয়। ইহার বহির্ভাগ অর্থাৎ উপরের অংশ সমতল এবং মসৃণ কিন্তু নিম্নভাগ অর্থাৎ পিছনের দিক কর্কশ ও বন্ধুর। তোমরা জানিয়াছ যে গ্রন্থি একপ্রকার যন্ত্রবিশেষ। ইহার বিশেষ কোনও রস-নিঃসরণের কিম্বা রক্তের প্রয়োজনানুসারে কতকগুলি অনাবশ্যক দ্রব্যকে রক্ত হইতে টানিয়া লইবার শক্তি আছে। যকৃৎও একটী গ্রন্থিবিশেষ এবং অপর সকল গ্রন্থির ন্যায় ইহারও নিঃসরণ ক্রিয়া আছে। কিন্তু তথাপি ইহার কিছু বিশেষত্ব আছে। দেহের গ্রন্থিময় যন্ত্রের (glandular organ) মধ্যে যকৃৎ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা লম্বায় প্রায় ১২ ইঞ্চি ও চওড়ায় ৬।৭ ইঞ্চি হইবে এবং ওজনেও প্রায় দেড় সের পরিমিত হইবে। গ্রন্থি সকল ধমনীদ্বারা পরিবৃত থাকে। যকৃৎও তাই, কিন্তু ইহার ভিতরের সকল শিরাই (vessels) এমন ভাবে পরস্পর চাপিয়া আছে যে কোষ, নালি এবং ধমনী প্রভৃতি যেন একত্রে চাপ বাঁধিয়া গায়ে গায়ে পিণ্ডাকার হইয়া আছে। তোমরা পাঁঠার 'মেটে' খাইতে নিশ্চয়ই ভালবাস। কিন্তু যখন এই 'মেটে' খাও তখন জান না যে এই পিণ্ডাকার পদার্থটি যকৃৎ বই আর কিছুই নয়।

মুখের লালা-গ্রন্থি অথবা পাকস্থলীর পাচক-গ্রন্থির (gastric glands) ন্যায় অধিকাংশ গ্রন্থিই রক্ত হইতে কেবল যাহা তাহাদের আবশ্যক তাহাই গ্রহণ করে, কিন্তু যকৃৎ ইহা ছাড়া আরও কিছু করে। যকৃৎ এক প্রকার রক্ত হইতে তাহার নিজের যাহা দরকার তাহাই টানিয়া লয়, আবার আর এক প্রকার

রক্ত হইতে সে রক্তের যাহা বর্জ্জন করিবার প্রয়োজন তাহা নিঃসরণ করিয়া দেয়।

যকৃৎ যেন শত শত কামরাবিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড বাড়ী এবং ইহার প্রত্যেকটি কামরা যেন এক একটি কারখানা ঘর। সেই ঘরে দিবারাত্রি কত কাজ হইতেছে। এই প্রকাণ্ড বাড়ীটিতে ঢুকিবার দুইটি পথ এবং বাহির হইবার অপর দুইটি পথ। ইহার প্রথম ফটকটিকে শিরা-তোরণ (portal vein) বলে (৩০ নং চিত্রের 5 চিহ্নিত অংশ)। তোমাদের হয়ত মনে আছে যে পাকস্থলী এবং ক্লোম-গ্রন্থির (pancreas) চতুর্দ্দিকে যে শত শত ক্ষুদ্র ধমনী আছে তাহারা যতদূর পাবে খাদ্য হইতে নানা উপাদান টানিয়া লয়। এই সকল উপাদান ধমনীদ্বারা যকৃতে নীত হয়। ইহারা যে ফটক দিয়া প্রবেশ করে তাহাকেই শিরা-তোরণ বলা হয়।

যকৃৎ-প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াই এই সকল উপাদান যে কারখানা ঘরে প্রথম নীত হয় তাহাকে ক্ষুদ্রতম গোলকাংশ বা উপখণ্ড (lobule) বলে (৩০ নং চিত্রের 2 চিহ্নিত অংশ)। এই কারখানা-ঘর খানির ব্যাস প্রায় এক ইঞ্চির দশ ভাগের এক ভাগ হইবে। এই কামরাটি অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। এখানে রক্ত যাহা চায় না অর্থাৎ রক্তের পক্ষে যাহা অনাবশ্যক তাহা নিঃসৃত হইয়া তদ্দ্বারা অপর উপাদান প্রস্তুত হয়। সেই অপর উপাদানটি হইল পিত্ত (bile)।

এখান হইতে রক্ত পুনরায় চালিত হইয়া যায় কিন্তু পিত্তকে অন্য একটি দ্বার দিয়া যকৃৎ হইতে বাহির করিয়া দেয় এবং এক পাশ দিয়া নিয়া অন্য একটি নল-পথে প্রবেশ করায়। এই পথটি যকৃতের গুদাম-ঘরে (store-room) গিয়া ঠেকিয়াছে। এই ঘরটির নামই পিত্ত-কোষ (gall-bladder) (৩০ নং চিত্রের 3 চিহ্নিত অংশ এবং ২৬ নং চিত্রের ১ চিহ্নিত অংশ)।

তোমরা সকলেই মাছের 'পিত্তি' দেখিয়াছ। এই 'পিত্ত-কোষ' তাহাই। পিত্ত প্রস্তুত হইয়া এখানে মজুত থাকে এই জন্য ইহাকে গুদাম-ঘর বলা হইয়াছে। এই পিত্ত-কোষ হইতে প্রতিদিন তিন পোয়ার অধিক পিত্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে। ইহার স্পর্শানুভূতি এত অধিক যে যে মুহূর্ত্তে খাদ্যমণ্ড (chyme) দ্বাদশাঙ্গুলি-নলে (duodenum) প্রবেশ করে, পিত্ত-কোষ তৎক্ষণাৎ তাহার সংবাদ পায় এবং যকৃৎ হইতে নিঃসৃত যে পিত্ত উহাতে মজুত করা আছে মুখ খুলিয়া তাহার খানিকটা ঢালিয়া দেয়। উহা তখন পিত্ত-নালি (২৬ নং চিত্রের ৪ চিহ্নিত অংশ) দিয়া নামিয়া আসিয়া দ্বাদশাঙ্গুলি-নলের নিম্নভাগে উক্ত নলে (duodenum) প্রবেশ করে। সেখানে পূর্ব্বোক্ত খাদ্য-মণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া এমন ভাবে উহার সহিত মিশ্রিত হয় যে উভয়ের কোন পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না।

পিত্তকে যে দ্বারটি দিয়া যকৃৎ হইতে বাহির করিয়া দেয় (৩০ নং চিত্রের 4 চিহ্নিত অংশের পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রনালী) সেই পথটীকে যকৃৎ-নালী (hepatic duct) বলে। এই পথটি

দিয়া কেবল পিত্ত বাহির হইয়া যায় তদ্ভিন্ন অপর কিছু এই পথে যাতায়াত করে না। কেবল প্রয়োজন মত পিত্ত-কোষের পেশল আবরণটির সঙ্কোচন-দ্বারা উহা হইতে পিত্ত নির্গত হইয়া যে পথ দিয়া উহা (পিত্ত) আসিয়াছিল তাহার কোণ পর্য্যন্ত আসিয়া তৎপরে অপর নালী দিয়া (৩০ নং চিত্রের 4 চিহ্নিত অংশ) ক্ষুদ্রঅন্ত্রের প্রথমাংশে (duodenum) নীত হয়।

যকৃৎ অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র। ইহার অনবরত ক্রিয়া হইতেছে। ইহার ক্রিয়ার একটু ব্যতিক্রম হইলে নানারোগ উপস্থিত হয়। একটু পরিশ্রম করিলেই যেমন তোমাদের ক্ষুধা পায়, যকৃৎ বেচারা যে দিবারাত্রি খাটিতেছে তাহারও তাই খাদ্যের আবশ্যক হয়। তাহার খাদ্য হইল টাটকা রক্ত। দেহ-ঘরের উপরের কামরায় যে দমকলের কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছ সেই দমকল অর্থাৎ হৃদ্‌যন্ত্র টাটকা এবং বিশুদ্ধ লাল টক্‌টকে রক্ত 'হাবিশ্‌' (pump) করিয়া যকৃতের দিকে চালাইয়া দিতেছে। যকৃৎ-প্রাসাদের যে দরজাটি দিয়া রক্ত প্রবেশ করে তাহাকে যকৃত-ধমনী (hepatic artery) বলে (৩০ চিত্রের 4 চিহ্নিত অংশ)।

আমরা এক্ষণে দেখিতে পাইলাম যে দুইটী বিভিন্ন প্রবেশ-দ্বার দিয়া দুই প্রকার রক্ত যকৃতে প্রবিষ্ট হইতেছে। এক প্রকার অবিশুদ্ধ রক্ত অর্থাৎ যে রক্তে অপর অতিরিক্ত পুষ্টিকর পদার্থ মিশ্রিত আছে এবং যাহা যকৃতের উপখণ্ডে (lobule) নীত হইয়া সেই সকল অবান্তর পদার্থের ক্ষয় হইয়া বিশুদ্ধ হয়। আর এক প্রকার বিশুদ্ধ টাটকা রক্ত যাহা যকৃতের খোরাক যোগায়। এই

দুই প্রকার রক্তই তাহাদের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে আবার যকৃৎ হইতে ফিরিয়া যায়। কিন্তু তাহাদের ফিরিয়া যাওয়ার একটি মাত্র পথ। কাজেই তাহারা উভয়েই একত্রে মিশিয়া যায়। যে উপায়ে এই সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহা তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না। বড় হইয়া বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিলে এই সমস্ত বুঝিতে পারিবে এবং তখন কত আনন্দ পাইবে। এক্ষণে মোটামুটি এই জানিয়া রাখ যে, দুই প্রকার রক্ত যকৃৎ হইতে নির্গত হইবার সময় একত্রে মিশিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপশিরা দিয়া বাহির হয় এবং এইরূপে নানা উপশিরা হইতে ক্রমে শিরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। এই শিরাকে যকৃৎ-শিরা (hepatic vein) বলে।

এই রক্ত যকৃৎ-শিরা দিয়া ক্রমে দেহের সর্ব্বপ্রধান অধস্তন শিরায় (inferior vena cava) নীত হয় (৩০ নং চিত্রের 6 চিহ্নিত অংশ) এবং তাহা হইতে হৃদ্‌যন্ত্রে প্রবাহিত হয়।

(৮) ক্লোম-গ্রন্থি—প্লীহা

ক্লোম-গ্রন্থি (Pancreas) দেখিতে অনেকটা গাজরের ন্যায়, একদিক্ মোটা একদিক্‌টা সরু। ২৬ নং চিত্রস্থিত ৭ চিহ্নিত অংশ দেখিলেই ইহার আকৃতি অনেকটা বুঝিতে পারিবে। ইহা একটি পিণ্ডবৎ গ্রন্থিবিশেষ। এই গ্রন্থিটি যকৃৎ হইতে অনেকটা ক্ষুদ্র হইলেও নিতান্ত ছোট নয়। ইহা লম্বায় প্রায় সাত ইঞ্চি হইবে। উদরের ঊর্দ্ধভাগে পাকস্থলীর পিছনের দিকে ইহা অবস্থিত।

ইহা হইতে একপ্রকার রস নিঃসৃত হইয়া পরিপাক ক্রিয়ার

সাহায্য করে, তাহাকে ক্লোম-রস (pancreatic juice) বলে। রক্ত হইতে ইহা কতকগুলি উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে অপর একটি দ্রব্যে পরিণত করে। তৎপরে ইহা হইতে একটি তরল পদার্থ প্রস্তুত হয়। এই তরল পদার্থই ক্লোম-রস এবং ইহাই একটি খাট নালী দিয়া (২৬ নং চিত্রের ৬ চিহ্নিত অংশ) ক্ষুদ্র-অন্ত্রের যে স্থানে পিত্ত-কোষ হইতে পিত্ত-রস আসিয়া প্রবেশ করে ঠিক্ সেই স্থানে প্রবিষ্ট হয়। তৎপরে অন্ত্রস্থিত খাদ্যমণ্ডের সহিত উক্ত উভয় রস মিশ্রিত হইয়া পরিপাক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার ক্রিয়া অনেকটা লালা-গ্রন্থির ন্যায়। আমরা ভাল করিয়া না চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিলে এই ক্লোম-গ্রন্থিকে অনেক খাটিয়া তবে পরিপাকের সাহায্য করিতে হয়। কিন্তু অতিরিক্ত খাটুনিতে সকলেই পীড়াগ্রস্ত হয় একথা তোমাদের জানা উচিত।

প্লীহা (spleen) কাহাকে বলে এবং ইহার ক্রিয়াই বা কি তাহা না জানিলেও ইহার নাম সকলেই জান। কিন্তু উহা যে কি তাহা বোধ হয় কেহই জান না। ২৬ নং চিত্রের ৮ চিহ্নিত অংশই এই প্লীহার চিত্র। হাত মুটা করিয়া ধরিলে যত বড় হয় ইহাও ঠিক্ ততখানিই হইবে এবং ওজনে ইহা একপোয়া আন্দাজ হইবে। কশাইরা ইহাকে 'তিল্লি' (milt) বলে। ইহা উদরের বাম পাশে পাকস্থলীর পিছনে থাকে। ক্লোম-গ্রন্থি এবং প্লীহা উভয়েই পাকস্থলীর পিছনে থাকে বলিয়া ২৭ নং চিত্রে উহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ না। প্লীহার রং গাঢ় বেগুনে এবং আকৃতি কতকটা ব্যাঙের ছাতার ন্যায়। ইহার নাম জানা থাকিলেও উহা

কি এবং উহার ক্রিয়াই বা কি তাহা যেমন তোমরা কেহই জান না, শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও ইহার ক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষ কিছু স্থির করিয়া বলিতে পারেন না। তাঁহারা এ কথাও বলেন যে ইহাকে উপ্‌ড়াইয়া ফেলিয়া দিলেও দেহ-যন্ত্রের ক্রিয়ার কোন বিঘ্ন ঘটে না। তবে রক্তের সহিত ইহার অনেকটা সম্বন্ধ আছে এবং ইহার বিবৃদ্ধিতে অনেক মানুষ মারা গিয়া থাকে।

(৯) খাদ্যের রক্তে পরিণতি

খাদ্য কিরূপে ক্রমে রক্তে পরিণত হয় তাহার বিষয় অনেকটা তোমরা জানিতে পারিয়াছ। এক্ষণে পুনরায় সঙ্ক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। আমরা মাংস ভাত প্রভৃতি খাইবার সময় যখন মাখিয়া একগ্রাস মুখে পূরি তখন জিভ্ ভাতকে চর্ব্বণ-দন্তের কাছে লইয়া যায় এবং শ্বদন্তদ্বারা মাংসের টুকরা ছিঁড়িয়া লই। তৎপরে পেষণ-দন্ত উহাদিগকে পিষিয়া চূর্ণ করে এবং লালা-গ্রন্থি হইতে লালা-রস নিঃসৃত হইয়া উহাতে মিশ্রিত হয়। মাংসের উপর লালা-রসের অতি সামান্যই ক্রিয়া হয় কিন্তু ভাত শ্বেতসার পদার্থ বিশিষ্ট বলিয়া উহার উপর লালা-রসের বিশেষ ক্রিয়া হইয়া থাকে। এজন্য লালা-রস ইহার শ্বেতসার পদার্থ ভাগকে তৎক্ষণাৎ শর্করায় পরিণত করে এবং তখন উহাকে রক্ত যাহাতে শুষিয়া লইতে পারে এরূপ দ্রবণীয় আকার ধারণ করে।

মাংস ভাত উক্তমরূপে চর্ব্বিত এবং লালা-রসে সিক্ত হইলে উহা তখন ডেলা বাঁধিয়া যায়। তৎপর গিলিবার সময় উপজিহ্বা

কণ্ঠ-নালীর পথটিকে এমন ভাবে ঢাকিয়া থাকে যেন কণ্ঠ-নালীর আগার উপরে তখন একটী সেতুর আকার ধারণ করে। উক্ত ডেলাটি তখন ঐ সেতুর উপর দিয়া গল-কক্ষে চলিয়া যায়। গল-কক্ষের চারিদিকের বলয়াকার মাংসপেশীগুলি তখন এক একটী করিয়া সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং ডেলাটীকে চাপিয়া ক্রমশঃ নীচের দিকে ঠেলিয়া গল-নালীতে লইয়া যায়। এইরূপে অবশেষে পাকস্থলীতে নীত হয়। তোমাদের একথা হয়ত মনে আছে যে ভুক্তখাদ্য এবং পানীয় গল-নালী দিয়া উপর হইতে নীচের দিকে পড়িয়া যায় না কিন্তু মাথা নীচের দিকেই থাক আর উপরের দিকেই থাক ভুক্তদ্রব্য গল-নালী দিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া পাকস্থলীতে নীত হয়।

চর্ব্বিত মাংস ও ভাতগুলি পাকস্থলীতে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র উক্ত যন্ত্রের পেশীর বিশেষ ক্রিয়াদ্বারা ক্রমাগত আন্দোলিত হইয়া তোলাপাড়া হইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে পাকস্থলীর ভিতরের আস্তরটি হইতে প্রচুর পরিমাণে পাচক-রস নির্গত হইতে থাকে। পাচক-রসের ক্রিয়াদ্বারা উক্ত মাংস ও ভাতের সার অংশ (proteids) অতি সত্বরে গলিয়া যায়। তখন রক্ত এই দ্রবীভূত জান্তব ও উদ্ভিদ শরীরের সার অংশ কতক এবং লালা-রসের দ্রব শর্করাময় পদার্থের কতক অংশকে পাকস্থলীর আবরণস্থিত ধমনী-দ্বারা চুষিয়া লয়। কাইএর ন্যায় অর্দ্ধজীর্ণ যে ভুক্তদ্রব্য অবশিষ্ট থাকে তাহাকে খাদ্যমণ্ড বলে। এই খাদ্যমণ্ড পাকস্থলীর ভিতর যতক্ষণ আলোড়িত হইতে থাকে রক্ত ইহার জান্তব ও উদ্ভিদ

শরীরের সার অংশবিশিষ্ট পদার্থকে ক্রমেই চুষিয়া লইতে থাকে। তৎপরে এই খাদ্য-মণ্ডকে পাকস্থলী হইতে উহার নির্গমনদ্বার দিয়া ঠেলিয়া বাহির করিয়া দ্বাদশাঙ্গুলি-নল বা ক্ষুদ্রঅন্ত্রের প্রথম-ভাগে লইয়া যায়। এইখানে পিত্ত-কোষ হইতে পিত্ত এবং ক্লোম-গ্রন্থি হইতে ক্লোম-রস নির্গত হয় এবং তৎক্ষণাৎ উক্ত খাদ্যমণ্ডের উপর উহাদের ক্রিয়া হইতে থাকে।

যে সকল মেদময় পদার্থ এখনও অবশিষ্ট আছে তাহার উপর পিত্ত-রসের ক্রিয়াদ্বারা অতি সূক্ষ্ম রেণুতে পরিণত হইলে অন্ন-রসবাহী নালী সেই সকলকে শুষিয়া লয়। এক্ষণে লালা-রসের ক্রিয়া হইবার পরে যে সকল শ্বেতসারময় পদার্থ অবশিষ্ট আছে ক্লোম-রসের ক্রিয়াদ্বারা সেই সকলকে শর্করায় পরিণত করে এবং পাকস্থলীতে পাচক-রসের ক্রিয়াদ্বারা যে সকল জান্তব ও উদ্ভিদ শরীরের সার পদার্থবিশিষ্ট অংশের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই সেই সকলকে 'পেপ্‌টোনে' (peptone) পরিণত করে। খাদ্য-মণ্ড এইরূপে পিত্ত-রস ও ক্লোম-রসের ক্রিয়াদ্বারা তৎপরে অন্ন-রসে (chyle) পরিণত হয়।

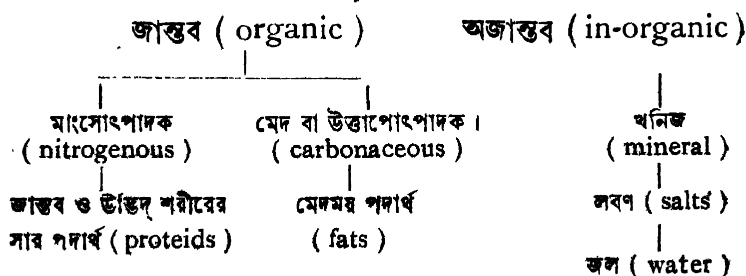
খাদ্যের সারভাগ রক্তে যাইবার দুইটী পথ। একটী সহজ ও খাট এবং অপরটী লম্বা ও ঘোরাল। অধিকাংশই এই সোজা পথে পাকস্থলী ও অন্ত্রের সর্ব্বত্র শ্লৈষ্মিক আবরণের নিম্নস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীতে নীত হয়। কিন্তু খাদ্যের মেদময় অংশ ঘোরাল পথে প্রথম ক্ষুদ্র অন্ন-রসবাহীনালীতে, তৎপর একটী বড় অন্নরস-বাহীনালীতে এবং অবশেষে রস-নলীতে (lymphatic vessel)

এবং তৎপরে দেহের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রস-বাহী শিরাতে নীত হয়। এই শিরাকে বক্ষঃনালী (thoracic duct) বলে। এই নালী-পথে উহা গ্রীবার বাম পার্শ্বের নিম্নদেশস্থিত একটী বড় শিরা-পথে রক্তে প্রবেশ করে।

জলের কোন পরিপাক-ক্রিয়ার আবশ্যক হয় না। উহা একেবারে রক্তের কৈশিক নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সমগ্র পরিপাক-নালীর অন্তর্ভাগে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অন্যান্য খনিজ আহার্য্যও মুখে কিম্বা পাকস্থলীতে অতি সত্বরে এবং সহজে দ্রব হইয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়ে রক্তে চলিয়া যায়। এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে আমাদের প্রত্যেক শারীরিক এবং মানসিক ক্রিয়া-জনিত শরীরের দৈহিক-সূত্রগুলির (tissues) যে অনবরত ক্ষয় হইতেছে, রক্ত খাদ্য হইতে সার সংগ্রহ করিয়া ক্রমাগত সেই ক্ষয় পূরণ করিতেছে।

(১০) খাদ্য এবং পানীয়

আমরা প্রতিদিন নানা প্রকার খাদ্য খাইয়া থাকি। এই সকল খাদ্যদ্রব্যকে নিম্নলিখিতরূপে বিভাগ করা যায়ঃ—



অথবা মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে মানবদেহের জন্য তিন প্রকার খাদ্যের আবশ্যক হয় যথা—(ক) মাংসোৎপাদক (খ) মেদ বা উত্তাপোৎপাদক এবং (গ) খনিজ।

(ক) প্রোটিড্‌স (proteids) বা জন্তু ও উদ্ভিদ শরীরের সার পদার্থ মাংসোৎপাদক। ইহার চারিটী উপাদান আছে। যথা অঙ্গার-সার (carbon), জলজনবাষ্প (hydrogen), অম্লজনবাষ্প (oxygen) এবং ঈষৎ গন্ধকমিশ্রিত যবক্ষারবাষ্প (nitrogen)। ইহাদের মধ্যে যবক্ষারবাষ্পের ভাগই অধিক। শরীরের সকল দৈহিক-সূত্রের মধ্যেই ইহা বিদ্যমান আছে এবং ক্রমাগত উহার ক্ষয় হইয়া থাকে। সেই ক্ষয় পূরণ করিবার জন্য এই জন্তু ও উদ্ভিদ শরীরের সার পদার্থের আবশ্যক হয়। ডিম্বের শ্বেতাংশ (albumin), দুগ্ধ ও পনীরের জৈব-পদার্থ (casein), ময়দার আটা অর্থাৎ যে পদার্থ হেতু সুজি ভিজাইলে চট্‌চটিয়া হয় (gluten), ডিমের কুসুম (yolk of egg), শিরিস (gelatine) প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। প্রায় প্রত্যেক প্রকার শাক সব্‌জী এবং তরী তরকারির মধ্যে এই মাংসোৎপাদক পদার্থ বিদ্যমান আছে। ইহাদের মধ্যে সীম, কলাই (peas) প্রভৃতি অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর। যই, যব, গম, সুজি প্রভৃতির ভিতরে মাংসোৎপাদক পদার্থ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে যবের ছাতুর মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তরকারির মধ্যে আলুর ভিতরে এই পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা কম।

(খ) মেদময় পদার্থ (fats), ফল মূলাদির শ্বেতসার (starch) পদার্থ এবং শর্করা উত্তাপদ খাদ্য। অঙ্গার-সার, অম্লজনবাষ্প,

জলজনবাষ্প এই তিনটী মেদময় পদার্থের উপাদান। তন্মধ্যে অম্লজনবাষ্পের মধ্যে অতি অল্প। চর্বি, মাখন এবং নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ তৈল ইহার অন্তর্গত। শ্বেতসার পদার্থেরও এই তিনটী উপাদান। কিন্তু উহাতে জলজনবাষ্পের ভাগ অল্প। গম, যব, যই বা জনার, রাই, চাউল, ভুট্টা, সাগু, এরারুট, আলু প্রভৃতির শ্বেতসার প্রধান উপাদান। শর্করা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, কারণ চিনির নামেই বোধ হয় তোমাদের খাইতে ইচ্ছা হইতেছে। চিনির মধ্যে আক বা বীটের চিনিই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়।

(গ) খনিজ খাদ্যের মধ্যে লবণ এবং জল প্রধান। জল সকল প্রকার খাদ্যেই বিদ্যমান আছে। লবণও অধিকাংশ খাদ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মাংস, ডিম্ব, দুগ্ধ এবং পনির প্রভৃতি তন্মধ্যে প্রধান।

দেহ রক্ষার জন্য খাদ্য ব্যতীত পানীয়েরও বিশেষ প্রয়োজন। মানুষের শরীরে জলের ভাগ এত অধিক যে উহার প্রায় তিনভাগ জল। শিশুরা সাধারণতঃ অধিক জলপান করিতে ভালবাসে। জলপানের পরিমাণ অনেকটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে সমস্তদিনে অন্ততঃ দুই সের জল অথবা তদ্রূপ কোন পানীয়ের আবশ্যক হয়। কিন্তু সুরা প্রভৃতি উগ্র পানীয়ের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। কারণ উহাতে মাংসোৎপাদক বা উত্তাপোৎপাদক কোন পদার্থ নাই। বয়স্কদের পক্ষে প্রয়োজন অনুসারে চা, কাফি প্রভৃতি তত অনিষ্টকর নয়

বটে কিন্তু শিশুদিগের পক্ষে এসকল পানীয় নিতান্ত অনাবশ্যক এবং অপকারী।

আমাদের দেহ হইতে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে অঙ্গারক এবং যবক্ষার বাষ্প নির্গত হইয়া যায়। আমাদের শরীররক্ষার জন্য এই উভয় উপাদানবিশিষ্ট খাদ্যের আবশ্যক হয়। উপরে যে সমস্ত খাদ্যের উল্লেখ করা গেল শিশুরা এ সকল কিছুই খাইতে পারে না। এইজন্য পরম কারুণিক পরমেশ্বর শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহার আহারের এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, এক প্রকার খাদ্যের মধ্যেই উল্লিখিত সকলগুণবিশিষ্ট দ্রব্য বর্ত্তমান আছে। দুগ্ধই সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন খাদ্য। মুরগী বা হাঁসের ডিমের মধ্যেও এইরূপ প্রায় সর্ব্বগুণবিশিষ্ট দ্রব্যও দেখিতে পাওয়া যায়।

দুগ্ধ জ্বাল দিয়া রাখিয়া দিলে যে সর পড়ে তাহা মেদময় বা তৈলাক্ত পদার্থবিশিষ্ট। ইহা 'মওয়াইলে' মাখন প্রস্তুত হয়। দুগ্ধে অম্লপদার্থ নিক্ষেপ করিলে ছানা কাটিয়া যায় অর্থাৎ উহার জলভাগ হইতে শক্ত নিরেট ভাগ পৃথক হইয়া পড়ে। এই নিরেট ভাগকেই ছানা বলে। ইহাই পনিরের প্রধান উপাদান মাংসোৎপাদক জৈব পদার্থ 'ক্যাসিন' (casein)। আর ছানা কাটিয়া যে জলভাগ থাকে সেই ছানার জলে একপ্রকার খনিজ পদার্থ এবং এক প্রকার শর্করামায় পদার্থ বিদ্যমান থাকে। কেবল দুগ্ধপান করিয়া কিপ্রকারে শিশুদেহের পুষ্টিসাধন হয় তাহা বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিলে।

মিশ্রিত খাদ্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আমরা যদি একপ্রকার খাদ্য ব্যবহার করি তাহা হইলে দেহ-রক্ষার উপাদান সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত উহা অতিশয় অধিক পরিমাণে খাইতে হইবে। কিন্তু ইহার ফলে এরূপ হইবে যে অনাবশ্যক উপাদানবিশিষ্ট খাদ্যের ভাগ অতিরিক্ত হইয়া পড়িবে। মনে কর, একজন কেবল আলু খাইয়া থাকিবে। তাহা হইলে শরীর রক্ষার পক্ষে যতটা যবক্ষারবাষ্পবিশিষ্ট পদার্থের প্রয়োজন আলু হইতে সেই পরিমাণ যবক্ষারবাষ্পবিশিষ্ট পদার্থ সংগ্রহ করিয়া নিতে হইলে প্রতিদিন প্রায় সাত সের আলু খাওয়ার আবশ্যক হইবে। কিন্তু এত অধিক আলু খাইতে গেলে আবার তৎসঙ্গে এত অধিক অঙ্গারকবাষ্পবিশিষ্ট দ্রব্য খাওয়া হইবে যাহা একেবারেই অনাবশ্যক। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি আলুর মধ্যে যবক্ষার-বাষ্পবিশিষ্ট পদার্থ অতি অল্প, পরন্তু অঙ্গারক-বাষ্পবিশিষ্ট পদার্থের ভাগ অত্যন্ত অধিক। এক্ষণে বোধ হয় বুঝিতে পারিলে কেবল একপ্রকার খাদ্য না খাইয়া আমাদের নানাপ্রকার খাদ্য খাইবার প্রয়োজনীয়তা কি?

আমাদের শরীররক্ষা এবং দেহের পুষ্টিসাধন যখন খাদ্য এবং পানীয়ের উপর নির্ভর করে তখন কি বালক কি বৃদ্ধ সকলেরই পানীয়ের মধ্যে কি অনাবশ্যক এবং অনিষ্টকর তাহা জানিয়া রাখা উচিত। বিশেষতঃ বালকদিগের পক্ষে ইহা আরো বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ বাল্যকালে একবার স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে চিরজীবন তাহার ফলভোগ করিতে হয়। বাস্তবিক বয়োবৃদ্ধির

সঙ্গে সঙ্গে যেমন শরীরের গঠন পূর্ণ হইতে থাকে সেই সময়ে কিরূপে দেহের সম্যক্ পুষ্টি সাধন হইতে পারে সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

যে খাদ্য এবং পানীয় অধিকবয়স্ক লোকের পক্ষে তত অনিষ্টকর নয় তাহা হয়ত অল্পবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে অপকারী হইতে পারে। কোন প্রকার সুরা বা অপর মাদক দ্রব্য কখনও স্পর্শ করা কর্ত্তব্য নয়। অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষে চা, কাফি প্রভৃতি পান করাও ভাল নয়, কারণ এই সকল পানীয় দ্রব্যের মধ্যে কোন প্রকার পুষ্টিকর দ্রব্য নাই। অধিক মাত্রায় পান বা আহার করিলে দেহের অধিক পুষ্টি সাধন না হইয়া বরং আরো রোগ জন্মায়। তাড়াতাড়ি খাওয়া এবং অধিক পরিমাণে খাওয়া উভয়ই অনিষ্টকর, কারণ ইহাতে পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মে। আমাদের প্রতিদিন এক সময়ে আহার করা উচিত। খাওয়ার সময়ের কোন ঠিক না থাকিলে পিত্ত পড়িয়া অসুখ করে একথা বোধ হয় সকলেই জান। একথাও বোধ হয় তোমাদের জানা আছে যে একমাত্র মনুষ্যই আহার্য্য দ্রব্য রন্ধন করিয়া খায়। অপর প্রাণীদিগের রন্ধনের প্রয়োজন হয় না। আমাদের খাদ্য যথোচিত সিদ্ধ করিয়া খাওয়া উচিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়া

তোমারা সকলে রক্ত নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। কারণ তোমাদের মধ্যে এমন লক্ষ্মী ছেলে মেয়ে বোধ হয় কেহই নাই যাহার কখনও হাত পা কাটে নাই কিম্বা কোনও রূপে আঁচড় লাগিয়া বা কাঁটা ফুটিয়া রক্ত বাহির হয় নাই। একটু বেশী রক্ত দেখিলেই অনেকের মাথা ঘুরিয়া যায়, আবার কেহ কেহ মূর্চ্ছাও যায়।

সামান্য রক্তপাতে দেহের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। পূর্ব্বে লোকে মনে করিত যে শরীর হইতে কিছু রক্ত বাহির করিয়া ফেলিলে স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলকব হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া থাকিলে অনেকে কপালে জোঁক লাগাইয়া রক্ত-মোক্ষণ করাইত এবং অনেক সময় বেদেনীরা কোমরের ব্যথায় বা মাথার ব্যারামে পীড়িত স্থানে কাঁক্‌লে (গাঙ্গ দাঁড়া) মাছের দাঁত ফুটাইয়া রক্ত বাহির করিত এবং তাহাতে সিঙ্গা বসাইয়া মুখ দিয়া চুষিয়া লইত। এরূপ যৎসামান্য রক্ত বাহির করাতে সুস্থ শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর হয় না বটে কিন্তু অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হইলে মৃত্যু ঘটিতে পারে। একজনের শরীরে যত রক্ত আছে তাহার অর্দ্ধেক নির্গত হইলেই সাংঘাতিক হয়।

রক্তকে 'জীবন নদী' (the river of life) বলা হয়। দেহের প্রত্যেক অংশ—চামড়া, মাংস, হাড়, এবং অপর সমস্তই

এক সময়ে রক্ত ছিল। দেহের সকল অংশই ক্রমাগত ক্ষয় হইতেছে। তবে কোন অংশ বা বিলম্বে এবং কোন অংশ বা অতি শীঘ্র এই প্রভেদ। এই ক্ষয় পূরণ করিবার জন্য রক্ত ক্রমাগত নূতন উপাদান যোগাইতেছে। রক্ত দেহগঠনের এ সকল উপকরণ কোথা হইতে পাইতেছে? খাদ্যই যে শরীরের পুষ্টিবিধান করিতেছে তাহা তোমরা জানিতে পারিয়াছ। খাদ্য কিরূপে রক্তে পরিণত হয় তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে এই রক্ত কি, এবং সমস্ত দেহে ইহার কিরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে তাহা বলা যাইতেছে।

দেহের সর্ব্বত্র পুষ্টি প্রদান করা এবং অসার ভাগকে টানিয়া লইয়া বহিষ্করণ করা রক্তের কার্য্য। বিবিধ দৈহিক-সূত্রগুলি রক্ত খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে বলা যাইতে পারে। ইহাদের যে সকল পদার্থের প্রয়োজন, রক্ত তাহা যোগাইয়া থাকে, আবার যে অসার পদার্থ উহাদের বর্জ্জন করিবার প্রয়োজন তাহা রক্তকে ফিরাইয়া দেয়। দেহের প্রত্যেক অংশকে সজীব রাখিবার জন্য দেহের সর্ব্বত্র অবাধ রক্ত চলাচলের ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, যে অংশের রক্তচলাচল বন্ধ হইবে সেই অংশের মৃত্যু ঘটিবে।

তোমরা সকলেই হয়ত হাতের চেটো সাদা করিবার খেলা জান। প্রথমে হাতের চেটোতে চাপড় দিয়া হাত মুঠা করিতে বলা হয়, পরে রক্তগুলি উপরদিকে 'চুঁচিয়ে' দেওয়া হয়। তখন হাতের চেটো একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া যায় এবং উহাতে এক-

প্রকার দুর্গন্ধ হয়। রক্তচলাচল বন্ধ হওয়াতেই এরূপ হয় এখন বোধহয় বুঝিলে।

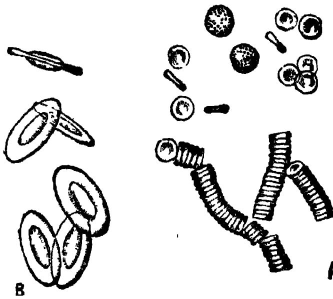
দেহের রক্তের পরিমাণ সকল সময়েই সমান থাকে না, এজন্য ঠিক পরিমাণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে মোটের উপর ইহা বলা যায় যে রক্তের ওজন সমস্ত দেহের ওজনের তের ভাগের এক ভাগ। দেহের কোন্ অংশে রক্তের পরিমাণ কত মোটামুটি এইরূপ ভাগ করা যায় যথাঃ—এক চতুর্থাংশ হৃদ্‌পিণ্ড, ফুস্‌ফুস্ ও বৃহৎ ধমনীতে, এক চতুর্থাংশ যকৃতে, এক চতুর্থাংশ অস্থি-পিঞ্জরের আচ্ছাদন-পেশীতে এবং অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশ দেহের অপর যন্ত্রাবলীতে থাকে।

দেহের ভিতরে যে অনবরত দহন-ক্রিয়া (combustion) চলিতেছে তাহাতেই দেহে উত্তাপের উদ্ভব হয়। ইহাতে উদ্যম অর্থাৎ কার্য্য করিবার শক্তি উৎপন্ন করে। বাষ্পীয় যন্ত্রের হাঁপরে কয়লা জ্বলিলেই যেমন ইঞ্জিনের চলিবার শক্তি হয় তেমনি দৈহিক-সূত্রগুলিতে দহন-ক্রিয়াদ্বারা উত্তাপ এবং কার্য্য করিবার শক্তি উৎপাদন করে। এই দহন-ক্রিয়ার সাহায্যের জন্যই রক্ত দৈহিক-সূত্রগুলিতে অম্লজনবাষ্প আনিয়া দেয়।

(১) রক্ত কি ?

রক্তের কথা তোমরা অনেকবার শুনিয়াছ। কিন্তু এই রক্ত কি পদার্থ তাহা জানিবার জন্য তোমাদের নিশ্চয়ই কৌতূহল হইতেছে। এখন যদি গা হইতে এক ফোঁটা রক্ত বাহির কর

তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে ইহা জল হইতে গাঢ়, উজ্জ্বল লালবর্ণ, তরল পদার্থবিশেষ। কিন্তু গা হইতে বাহির হইবার পরেই উহা জমাট বাঁধিয়া যাইবে এবং রংও টক্‌টকে লাল হইতে ক্রমশঃ কাল্‌চে হইতে থাকিবে। একখণ্ড পরিষ্কৃত কাচের উপর এই রক্তের ফোঁটাটী রাখিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে যে, এই তরল পদার্থটীর সমগ্র অংশ একই উপাদানবিশিষ্ট নয়। কিন্তু ঈষৎ হরিদ্রাভ জলের ন্যায় প্রায় বর্ণহীন একপ্রকার তরল পদার্থের ভিতর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার কণা-সকল ভাসিতেছে। এই সকল গোলাকার পদার্থ-গুলির আকৃতি অনেকটা বিস্কুটের ন্যায় (৩১ নং চিত্র দেখ)। এই ক্ষুদ্র কণা-গুলিকে অণু-কোষ (corpuscles) বলে।



৩১ নং চিত্র—রক্তাণুকোষ (blood corpuscles), অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যেরূপ দেখায়।

A.—লাল অণু-কোষ (red corpuscles). B.—অতিশয় বড় করিয়া আঁকা মুখমণ্ডলের লাল অণু-কোষ।

অণু-কোষ দুইপ্রকার; লাল এবং সাদা বা বর্ণহীন। ইহাদের মধ্যে লাল অণু-কোষের সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক। লাল অণু-কোষগুলিকে অতি উৎকৃষ্ট অর্থাৎ অধিক শক্তিশালী অণুবীক্ষণ-দ্বারা উহাদের প্রত্যেকটীকে পৃথক পৃথক পরীক্ষা করিলে

উহাদের রং ঈষৎ হরিদ্রাভ দেখায়। কিন্তু অনেকগুলি একত্র দেখিলে তখন লাল রং স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সাদা অণু-কোষগুলি লাল অণু-কোষগুলি হইতে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং দেখিতে ম্লান ও একেবারে বর্ণশূন্য। অণু-কোষসকল প্রায় বর্ণহীন যে তরল পদার্থের উপর ভাসমান থাকে, তাহাকে 'তরলাশয়' (plasma) বলে। অতএব দেখা যাইতেছে যে রক্তের তিনটী উপাদান যথা—

(১) লাল অণু-কোষ (red corpuscles)।

(২) সাদা বা বর্ণহীন অণু-কোষ (white corpuscles)।

(৩) তরলাশয় (plasma)।

লাল অণু-কোষ (red corpuscles) গুলি অতি ক্ষুদ্র চেপ্টা গোলাকার চাকতীর ন্যায়। ইহাদের সংখ্যা এত অধিক যে শুনিলে অবাক হইবে। এক বর্গইঞ্চিপরিমিত স্থানে উহা-দিগকে স্তূপাকার করিয়া সাজাইলে এক কোটীরও অধিক ধরিবে। এই চাকতীর ন্যায় পদার্থের মধ্যভাগ গর্ত্তের মত। কাজেই উহাদের মাঝখানটা পাতলা এবং চারিদিকের পাশগুলি পুরু। অনুবীক্ষণ-যন্ত্র দিয়া দেখিলে মধ্যভাগে আলো প্রবেশ করে কিন্তু ধারগুলি কালো দেখায়। উহারা শক্ত নিরেট নয় বরং দেখিতে অনেকটা লাল মোরব্বার অতি ক্ষুদ্র কণার ন্যায় দেখায়। উহারা নরম এবং নমনীয় বলিয়া উহাদের আয়তন হইতে ক্ষুদ্র ছিদ্র বা নালী-পথে সহজে গলিয়া যাইতে পারে।

গা হইতে এক ফোঁটা রক্ত বাহির করিবামাত্র উহার লাল

অণু-কোষগুলি ভাসিয়া বেড়ায় এবং গাড়ীর চাকার ন্যায় ঘুরিতে থাকে অথবা পরস্পর একটীর উপর আর একটী গড়াইয়া পড়ে। কিন্তু দুই তিন মিনিট পরে উহারা চট্‌চটে মত হইয়া উঠে এবং পরস্পর জোড়া লাগিয়া যাওয়ার মত হয়। কিছুকাল পরে উহাদের অধিকাংশ মুখে মুখে লাগিয়া যায়। কতকগুলি দুআনি 'থাক্' দিলে যেমন দেখায় তখন উহাদিগকে ঠিক সেইরূপ দেখায় (৩১ নং চিত্রের A অংশ)। এইরূপ থাক্ থাক্ হইয়া এক থাকের গায়ে আর এক থাক্ জুড়িয়া যায়।

বায়ু হইতে অম্লজনবাষ্প (oxygen) দেহের ভিতরে লইয়া যাওয়া ইহাদের কাজ। লাল অণু-কোষ ফুস্‌ফুসে অম্লজনবাষ্প শোষণ করিয়া লয় এবং সেখান হইতে উহাকে বিবিধ দৈহিক-সূত্র গুলিতে চালনা করিয়া দেয়। দেহের সর্ব্বত্র এই অম্লজন-বাষ্পের বিদ্যমানতা বিশেষ প্রয়োজন। ধমনীর রক্তে এই বাষ্প প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ হইয়া থাকে। লাল অণু-কোষগুলিতে আর এক প্রকার পদার্থ মিশ্রিত আছে তাহাকে 'রক্ত-গোলক' (hæmoglobin) বলে। এই পদার্থের জন্যই ধমনীর (artery) রক্তের রং টক্‌টকে লাল দেখায়। কিন্তু শিরার (vein) রক্তের রং গাঢ় লাল অর্থাৎ কতকটা কাল্‌চে বর্ণ হয়।

শ্বেত বা বর্ণহীন অণু-কোষ গুলি (white corpuscles) লাল অণু-কোষগুলির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় কিন্তু চেপ্টা ধরণের নয়। প্রকৃত পক্ষে ইহাদের কি আকার তাহা বলা কঠিন। কারণ ইহাদের আকৃতির অনবরত পরিবর্ত্তন হইতেছে। অণুবীক্ষণ-

যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে যে এই মাত্র যাহাকে গোলাকার দেখিলে পর মুহূর্ত্তেই তাহা ত্রিকোণাকৃতি হইয়া গেল, তারপরই হয়ত চতুষ্কোণ, আবার পরক্ষণই হয়ত একধার গোলাকার এবং অপরধার ত্রিকোণাকৃতি হইল। এইরূপে দেখিতে পাইবে যে তরলাশয়ের উপরে উহারা ওলট্ পালট্ খাইয়া আবর্ত্তিত হইতেছে এবং অনবরত উহাদের আকৃতির পরিবর্ত্তন হইতেছে।

শ্বেত অণু-কোষের কি কাজ তাহা বৈজ্ঞানিকেরা এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহারা মনে করেন দেহের পক্ষে যাহা বর্জ্জনীয় এই শ্বেত অণু-কোষগুলি তাহা গ্রহণ করে। একথাও মনে করেন যে রক্ত জমাট বাঁধিবার সময় ইহাদের বিশেষ কিছু ক্রিয়া হইয়া থাকে। ইহাদের সংখ্যা লাল অণু-কোষ অপেক্ষা পাঁচশত ভাগ কম। রক্তের প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণে এই লাল ও শ্বেত অণু-কোষ এবং অবশিষ্ট তরলাশয়। এই তরল পদার্থের উপরেই অণু-কোষগুলি ভাসিয়া বেড়ায়।

তরলাশয় (plasma) বা রক্তের তরলভাগ (liquor sanguinis) যদিও দেখিতে ঠিক জলের মত দেখায় তথাপি উহা শুধু জল নয়। ইহার উপাদান এবং ক্রিয়া সম্বন্ধে তোমরা এখন বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিবে না। রক্ত হইতে অণু-কোষগুলি সরাইয়া লইলে এই তরল পদার্থকে ঠিক জলের ন্যায় বর্ণহীন দেখায়। ইহাতে কতকগুলি খনিজ লবণ (mineral

salts) এবং অপর পদার্থ মিশ্রিত আছে। খানিকক্ষণ রাখিয়া দিলে ইহা গাঢ় হইয়া আসে। রক্তে এই পদার্থ বিদ্যমান থাকাতেই শরীর হইতে রক্ত নির্গত হওয়ার কিছুকাল পরেই জমাট বাঁধিয়া যায়।

রক্ত জল অপেক্ষা ঘন এবং ভারী। তরলাশয় হইতে অণু-কোষ অধিক ভারী কিন্তু পরিমাণে তরলাশয় অধিক। আবার বর্ণহীন অণু-কোষ অপেক্ষা লাল অণু-কোষের সংখ্যা এত অধিক যে লাল অনু-কোষ যে স্থলে হাজার শ্বেত অনু-কোষ সে স্থলে মাত্র তিন চারিটী হইবে। কিন্তু এই অনুপাত সর্ব্বদা ঠিক থাকে না। কারণ আহারের অব্যবহিত পরেই শ্বেত অনু-কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পুনরায় খাওয়ার সময় হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমশঃ কমিতে থাকে।

রক্তের চাপ বা জমাট বাঁধা (coagulation or clotting) বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছ। পাঁঠা কাটিবার সময় যে তরল রক্ত বাহির হয় তাহা খানিকক্ষণ পরেই জমিয়া যায় ইহা হয়ত সকলেই লক্ষ্য করিয়াছ। রক্ত শরীর হইতে বাহির হইবার সময় জলের মত তরল এবং উষ্ণ থাকে কিন্তু কিছুকাল রাখিয়া দিলেই উহা জমাট বাঁধিয়া যায় এবং তখন চাপ্ চাপ্ হাতে করিয়া তুলিয়া লইতে পারা যায়।

একটী পাত্রে কিছু রক্ত ধরিয়া রাখিলেই উহা এমন জমাট বাঁধিয়া যাইবে যে পাত্রটী উল্টাইয়া ফেলিলেও ছিট্‌কিয়া না পড়িয়া রক্তের একটী তাল হইয়া থাকিবে। এই রক্তের চাপটী

একতাল লাল মোরব্বার মত দেখাইবে, কিন্তু সত্বরেই চাপটার উপরে এবং উহার গা ও পাত্রটার গায়ের মাঝখানে এক প্রকার ঈষৎ হরিদ্রাভ জলবৎ তরল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই তরল পদার্থকে 'রসানি' (serum) অর্থাৎ রক্তের রস-ভাগ এবং পিণ্ডবৎ তালটাকে চাপ (clot) বলে।

তোমরা নিজে যদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাও তবে পাঁঠা কাটিবা মাত্র দুইটী পাত্রে কতকটা রক্ত রাখিয়া দিলে কিছুকাল পরেই দেখিতে পাইবে যে উহা চাপ বাঁধিয়া যাইতেছে। একটী পাত্রকে যদি নাড়াচাড়া না করিয়া স্থিরভাবে রাখিয়া দাও এবং একগোছা ক্ষুদ্র শাখা (twigs) লইয়া যদি অপর পাত্রটীর রক্তগুলিকে ক্রমাগত নাড়িতে থাক তবে দেখিতে পাইবে যে প্রথমোক্ত পাত্রের রক্তগুলি একেবারে চাপ বাঁধিয়া গিয়াছে এবং দ্বিতীয় পাত্রটার রক্ত তখনও তরল আছে। তবে শাখাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে সেগুলি এক প্রকার লাল নরম চট্‌চটে পদার্থে ঢাকিয়া গিয়াছে। এখন শাখাগুলিকে জলের কলের নীচে বা স্রোত-জলে গিয়া ধুইলে লাল রং আর থাকিবে না। কিন্তু এক প্রকার সাদা নরম আঁশাল পদার্থ জাল জাল মত হইয়া গায়ে লাগিয়া আছে দেখিতে পাইবে। এই সূক্ষ্ম তন্তু-বৎ পদার্থকে ইংরাজীতে 'ফাইব্রিন' (fibrin) বলে। রক্তে এই পদার্থ আছে বলিয়াই রক্ত জমাট বাঁধিয়া থাকে। ইহাকে রক্ত হইতে পৃথক করিয়া ফেলিলে আর রক্তের চাপ হয় না কিন্তু তরলই থাকিয়া যায়।

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে—

(ক) দেহ হইতে তরল উষ্ণ রক্ত বাহির হইবার পর স্থিরভাবে রাখিয়া দিলে উহা চাপ চাপ হয় অর্থাৎ জমাট বাঁধিয়া যায়।

(খ) এই জমাট বাঁধার ভিতরে দেখিতে পাওয়া যায় যে 'ফাইব্রিনে'র সূক্ষ্ম আঁশগুলি জালের মত হইয়া অনু-কোষগুলিকে বেষ্টন করিয়া পিণ্ডাকারে পরিণত করে।

(গ) রক্তকে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে নাড়িয়া এই 'ফাইব্রিন' বাহির করিয়া লইলে আর চাপ বাঁধিবে না।

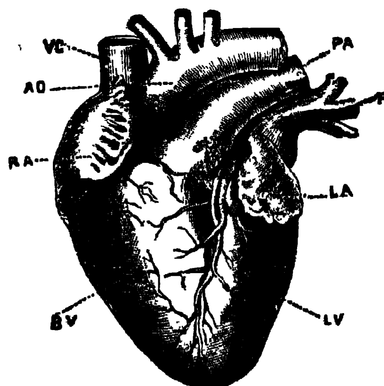
(ঘ) রক্তে এই আঁশাল সূক্ষ্ম তন্তুবৎ পদার্থ বা 'ফাইব্রিন' গঠিত হইলে রক্তের তরলাশয়ের যে ভাগ পৃথক হইয়া পড়ে তাহাকেই রক্তের রসানি (serum) বলে।

রক্তের এই চাপ বাঁধিবার শক্তি থাকাতে আমাদের কোনও অঙ্গ কাটিয়া গেলে তাহা হইতে অধিকক্ষণ রক্তস্রাব হইতে বাধা জন্মে। কারণ রক্ত দেহ হইতে নির্গত হইবামাত্র চাপ বাঁধিতে থাকে বলিয়া অতিরিক্ত রক্তস্রাবের তত সুযোগ ঘটে না। এরূপ না হইলে অনেক স্থলেই রক্তস্রাব বন্ধ না হইয়া অতিরিক্ত রক্তস্রাব জনিত মৃত্যু ঘটিত।

খানিকটা রক্তের রসানি যদি জ্বাল দিতে আরম্ভ কর তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে উহা শীঘ্রই ডিমের সাদা তরল অংশের ন্যায় সাদা এবং ঘন হইয়া গিয়াছে। রক্তের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে 'অ্যাল্‌বুমেন' (albumin) পদার্থ থাকাতেই ওরূপ হইয়া থাকে।

(২) হৃৎপিণ্ড (Heart)

তোমরা অনেকেই হয়ত পাঁঠার 'কলিজা' দেখিয়াছ। হৃৎপিণ্ডকেই চলিত ভাষায় 'কলিজা' বলে। ইহার আকৃতি অনেকটা নোনা ফলের ন্যায়। ইহা একটী ফাঁপা মাংসল যন্ত্র-বিশেষ। ইহার একধার সরু এবং একধার মোটা। স্বতঃপ্রবৃত্ত-



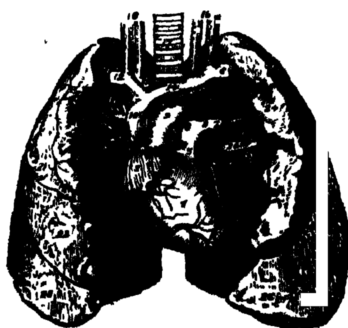
৩২ নং চিত্র—হৃৎপিণ্ড (heart)।

VC.–বৃহত্তম শিরা (vena cava), AO.–বৃহদ্ধমনী-কাণ্ড (aorta), RA.–দক্ষিণ-হৃৎকোষ (right auricle), RV.–দক্ষিণ হৃদুদর (right ventricle), PA.–ফুস্‌ফুসীয়-ধমনী (pulmonary artery), P.–ফুস্‌ফুসীয়-শিরা (pulmonary vein), LA.–বাম হৃৎকোষ (left auricle), LV.–বাম হৃদুদর (left ventricle).

পেশী-তন্তু (involuntary muscular fibre) দ্বারা ইহা নির্ম্মিত। প্রত্যেকে আপন আপন হাত মুঠা করিলে যত বড় হয় প্রত্যেকের হৃৎপিণ্ডের আয়তনও প্রায় ঠিক তাহাই হয়। ইহা রক্ত-সঞ্চালন যন্ত্রাবলীর প্রধান কেন্দ্রস্থল এবং প্রকৃত পক্ষে ইহা শিরা-

সমূহে রক্তচালনা করিবার দমকল বিশেষ। শিশুর প্রাণ-সঞ্চার হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দিবারাত্র ঘুমন্ত এবং জাগ্রতাবস্থায় ইহার ক্রিয়া অনবরত চলিতেছে।

হৃৎপিণ্ড বক্ষোগহ্বরের মধ্যস্থলে ঠিক বুকাস্থির (sternum) পশ্চাতে এবং ফুস্‌ফুস্‌দ্বয়ের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহার অগ্রভাগ (apex) অর্থাৎ সরুধার পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পর্শুকার ফাঁকে নীচের দিকে বামভাগে সম্মুখের দিকে ফিরান থাকে। ইহার গোড়া বা মূল (base) অর্থাৎ মোটা ধার উপরের দিকে দক্ষিণভাগে পশ্চাদ্দিকে ফিরান থাকে। দুপরতা থলির ন্যায় ইহার একটী ঝিল্লিময় আবরণ আছে

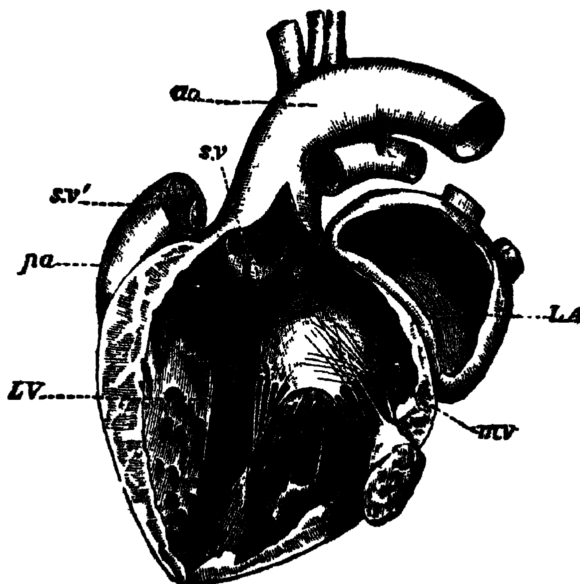


৩৩ নং চিত্র—হৃৎপিণ্ড এবং তাহার ধমনী ও শিরাসমূহ এবং ফুস্‌ফুসের অবস্থান দৃশ্য।

তাহাকে হৃদাবরণ (pericardium) বলে। এই ঝিল্লিময় আবরণটীর এক পরত অর্থাৎ অর্দ্ধেক হৃৎপিণ্ডের গায়ে লাগিয়া থাকে, তাহাতে উহার উপরিভাগে একটী অতি পাতলা ঢাক্‌নার মত হইয়া আছে এবং হৃৎপিণ্ডের মূলদেশে (base) যেস্থলে বৃহৎধমনী সকল হৃৎযন্ত্রের সহিত যুক্ত আছে সেই পর্য্যন্ত গিয়া এই ঝিল্লিময় আবরণটীর অপরার্দ্ধ বা আর এক পরত দুভাঁজ হইয়া হৃৎপিণ্ড ও তৎসংলগ্ন আবরণটী ঢাকিয়া আছে। হৃৎকোষের (auricle) এই উপরের স্তরটীর নিম্নভাগ বক্ষঃস্থল

ও উদরবক্ষ-ব্যবধায়ক পেশীর (diaphragm) উপরিভাগের সহিত সংলগ্ন হইয়া আছে।

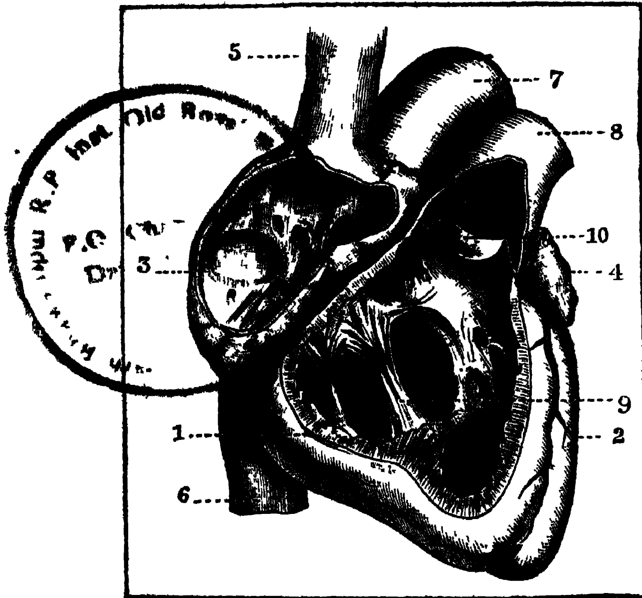
হৃদাবরণ অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের ঝিল্লীময় আবরণটার ভাঁজের মধ্য হইতে রক্তের রসানীর ন্যায় একপ্রকার তরল পদার্থ নির্গত হয়।



৩৪ নং চিত্র—হৃৎপিণ্ডের বামার্দ্ধ।

ao.—বৃহদ্ধমনী-কাণ্ড (aorta), SV.—অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাইল (semi-lunar valve), SV'.—ফুসফুসীয় ধমনীর অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাইল (semi-lunar valve of the pulmonary artery), LA—বাম হৃৎকোষ (left auricle), LV—বাম হৃদ্গহ্বর (left ventricle), pa.—ফুসফুসীয় ধমনী (pulmonary artery), mv—দ্বিকপাট (mitral valve)।

তদ্দারা হৃৎপিণ্ডের উপরিভাগ সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে এইজন্য হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াজনিত ঘর্ষণের হ্রাস হয়।



৩৫ নং চিত্র—হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণার্দ্ধ।

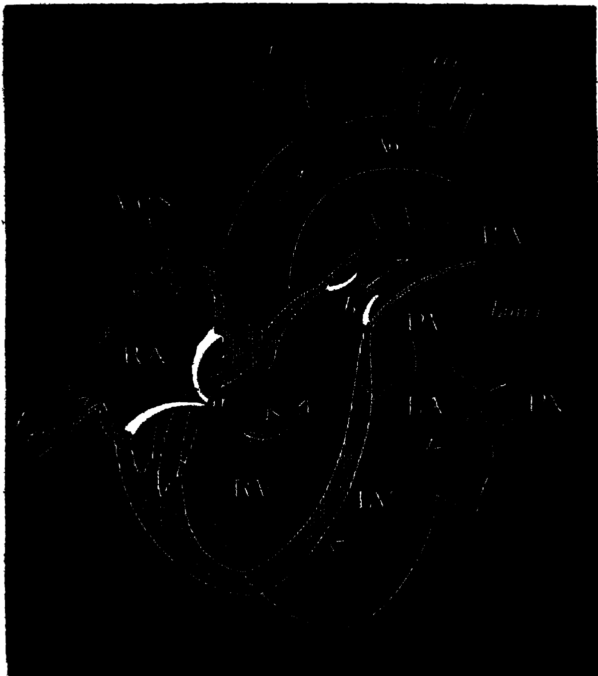
1.—বাম হৃৎকোষ ও হৃদুদরের ছিদ্র-পথ (left auricular-ventricular orifice), 2.—বাম হৃদুদর (left ventricle), 3.—দক্ষিণ হৃৎকোষের অভ্যন্তরভাগ (inside of right auricle), 4.—বাম হৃৎকোষ (left auricle), 5.—বৃহৎ ঊর্দ্ধ-শিরা (superior vena cava), 6.—বৃহৎ নিম্ন-শিরা (inferior vena cava), 7.—বৃহদ্ধমনী-কাণ্ড (aorta), 8.—ফুস্‌ফুসীয় ধমনী (pulmonary artery), 9.—সূক্ষ্ম কাঁটাময় পেশী (papillary muscle), 10.—ফুস্‌ফুসীয় ধমনীর অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাইল (semilunar valve of the pulmonary artery).

হৃৎপিণ্ডটী যেন চারি কামরাবিশিষ্ট একটী দোতলা বাড়ী। ইহার উপর তলায় দুইটী ঘর—একটী ডান ও অপরটী বামদিকে (৩২ নং চিত্রের R A এবং L R চিহ্নিত অংশ)। দোতলার ঘর দুটীতে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইবার কোনও পথ নাই। কিন্তু প্রত্যেকটী কামরার উপর তলার ঘর হইতে উহার ঠিক নীচের তলায় যাইবার পথ আছে। ইহার উপর তলার ঘর দুটীকে 'হৃৎকোষ' (auricle) এবং নীচের তলার ঘর দুটীকে 'হৃদুদর' (ventricle) বলে (৩২ নং চিত্রের RV এবং LV চিহ্নিত অংশ)। এখন হয়ত এই চারিটী ঘরের নাম মনে রাখিতে পারিবে—

দক্ষিণ হৃৎকোষ (right auricle)	বাম হৃৎকোষ (left auricle)
দক্ষিণ হৃদুদর (right ventricle)	বাম হৃদুদর (left ventricle)

হৃৎপিণ্ডের ডানদিকের দুইটী কামরায় শিরা-প্রবাহিত অপরিষ্কৃত রক্ত এবং বামদিকের দুইটী কামরায় ধমনী-প্রবাহিত নির্ম্মল রক্ত থাকে। যে পেশীখণ্ডদ্বারা এই কামরাগুলির দেয়াল প্রস্তুত হইয়াছে তন্মধ্যে হৃদুদরের পেশীনির্ম্মিত দেয়ালগুলি হৃৎকোষের দেয়াল অপেক্ষা দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ। দক্ষিণ হৃদুদরের দেয়াল অপেক্ষা আবার বাম হৃদুদরের দেয়াল অধিকতর বলবান।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে উপরের কামরা হইতে নীচের কামরায় যাওয়ার দরজা আছে অর্থাৎ দক্ষিণ হৃৎকোষ হইতে দক্ষিণ হৃদুদরে এবং বাম হৃৎকোষ হইতে বাম হৃদুদরে চলাচল করিবার যে পথ



৩৬ নং চিত্র—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার দৃশ্য।

AR.—হৃৎকোষ (auricle), AO.—বৃহদ্ধমনী-কাণ্ড (aorta). RA.—দক্ষিণ হৃৎকোষ (right auricle), LA.—বাম হৃৎকোষ (left (auricle). RV.—দক্ষিণ হৃদুদর (right ventricle), LV.—বাম হৃদুদর (left ventricle), VCS.—বৃহৎ উর্দ্ধ-শিরা (superior vena cava), VCI.—বৃহৎ নিম্ন-শিরা (inferior vena cava), PV.—ফুসফুসীয়-শিরা (pulmonary vein), PA.—ফুসফুসীয় ধমনী (pulmonary artery).

আছে উহা একটী কপাটের বাইল (valve) দ্বারা আবদ্ধ থাকে। উপরের কামরা হইতে নীচের কামরায় যাওয়ার অর্থাৎ হৃৎকোষ হইতে হৃদুদরে রক্ত চলাচলের যে পথটীর কথা উল্লেখ করিয়াছি উহা উপর তলার মেজেতে ঠিক চোরা দুয়ারের ন্যায় স্থাপিত আছে। প্রথমতঃ দক্ষিণ হৃৎকোষে রক্ত জমা হইতে থাকে, তৎপর উহা উপরোক্ত চোরা দোয়ার দিয়া হৃদুদরে প্রবাহিত হইতে থাকে। যখন চাপ পড়ে তখন সেই চাপে চোরা দুয়ারের ঢাক্‌নাটী খুলিয়া যায় এবং উপর তলা হইতে নীচের তলায় রক্ত বহিতে থাকে। ৩৬ নং চিত্রটীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেই অনেকটা বুঝিতে পারিবে। এই চোরা দুয়ারগুলি খুব পাতলা অথচ শক্ত পর্দ্দার পাল্লাবিশিষ্ট। ডানদিকের কামরার চোরা দুয়ারে তিন-খানা পাল্লা এজন্য উহাকে 'ত্রিকপাট' (tricuspid valve) এবং বাম দিকের কামরাগুলির চোরা দুয়ারের দুখানা করিয়া পাল্লা এজন্য উহাকে 'দ্বিকপাট' (bicuspid valve or mitral valve) বলে।

এই কপাটগুলি এমনি সুকৌশলে গঠিত যে হৃৎকোষ হইতে রক্ত-প্রবাহ এই পথে হৃদুদরে আসিবার কালে কিছুমাত্র বাধা-প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু হৃদুদর হইতে রক্ত-প্রবাহ হৃৎকোষে ফিরিয়া আসিবার উপক্রম করিবামাত্র উক্ত কপাটের পাল্লায় আট্‌কিয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ পথটী রুদ্ধ হইয়া পড়ে। কি করিয়া এবং কেন এরূপ হয় এ সকলের বিস্তৃত বিবরণ বড় হইয়া বিজ্ঞান পাঠ করিলে জানিতে পারিবে।

যখন ডান দিকের নীচের কামরাটী অর্থাৎ দক্ষিণ হৃদুদর রক্তদ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠে তখনই উহার দেয়ালের পেশীর হঠাৎ আকুঞ্চন হয় এবং এক ঝলক রক্ত মুহূর্ত্ত মধ্যে একটী বড় নল-পথে বাহির হইয়া যায়। এই নল-পথটীকে 'ফুস্ফুসীয় ধমনী' (pulmonary artery) বলে। এইরূপে যেমন ঝলকে ঝলকে হৃদুদর হইতে ফুস্ফুসের ভিতর রক্ত প্রবাহ বহিতে থাকে অমনি প্রতি আকুঞ্চনে হৃৎকোষ হইতে নূতন রক্ত-প্রবাহ আসিয়া হৃদুদর পুনরায় পূর্ণ হইতে থাকে। এইরূপে অবিরাম হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া চলিতেছে। এই ক্রিয়া বন্ধ হইবামাত্রই মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে।

(৩) ধমনী (Artery)

ধমনী (artery), শিরা (veins) এবং কৈশিক-নাড়ী (capillaries) প্রভৃতিই দেহের রক্ত-বহানালী (blood-vessels)। ইহারা রক্ত বহিবার সরু মোটা নল বা চুঙ্গী-বিশেষ। প্রথমে ধমনীর বিষয় বলা যাইতেছে।

ধমনীর তিনটী আবরণ আছে অর্থাৎ ইহা তেপরতা বা তিন ভাঁজ করা পুরু একটী রবারের নলের ন্যায়। ইহার বাহিরের আবরণটী মাংসপেশী-নির্ম্মিত এবং অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক (elastic) ও পুরু। ভিতরের আবরণটীর প্রায় সমস্তটাই স্থিতিস্থাপক এবং অতি পাতলা চামড়া দেওয়া। ইহাতে সহজে রক্ত চলাচল করিবার বিশেষ সুবিধা হয়।

ধমনীগুলি (arteries) হৃৎপিণ্ড হইতে ফুস্‌ফুসে এবং দেহের সর্ব্বত্র রক্ত বহন করিবার নালীবিশেষ। ধমনীর অধিকাংশ প্রধান প্রধান মূলগুলি দেহের গভীর দেশে নিহিত আছে কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা দেহের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহারা ঠিক যেন জলের কলের নলের ন্যায়।

প্রথমেই বলিয়াছিলাম যে হৃদ্‌যন্ত্র যেন একটী দমকল। এখান হইতে রক্ত সকল দমকলের ন্যায় শরীরের চারিদিকে চালনা করে। তোমাদের মধ্যে যাহারা বড় বড় সহরে বাস কর তাহাদের অনেকেই হয়ত জলের কল দেখিয়াছ। সহরের একস্থানে দমকল স্থাপন করিয়া তথা হইতে মাটীর নীচ দিয়া জল বহিবার নল সকল সহরের চারিদিকে লইয়া যাওয়া হয়। দমকল হইতে প্রথমে যে নলটী বাহির করা হয় তাহা বেশ মোটা থাকে।

বড় বড় রাস্তা দিয়া সেই বড় বড় নল চলিয়া ক্রমে যতদূরে এবং অলি গলিতে গিয়াছে উহা ততই সরু হইয়া আসিয়াছে। কলে পরিষ্কৃত জল প্রথমতঃ দমকলের চাপে মোটা নল দিয়া বেগে প্রবাহিত হয় এবং ক্রমে বহু সংখ্যক সরু সরু নল দিয়া সহরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

হৃদয় যন্ত্রটীও যেন একটী জলের দমকল। এখানে দিবা-রাত্র অবিশ্রান্ত কল চলিতেছে এবং দমকলের চাপে যেমন নির্ম্মল সুস্বাদু পানীয় জল নল দিয়া প্রবাহিত হয় সেইরূপ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ায় নির্ম্মল সতেজ রক্ত ধমনী সকল দিয়া অবিরাম প্রবাহিত

হইতেছে। জলের দমকলের বরং বিরাম আছে কিন্তু ইহার আর বিরাম নাই; যেদিন বিরাম সেই দিনই মৃত্যু।

এইরূপ বৃহদ্ধমনী-কাণ্ড (aorta) যেন দমকল সংলগ্ন প্রধান নল। বড় বড় নল হইতে যেমন ক্রমে ছোট, তারপর আরও ছোট নল সহরের বড় রাস্তা হইতে ক্রমে গলি ঘুজিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ধমনীগুলিও ঠিক সেইরূপ।

হৃৎপিণ্ডের সহিত ধমনী এবং শিরা সকলের সংযোগ রহিয়াছে। ৩৫ নং চিত্রের 5 ও 6 চিহ্নিত অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে যে দেহের দুইটী বৃহত্তম শিরা দক্ষিণ হৃৎ-কোষের (right auricle) সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। এই শিরা দুইটীর একটীর মুখ ঊর্দ্ধদিকে, উহার নাম 'বৃহৎ ঊর্দ্ধ-শিরা' (superior vena cava) এবং অপরটীর মুখ নিম্নদিকে, উহাকে 'বৃহৎ নিম্ন-শিরা' (inferior vena cava) বলে। এই বৃহৎ নিম্ন-শিরার হৃৎকোষে প্রবেশ করিবার পথটী একটী কপাটের বাইলদ্বারা এমন ভাবে রক্ষিত থাকে যে শিরা হইতে রক্ত-প্রবাহ এই পথে হৃৎকোষে প্রবেশ করিতে পারে কিন্তু হৃৎকোষ হইতে কোন রক্ত শিরাতে ফিরিয়া যাইতে পারে না। দেহের নানা-স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা সমূহে যে সকল কাল্‌চে রং-এর অপরিষ্কৃত রক্ত জমা হয় সেই সকল অপরিষ্কৃত রক্ত উপরোক্ত দুইটী বৃহত্তম শিরাদ্বারা দক্ষিণ হৃৎকোষে প্রবিষ্ট হয়। বৃহৎ ঊর্দ্ধ-শিরা (superior vena cava) মস্তক এবং দেহের ঊর্দ্ধভাগ হইতে এবং বৃহৎ নিম্ন-শিরা (inferior vena cava) দেহের অপর

সকল নিম্নভাগ হইতে শিরাস্থিত রক্ত সমূহ লইয়া হৃৎকোষে চালনা করে।

ফুস্‌ফুসীয় ধমনী (pulmonary artery) দক্ষিণ হৃদুদর (right ventricle) হইতে উদ্‌গত হইয়াছে (৩৫ নং চিত্রের ৪ চিহ্নিত অংশ এবং ৩৬ নং চিত্রের PA চিহ্নিত অংশ)। ইহার প্রবেশ-পথটী একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার কপাট (semilunar valve) দ্বারা এমন ভাবে সুরক্ষিত যে হৃদুদর হইতে ধমনীতে রক্ত চালিত হইবার সময় এই অর্দ্ধচন্দ্রাকার কপাটের বাইলটী খুলিয়া যায়। কিন্তু যখনই ধমনী হইতে রক্ত-প্রবাহ হৃদুদরে ফিরিয়া আসিতে উদ্যত হয় তৎক্ষণাৎ উক্ত পথটী একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

ফুস্‌ফুসীয় ধমনী (pulmonary artery) হৃৎপিণ্ড হইতে নির্গত হইয়াই দুইটী নালীতে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার একটী ডানদিকের ফুস্‌ফুসে (right lung) এবং অপরটী বামদিকের ফুস্‌ফুসে (left lung) গিয়াছে (৩৩ নং চিত্র দেখ)। ঊর্দ্ধগ ও নিম্নগ বৃহৎ শিরাদ্বয় সমগ্র দেহ হইতে কাল্‌চে রংএর যে অপরিষ্কৃত রক্ত হৃৎপিণ্ডে লইয়া আইসে ফুসফুসীয় ধমনী হৃৎপিণ্ড হইতে সেই অপরিষ্কৃত রক্ত ফুস্‌ফুসের ভিতর চালনা করে। ফুস্‌ফুসের ভিতর এই রক্ত শোধিত এবং জীবনধারণোপযোগী প্রচুর অম্লজনবাষ্পে (oxygen gas) পরিপূর্ণ হইয়া পুনরায় সঞ্চালিত হয়।

বাম হৃৎকোষে (left auricle) চারিটী ফুস্‌ফুসীয় শিরার (pulmonary veins) মুখ সংযুক্ত আছে (৩২ নং চিত্রের

P চিহ্নিত অংশ)। ইহার দুইটী শিরা ডানদিকের ফুস্‌ফুস হইতে এবং অপর দুইটী শিরা বামদিকের ফুস্‌ফুস হইতে আসিয়াছে। এই চারিটী শিরাই ফুস্‌ফুস হইতে শোধিত রক্ত পুনরায় হৃৎপিণ্ডে লইয়া আইসে। এই শোধিত রক্তই অম্লজনে পরিপূর্ণ এবং ইহার রংও উজ্জ্বল টক্‌টকে লাল।

বৃহদ্ধমনী-কাণ্ড (aorta) বাম হৃদুদর হইতে উদ্গত হইয়াছে (৩৪ নং চিত্রের ao চিহ্নিত অংশ)। এই ধমনীটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা প্রায় বৃদ্ধাঙ্গুলীর ন্যায় মোটা। ফুস্‌ফুসীয় ধমনীর প্রবেশ-পথের ন্যায় ইহারও প্রবেশ-পথ একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার কপাটদ্বারা সুরক্ষিত। এই পথে হৃদুদর হইতে বৃহদ্ধমনী-কাণ্ডে রক্ত চালিত হইতে পারে কিন্তু হৃদুদরে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে বাধা প্রাপ্ত হয়। জীবনদায়ী সতেজ যে নির্ম্মল রক্ত দেহের সর্ব্বত্র পরিচালিত হইয়া থাকে তাহা এই বৃহদ্ধমনীই হৃৎপিণ্ড হইতে বহিয়া আনে।

তোমরা দেখিতে পাইলে যে বৃহৎ শিরা সকল হৃৎকোষে প্রবেশ করিতেছে এবং ধমনী সকল হৃদুদর হইতে উদ্গত হইতেছে। আবার ধমনী সকল নির্ম্মল সতেজ টক্‌টকে লাল রক্ত এবং শিরা সকল কাল্‌চে রংএর অপরিষ্কৃত রক্ত বহন করে। কিন্তু ফুস্‌ফুসীয় ধমনী ও শিরার বেলায় অন্যরূপ। ফুস্‌ফুসীয় ধমনী দক্ষিণ হৃদুদর হইতে অপরিষ্কৃত রক্ত ফুস্‌ফুসে লইয়া যায় এবং ফুস্‌ফুসীয় শিরা সমূহ ফুস্‌ফুস হইতে শোধিত রক্ত বাম হৃৎকোষে আনয়ন করে।

দেহের বৃহৎ ধমনী এবং দেহের বৃহৎ শিরা সকল হৃৎপিণ্ডের বিপরীত দিকে সংযুক্ত আছে এবং ফুস্‌ফুসের বৃহৎ ধমনী ও ফুস্‌ফুসের বৃহৎ শিরা সকলও ফুস্‌ফুসের বিপরীত দিকে সংযুক্ত রহিয়াছে। আবার ফুস্‌ফুসের ধমনী যেদিক হইতে আসিয়া হৃৎপিণ্ডে সংলগ্ন হইয়াছে দেহের শিরা সকলও হৃৎপিণ্ডের সেই-দিকেই আসিয়া যুক্ত হইয়াছে।

(৪) শিরা (Veins)

রক্ত-বহানালীর মধ্যে শিরাসমূহই ফুস্‌ফুস্‌ এবং দেহের অপর সকল অংশ হইতে রক্ত সকলকে হৃৎপিণ্ডে পুনঃ সঞ্চালিত করে। অধিকাংশ শিরা দেহের উপরিভাগে ঠিক ত্বকের নীচেই থাকে। এমন কি অনেক সময় চামড়ার উপর হইতেই উহা দেখিতে পাওয়া যায়। চলিত ভাষায় উহাকে 'কালশিরা' বলে। শরীরের প্রায় সর্ব্বত্রই শিরা দেখিতে পাইবে। ইহাদের আরম্ভ ভাগ অতি সরু নলাকার কিন্তু ক্রমে উহারা বড় বড় নালীর সহিত নদী ও শাখানদীর ন্যায় যুক্ত হইয়া অবশেষে হৃৎকোষে সংযুক্ত বৃহৎ শিরায় পরিণত হইয়াছে।

ধমণীর ন্যায় শিরা সমূহেরও তিনটী আবরণ অর্থাৎ উহাদের গাও তেপরতা, তবে উহাদের পরত বা ভাঁজগুলি তত পুরু নয় কিন্তু অতি পাতলা এবং থলথলে। শিরার গা অর্থাৎ ভিতরের আবরণটী অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্ম্মকোষ বা থলির ন্যায় ভাঁজে ভাঁজে পূর্ণ। পূর্ব্বে যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার কপাটের উল্লেখ করিয়াছি এ

গুলিও ঠিক সেইরূপ কপাটের বাইলের (valve) কাজ করে। অর্থাৎ উহারা হৃদ্‌যন্ত্রের দিকে রক্তচালনা করিতে দেয় কিন্তু রক্তের গতি বিপরীত দিকে হইলেই এই চর্ম্মকোষগুলিতে বাধা প্রাপ্ত হয়।

ধমনী সমূহকে যেমন বড় একটী সহরের জলের কলের নলের সহিত তুলনা করা হইয়াছে তেমনি শিরাগুলিকেও মৃত্তিকানিম্নস্থ অপর এক প্রকার নলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই নলগুলি ক্ষুদ্রাকার হইতে ক্রমে বৃহদাকারে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্তটী যেমন জলের কল এটী তেমনি নগরের ভূগর্ভস্থ পয়ঃ-প্রণালী। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা কখনও কলিকাতা সহর দেখ নাই তাহারা হয়ত একথা বুঝিতে পারিতেছ না। নগরের মল-জলাদি নিকাশের ব্যবস্থার জন্য এখানে মাটীর নীচে শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট নর্দ্দমা সকল রহিয়াছে।

তোমরা পূর্ব্বে জানিয়াছ যে সুস্বাদু নির্ম্মল পানীয় জল নল-যোগে সহরের চারিদিকে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। গৃহস্থগণ বাড়ীতে বসিয়া কল টিপিলেই ইচ্ছামত জল পাইতে পারেন। এই সকল জল সহরবাসীগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। নানাকাজে জল ব্যবহৃত হইয়া উহা পুনরায় অপরিষ্কৃত হয়। এই ব্যবহৃত অপরিষ্কৃত জল বাড়ীতে জমিয়া যাহাতে গৃহ অস্বাস্থ্যকর এবং নানা অসুবিধা উৎপাদন না করে তজ্জন্য জল নিকাশের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। প্রতি বাড়ী হইতে ছোট ছোট নর্দ্দমা দিয়া এই জল রাস্তায় আসিয়া পড়ে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি হইতে ক্রমে

বড় রাস্তায় আসিয়া পড়ে। এইরূপে জল নিকাশের নর্দ্দমা বা নলপথ ক্রমে বড় হইতে থাকে এবং অবশেষে সেই সকল অস্বাস্থ্যকর ময়লা জলরাশিকে সহরের বাহিরে বহুদূরে লইয়া যাওয়া হয়।

দেহের শিরাসমূহও ঠিক এই পয়ঃপ্রণালীর ন্যায়। ধমনী সকলদ্বারা নির্ম্মল স্বাস্থ্যকর যে রক্ত আনীত হয় তাহা দেহের পেশী-তন্তুসমূহে ব্যবহৃত হয় এবং ক্রমে দেহের মল সংযুক্ত হইয়া পুনরায় অপরিষ্কৃত হইয়া পড়ে। শিরাই তখন দেহের পেশী-তন্তু সমূহ হইতে উক্ত অপরিষ্কৃত রক্ত বহিয়া নিয়া পয়ঃনালীর কাজ করে।

(৫) কৈশিক-নাড়ী (**Capillaries**)

কৈশিক-নাড়ী (capillaries) কেশের ন্যায় সরু রক্ত-বহানালীবিশেষ। চুল, নখ, দাঁত এবং উপত্বক প্রভৃতি ব্যতীত দেহের এমন স্থান নাই যেখানে এই কৈশিক-নাড়ী জালের ন্যায় ছড়াইয়া না পড়িয়াছে। এই ক্ষুদ্র নালী-জাল এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে তোমার গায়ের চামড়ার এমন কোনও স্থান পাইবে না যেখানে একটী সূক্ষ্ম সূচের আগা ফুটাইবামাত্র ইহাদের কোনও একটা বা ততোধিক নালীতে আঘাত না লাগিবে এবং রক্ত বাহির না হইবে। চুলের মত সরু এই নালীগুলি এতই সূক্ষ্ম যে সহজ চক্ষে দেখা যায় না। ইহাদের গা গুলি এত পাতলা

এক পরত৷ অতি কোমল ঝিল্লীদ্বারা গঠিত যে উহা ভেদ করিয়া রক্তের রসানী চলাচল করিতে পারে।

তোমরা জানিয়াছ যে রক্ত ধমনীদ্বারা হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হয় এবং শিরাদ্বারা হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। এখানে স্বভাবতঃই তোমাদের মনে হইতেছে যে রক্ত ধমনী হইতে শিরায় কি করিয়া প্রবেশ করে ? এই কৈশিক-নাড়ী রক্তের ধমনী হইতে শিরায় যাওয়ার সেতুর কাজ করে। ধমনী যেখানে ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাকার হইয়া শেষ হইয়াছে, সেখান হইতে কৈশিক-নাড়ীর এক প্রান্তযুক্ত হইয়াছে, আবার যেখান হইতে ক্ষুদ্রশিরা আরম্ভ হইয়া ক্রমে বড় হইতে চলিয়াছে সেই শিরার আরম্ভ স্থানে কৈশিক-নাড়ীর অপরভাগ যুক্ত হইয়াছে।

এইরূপে দেহের পেশীতন্তু সমূহের পুষ্টি, পূরণ এবং বল-বিধান হইয়া থাকে। রক্ত আবার জীর্ণ দৈহিক-সূত্র সমূহের (tissues) ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ সকলকে কুড়াইয়া কৈশিক-নাড়ী সমূহে লইয়া যায়। এই ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ সকল অবশেষে মূত্রাশয়, ফুস্‌ফুস্, ত্বক প্রভৃতি বহির্নিঃসারক এবং শোধক যন্ত্রাবলীদ্বারা রক্ত হইতে পৃথকভূত হয়।

(৬) নাড়ী ও হৃৎপিণ্ডের গতি

তোমাদের অসুখ করিলে ডাক্তার বা কবিরাজ আসিয়াই প্রথমে নাড়ী টিপিয়া থাকেন তাহা জান। আর ভয় পাইলেই বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে থাকে এটাও বোধ হয় বেশ জান।

বুকের বামদিকে হৃৎপিণ্ডের উপর কান পাতিলেই স্পন্দনের শব্দ পাওয়া যাইবে। এই শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবে যে উহা তালে তালে ঠিক সমান ভাবে হইতেছে। প্রথম শব্দটী একটু লম্বা তালে, তারপরটী একটু দ্রুত এবং পরক্ষণই বিরাম। ইহার পরই আবার সেই একই তাল মানে শব্দ—যেন বলিতেছে "লাব্—ডাপ" "লাব্ডাপ্", এবং পরক্ষণই চুপ। এইরূপে রাত্রিদিন অবিশ্রান্ত এই স্পন্দন চলিয়াছে।

যখন কোনও ধমনী কাটিয়া যায় তখন রক্তপ্রবাহ সমানে একভাবে বাহির না হইয়া ঝলকে ঝলকে তীর বেগে নির্গত হইতে থাকে। এই ঝলকে ঝলকে বাহির হওয়ার একটা মাত্রা আছে তাহা যেন হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের অনুরূপ।

যখন কোন শিরা কাটিয়া যায় তখন রক্তপ্রবাহ তীর বেগে নির্গত না হইয়া গড়াইয়া পড়ে বা বিন্দু বিন্দু করিয়া ক্ষরিতে থাকে। ইহার কারণ এই যে ধমনীর সহিত নাড়ীর যোগ রহিয়াছে কিন্তু শিরার সহিত হৃদয়-স্পন্দনের বা নাড়ীর কোন যোগ নাই।

কবিরাজ বা ডাক্তার আসিয়া দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে নাড়ী (pulse) দেখিয়া থাকেন তাহা তোমরা অবশ্যই দেখিয়াছ। এই নাড়ীর স্পন্দন বা গতিও হৃদয়ের স্পন্দনের অনুরূপ। কব্জির কাছে করাস্থির পার্শ্বস্থিত যে ধমনীর ভিতর দিয়া হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত-প্রবাহ সঞ্চালিত হয় তাহাই নাড়ী। ঝলকে ঝলকে রক্ত-প্রবাহ যেমন ধমনীতে সঞ্চালিত হয় ধমনীরও তেমনি হৃৎপিণ্ডের

স্পন্দনবৎ স্পন্দন হইয়া থাকে। এজন্য ধমনীতে যে স্পন্দন অনুভূত হয় তাহা হইতেই হৃদয় স্পন্দনের ফলাফল জানিতে পারা যায়। এই ধমনী বা নাড়ীর স্পন্দন হাতের কব্জীতে, পায়ের গাঁইটে, গলায় এবং কপালের রগে অনুভূত হইয়া থাকে।

হৃতুদরের (ventricles) প্রত্যেক স্পন্দন বা আকুঞ্চনে কতক পরিমাণ রক্ত হৃতুদর হইতে বৃহদ্ধমনী-কাণ্ডের (aorta) ভিতরে বেগে প্রবিষ্ট হয়। এখন বৃহদ্বমনী-কাণ্ডে এই অতিরিক্ত এক ঝলক রক্ত প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেই উহা রক্তে পরিপূর্ণ ছিল। এদিকে আবার বৃহদ্ধমনী-কাণ্ডে একবার রক্ত প্রবিষ্ট হইলে উহার আর হৃতুদরে ফিরিয়া যাওয়ার উপায় নাই। কারণ উহাতে যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার কপাটটী আছে তাহা ফিরিয়া যাবার পথটী রুদ্ধ করিয়া থাকে। কাজেই এই অতিরিক্ত এক ঝলক রক্তের যায়গা করিবার জন্য বৃহদ্ধমনী-কাণ্ডের হৃৎপিণ্ডের সংলগ্নস্থ অংশটী প্রসারিত হয়। তৎপর হৃতুদর খালি হওয়ামাত্র বৃহদ্ধমনী-কাণ্ডকে স্ফীত করিবার জন্য নূতন রক্তের ঝলক না আসাতে উহা পুনরায় সঙ্কুচিত হইতে থাকে। ধমনী-প্রাচীরের এই সঙ্কোচন-ক্রিয়ার ফলে একদিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকার কপাটের বাইলটী বন্ধ হইয়া বৃহদ্ধমনী-কাণ্ড হইতে রক্তপ্রবাহ হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া যাইতে বাধা দেয় এবং অপরদিকে বৃহদ্ধমনী-কাণ্ডের যে অংশ অতিরিক্ত রক্ত-ঝলকে স্ফীত হইয়া পরে সঙ্কুচিত হইল ঠিক তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী অংশে নূতন এক ঝলক রক্ত দিয়া তাহাকে আবার তেমনি

স্ফীত করিয়া তোলে। ধমনীর এই দ্বিতীয় অংশও ঠিক পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ার তৎপরবর্ত্তী অংশকে স্ফীত করিয়া তোলে এবং এইরূপে ক্রমে সমগ্র ধমনীমণ্ডলে উক্ত প্রক্রিয়ায় রক্তপ্রবাহ সঞ্চালিত হইতে থাকে। এইরূপে হৃতুদরের আকুঞ্চন-ক্রিয়ায় যে রক্তঝলককে বেগে ধমনীতে প্রবিষ্ট করাইয়াছিল তাহা ঢেউ খেলিতে খেলিতে ক্রমে ধমনী হইতে কৈশিক-নাড়ীতে এবং কৈশিক-নাড়ী হইতে শিরায় প্রবাহিত হইয়া ক্রমে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। রক্তপ্রবাহের এই ঢেউ খেলান গতিই নাড়ীতে লক্ষিত হইয়া থাকে।

বলিতে যত সময় গেল ইহারভিতরে তোমার শরীরের রক্ত কতবার হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া ধমনী, কৈশিক-নাড়ী, শিরা প্রভৃতি দিয়া ঘুরিয়া আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসিল। প্রধান প্রধান ধমনীতে রক্তপ্রবাহ যে বেগে ধাবিত হয় তাহাতে দেখা গিয়াছে যে উহার গতি এক সেকেণ্ডে ১২ ইঞ্চি। ধমনীগুলি যেখানে শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত হইয়াছে সেখানে এই দ্রুত-গতির হ্রাস হয় এবং ক্রমে কৈশিক-নাড়ীতে পৌঁছিলে অতি ধীর-বেগে প্রবাহিত হয়। কৈশিক-নাড়ী প্রায় কোন স্থানেই অৰ্দ্ধ বা পৌনে এক ইঞ্চির অধিক লম্বা নয়, কাজেই রক্তের মৃদুমন্দগতি ক্ষণিক। কারণ শিরায় প্রবিষ্ট হইলে ক্রমে যত বড় হইতে আরো বড় শিরায় প্রবেশ করে তখন উহার গতি পুনরায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপে সমস্ত দেহ ঘুরিয়া আসিতে মাত্র ৩০ সেকেণ্ডের অধিক আবশ্যক হয় না।

নিম্নে রক্ত-সঞ্চালন গতির ক্রম প্রদর্শিত হইল ঃ—

[হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের উপর ক্রিয়া]

বৃহৎ উর্দ্ধশিরা (superior vena cava) ও বৃহৎ নিম্নশিরা (inferior vena cava) হইতে	হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ হৃৎকোষে (right auricle)।
দক্ষিণ হৃৎকোষ হইতে ...	দক্ষিণ হৃতুদরে (right ventricle)।
দক্ষিণ হৃতুদর হইতে ...	বৃহৎ ফুস্‌ফুসীয় ধমনীতে (pulmonary artery)।
বৃহৎ ফুস্‌ফুসীয় ধমনী হইতে ...	ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী সমূহে (lesser pulmonary arteries)।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীসমূহ হইতে ...	ফুস্‌ফুসের চতুর্দ্দিকস্থ কৈশিক-নাড়ী সমূহে (capillaris)।
ফুস্‌ফুস হইতে অম্লজান-বাষ্পে (oxygen gas) পূর্ণ হইয়া কৈশিক-নাড়ী হইতে ...	ফুস্‌ফুসীয় শিরাসমূহে (pulmonary veins)।
ফুস্‌ফুসীয় শিরাসমূহ হইতে ...	হৃৎপিণ্ডের বাম হৃৎকোষে (left auricle)।
বাম হৃৎকোষ হইতে ...	বাম হৃতুদরে (left ventricle)।
বাম হৃতুদর হইতে ...	বৃহদ্ধমনী-কাণ্ডে (aorta)।
বৃহদ্ধমনী-কাণ্ড হইতে ...	ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীতে (দেহের সর্ব্বত্র)।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীসমূহ হইতে ...	কৈশিক-নাড়ীসমূহে।
দেহের নানাস্থান হইতে দূষিত ও পরিত্যক্ত মলাদি লইয়া কৈশিক-নাড়ীসমূহ হইতে ...	শিরা সমূহে।
বিবিধ শিরা হইতে ...	প্রথমোক্ত দুইটী বৃহত্তম শিরায় অর্থাৎ বৃহৎ উর্দ্ধ শিরায় (superior vena cava) ও বৃহৎ নিম্ন-শিরায় (inferior vena cava)।

[হৃৎপিণ্ড ও যকৃতের উপর ক্রিয়া]

বৃহদ্ধমনী-কাণ্ড (aorta) হইতে ...	ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীতে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী হইতে ...	পাকস্থলী (stomach), ক্লোমগ্রন্থি (pancreas), প্লীহা (spleen) ও অন্ত্র প্রভৃতি (intestines) ঘুরিয়া যে সমস্ত কৈশিক-নাড়ী গিয়াছে তাহাতে।
উক্ত কৈশিক-নাড়ীসমূহ হইতে ...	বিবিধ শিরাসমূহে।
বিবিধ শিরাসমূহ হইতে ...	শিরা-তোরণে (portal vein)।
শিরা-তোরণ হইতে ...	যকৃতে (liver)।
যকৃৎ হইতে পরিবর্ত্তিত আকারে	যকৃৎ-শিরায় (hepatic vein)।
যকৃৎ-শিরা হইতে ...	বৃহৎ নিম্ন শিরায় (inferior vena cava)।
বৃহৎ নিম্ন-শিরা হইতে ...	হৃৎপিণ্ডে।

(৭) রসবাহী-নলী (Lymphatics)

একথা হয়ত তোমাদের মনে আছে যে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক বা অন্ন-বহনালীতে হজম হইবার পর উক্ত নালীর রক্ত-বহা ও শোষক বা অন্ন-রসবাহী নালীসমূহে শোষিত হয় এবং তৎপর রক্তপ্রবাহের আবর্ত্তে পড়িয়া পুষ্টিকর পদার্থরূপে দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়।

কৈশিক-নাড়ীর বিষয় বলিবার সময় একথার উল্লেখ করিয়াছি যে রক্তের রসানী তাহাদের পাতলা কোমল গা দিয়া চুয়ায় এবং তদ্দ্বারা দেহের পেশী-তন্তুসমূহকে পুষ্টি করে। এই রসানী বা ঘর্ম্মবৎ নিঃস্রাবের যে অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত দৈহিক-সূত্র

সমূহের পুষ্টিসাধন কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া উদ্বৃত্ত থাকে তাহাকে 'রস' (lymph) বলে। এই সকল রস কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম নলী-দ্বারা সংগৃহীত হয়। এই সকল সূক্ষ্মতম নলী দেহের সর্ব্বত্র বিস্তৃত আছে। এই নলীকে রসবাহী-নলী (lymphatics) বলে। এই সূক্ষ্মতম নলীসকল ক্রমে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ নলীতে যুক্ত হইয়া অবশেষে সমস্ত রসকে রসবাহী-নলী-বিধানের (lymphatic system) প্রধান নল বক্ষঃনালীতে (thoracic duct) লইয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়ে খাদ্যের রক্তে পরিণতির বিষয় বলিবার সময় দেহের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রসবাহী শিরা বক্ষঃনালীর কথা উল্লেখ করিয়াছি (১০২ পৃষ্ঠা) তাহা হয়ত ভুলিয়া যাও নাই। এই বক্ষঃনালী (thoracic duct)টী একটী 'পেন' কলমের ন্যায় মোটা এবং প্রায় ২০ ইঞ্চি লম্বা। ইহা মেরুদণ্ডের সম্মুখভাগে অবস্থিত আছে এবং হৃৎপিণ্ডের সন্নিকটস্থ বামপাশের একটী বৃহশিরায় এই রসসমূহকে প্রবিষ্ট করাইতেছে। এই উপায়ে রক্তের রসানীর উদ্বৃত্ত অংশ রসবাহী-নলী সমূহে গৃহীত হইয়া অন্যপথে পুনরায় রক্তে নীত হয়। রসবাহী-নলী দিয়া, এইরূপে 'রস' সকল ক্রমাগত বক্ষঃনালীতে যাতায়াত করিতেছে।

দেহের সর্ব্বত্র রক্তের কৈশিক-নাড়ীর (blood capillaries) ন্যায় আর এক প্রস্থ এই রসবাহী কৈশিক-নাড়ী (lymph-capillaries) আছে। উহারা রক্তবহা-শিরা-প্রণালীর সহিত মিশামিশি ভাবে অবস্থিত থাকিলেও উহাদের

পরস্পরের যোগ নাই। রক্তের শিরাসমূহের ন্যায় রসবাহী শিরা (lymphatic vassels) সকল ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্রমাগত বৃহৎ আকারে পরিণত হয় নাই কিন্তু সম আয়তনবিশিষ্ট থাকিয়া মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র গোলাকার বা শিমের আকারবিশিষ্ট বিচির ন্যায় পদার্থে যুক্ত হইয়াছে। এই পদার্থকে রস-গ্রন্থি (lymphatic glands) বলে। রসবাহী-শিরা সকল এই রস-গ্রন্থির এক প্রান্তে প্রবিষ্ট হইয়া অপর প্রান্ত দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে এবং ক্রমে বক্ষঃনালীতে গিয়া যুক্ত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

শ্বাস-প্রশ্বাস (Respiration)

তোমরা অভিধানে দেখিয়াছ যে বায়ুর অর্থ লেখা হইয়াছে 'প্রাণ'। এই বায়ু না হইলে আমরা এক মুহূর্ত্তও বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। এজন্য সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা আমাদিগকে বায়ু-সাগরে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। নির্ম্মল বিশুদ্ধ বায়ু না হইলে প্রাণ-ধারণ করা অসম্ভব। আমাদের দেহের ভিতরেও এই বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা আছে। বায়ু আমাদের কত আবশ্যক তাহা একটীবার তোমার নাক মুখ কেউ হঠাৎ চাপিয়া ধরিলেই কেমন হাঁপাইয়া পড় তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবে।

বায়ু আমাদের ভিতরে কি করিয়া প্রবেশ করে? ইহা প্রথমতঃ নাকের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া উহার পেঁচাল আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়া দেহের ভিতরে প্রবেশ করে। এই রাস্তাটীর বিষয় দ্বিতীয় অধ্যায়ে মুখমণ্ডলের 'পেঁচাল অস্থির' বিবরণ (২৬ পৃষ্ঠা) পাঠকালে জানিতে পারিয়াছ। বায়ু নাকের ভিতরে ছাঁকা ও গরম হয়। নাসাবিবরে যে লোম আছে তাহা ছাঁকনীর কাজ করে। এজন্য যাহারা নাক দিয়া নিশ্বাস না নিয়া হাঁ করিয়া নিশ্বাস নেয় তাহাদের ফুস্‌ফুসের ভিতরে ময়লা ঢুকিবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে এবং ফুস্‌ফুসের ভিতর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা হয়। নাকের

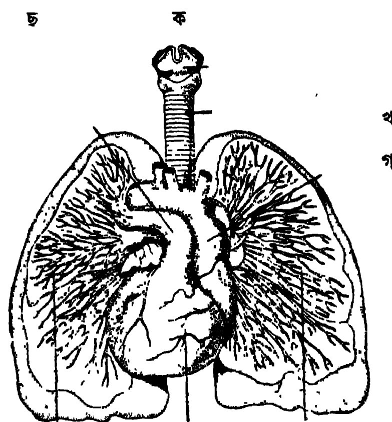
ভিতরকার ঘুরান রাস্তা দিয়া যাইবার সময় বাহিরের শীতল বায়ু ক্রমে উষ্ণ হইয়া ফুস্‌ফুসে গমন করে।

নাকের ভিতরে বায়ু প্রবিষ্ট হইবার পর প্রথমতঃ গল-নালীতে (pharynx) প্রবেশ করে। পঞ্চম অধ্যায়ে জানিতে পারিয়াছ যে এই গল-কক্ষ বা গল-নালীর পাঁচটী ছিদ্র-পথ আছে (৭৯ পৃষ্ঠা)। ফুস্‌ফুসের জন্যই এই বায়ুর প্রয়োজন। এজন্য গল-নালী হইতে শ্বাসনালী-পথে (trachea) ক্রমে বায়ু-নলী (bronchi) দ্বারা ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে।

তোমরা জানিয়াছ যে সতেজ টক্‌টকে লালরক্ত অম্লজনে পরিপূরিত হইয়া ধমনী-পথে দেহের সর্ব্বত্র কৈশিক-নাড়ীসমূহে প্রবাহিত হয়। এ কথাও জানিয়াছ যে কৈশিক-নাড়ীসমূহের অপর প্রান্তস্থিত শিরা সকল এই রক্তকে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে লইয়া যাওয়ার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু দেখিতে পাইবে যে সেই টক্‌টকে লালরক্ত কৈশিক-নাড়ীসমূহের ভিতর দিয়া যখন শিরাতে আসিয়া পৌঁছিল তখন আর উহার সেই উজ্জ্বল রং নাই, একবারে কাল্‌চে রং হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ এই যে উহা যে অম্লজনে পূর্ণ হইয়া ধমনীতে প্রবেশ করিয়াছিল কৈশিক-নাড়ী-সমূহে তাহা যে কেবল পরিত্যাগ করিয়াছে তাহা নহে কিন্তু দৈহিক-সূত্রসমূহ হইতে অঙ্গারদ্রাবক (carbonic acid), জল এবং মূত্রাংশ (urea) শোধন করিয়া লইয়া আসিয়াছে। রক্তের দ্বারা দেহের ভিতরে আনীত অম্লজনের সাহায্য ব্যতীত দেহস্থিত দূষিত রক্তের শোধন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না।

এজন্য রক্তের ভিতর অনবরত অম্লজন সঞ্চার করিবার প্রয়োজন হয়। প্রধানতঃ শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার দ্বারাই ফুস্‌ফুস কর্ত্তৃক রক্তের ভিতর ক্রমাগত অম্লজন সরবরাহ হইয়া থাকে।

ফুস্‌ফুসে রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া লক্ষ্য করিবার সময় দেখিতে পাইয়াছ যে রক্ত যখন ফুস্‌ফুসীয় ধমনীযোগে ফুস্‌ফুসে প্রবেশ



৩৭ নং চিত্র—রক্ত-সঞ্চালন-যন্ত্রাবলী (The organs of circulation)।

ক—কণ্ঠ-নালী (larynx), খ—শ্বাস-নালী (trachea), গ—বৃহদ্ধমনী-কাণ্ড (aorta), ঘ—দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্ (right lung), ঙ—হৃৎপিণ্ড (heart), চ—বাম ফুস্‌ফুস্ (left lung), ছ—ফুস্‌ফুসীয় ধমনী (pulmonary artery).

করিয়াছে তখন উহা কাল্‌চে রং‌এর এবং সমল ছিল। তৎপরে দেখিয়াছ যে এই সকল মল পরিত্যাগ করতঃ ফুস্‌ফুস হইতে প্রচুর পরিমাণ অম্লজনে (oxygen) পরিপূর্ণ হইয়া উক্ত রক্ত ফুস্‌ফুসীয়

শিরাদ্বারা পুনরায় হৃৎপিণ্ডে নীত হইয়াছে। রক্তের এই পরিবর্ত্তন—অর্থাৎ বিষাক্ত পদার্থ সকলের ত্যাগ এবং অম্লজনে পূর্ণ হইয়া হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসা—উহার রং দেখিয়াই প্রমাণিত হয়, কারণ সেই কাল রংএর পরিবর্ত্তে উহা এখন উজ্জ্বল লালবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার দ্বারাই ফুস্‌ফুসের ভিতর দূষিত রক্ত শোধিত হইয়া থাকে। যদিও সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে ফুস্‌ফুসদ্বারাই শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তথাপি এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে ত্বকও একটী শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার যন্ত্রবিশেষ। কারণ ফুস্‌ফুসের ন্যায় ত্বকদ্বারাও রক্ত হইতে পরিত্যক্ত মল-নিঃসরণ-ক্রিয়া হইয়া থাকে এবং ফুস্‌ফুসের ন্যায় ত্বকদ্বারাও রক্তের সহিত অম্লজন মিশ্রিত হইয়া থাকে। চতুর্থ অধ্যায়ের লোমকূপ ও ঘর্ম্ম-নিঃসরণ প্রণালীর বিষয় মনে করিলেই (৬২ পৃষ্ঠা) এ কথা সহজেই বুঝিতে পারিবে।

এখন এই যে ক্রমাগত রক্ত ফুস্‌ফুসের ভিতর দিয়া চলাচল করিতেছে এবং উহার মলাদি বর্জ্জন করিয়া অম্লজন গ্রহণ করিতেছে ইহাতে আমরা যে বায়ু নাক ও মুখ দিয়া প্রশ্বাসরূপে পরিত্যাগ করি ও আমাদের চারিদিকস্থ যে বায়ু নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করি এতদুভয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই বিশেষ পার্থক্য আছে। এক্ষণে দেখা যাক এই পার্থক্য কিরূপ।

(ক) বিশুদ্ধ বায়ু-মণ্ডলের শতকরা প্রায় ৭৯ ভাগ 'যবক্ষারজন' (nitrogen) এবং অনুমান ২১ ভাগ 'অম্লজন' (oxygen)।

ইহার সহিত যৎকিঞ্চিৎ ‘অঙ্গার-দ্রাবক’ (carbonic acid) ও মিশ্রিত আছে। যে বায়ু ফুস্‌কুসের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে উহাতে শতকরা ১৬ কি ১৭ ভাগ ‘অম্লজন’ এবং ৪ কি ৫ ভাগ ‘অঙ্গারদ্রাবক’। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে এই বায়ুতে ৪ কি ৫ ভাগ ‘অম্লজন’ কম হইয়াছে এবং সেই সম-পরিমাণ ‘অঙ্গারদ্রাবক’ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু যবক্ষার-জানের ভাগের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

(খ) সাধারণ বায়ুতে কথঞ্চিৎ পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকে। ফুস্‌ফুস হইতে যে বায়ু বাহির হইয়া আসিয়াছে উহাও জলীয় বাষ্পে পরিপূর্ণ।

(গ) যে বায়ু ফুস্‌ফুস হইতে বাহির হইয়া আসে তাহা চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডল হইতে উষ্ণ।

(ঘ) ফুস্‌ফুস-পরিত্যক্ত বায়ুর ভিতরে সামান্য পরিমাণ জীর্ণ জান্তব পদার্থ (decaying animal matter) থাকে।

নিম্নলিখিত পরীক্ষাদ্বারা এগুলি সপ্রমাণিত হইবে ঃ—

(ক) একটী পাত্রে কিছু চূণের জল লইয়া তাহাতে ক্ষণকাল প্রশ্বাস ফেলিলে দেখিতে পাইবে যে উক্ত জল সাদা ও ঘন হইয়া আসিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে ফুস্‌ফুস-পরিত্যক্ত বায়ুতে অঙ্গার-দ্রাবক (কার্ব্বনিক এসিড্‌) মিশ্রিত আছে।

(খ) আয়না বা অপর কোনও স্বচ্ছ পদার্থের উপর প্রশ্বাস ফেলিলে দেখিতে পাইবে যে উহা অতি ক্ষুদ্র জলকণাতে ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে ফুস্‌ফুস্‌ পরিত্যক্ত বায়ুতে জলীয় বাষ্প আছে।

(গ) ইহার প্রমাণ নাকের কাছে হাত রাখিয়া তাহাতে প্রশ্বাস ফেলিলেই উষ্ণতা অনুভব করিবে।

(ঘ) ইহার পরীক্ষাটী সুচতুর রসায়নশাস্ত্রবিৎ ব্যতীত অপরের পক্ষে অতি বিপজ্জনক এজন্য উহা এখানে উল্লেখ করা গেল না।

(১) ফুস্‌ফুস্ (Lungs)

পাঁঠার 'কোঁপ্‌ড়া' দেখ নাই এমন বোধ হয় তোমাদের মধ্যে কেহই নাই। এই কোঁপড়াই ফুস্‌ফুস্ (lungs)। ইহা যুগ্ম অর্থাৎ দোহারা। ইহার একটী বুকের ডানদিকে ও অপরটী বুকের বামদিকে হৃৎপিণ্ড ঘেরিয়া বক্ষোগহ্বরের (thorax) সকল স্থান জুড়িয়া আছে (৩৩নং চিত্র)। ইহার গায়ের রং পাটলবর্ণ অর্থাৎ ঈষৎ গোলাপীর আভাযুক্ত। ইহার গা 'স্পঞ্জের' ন্যায় কোঁপ্‌ড়া। দুইদিকের ফুস্‌ফুসের মধ্যে ডানদিকেরটী অপেক্ষাকৃত বড় এবং তিনখণ্ডে (lobes) বিভক্ত। বামদিকের ফুস্‌ফুসটীর মাত্র দুইটী খণ্ড (lobes)। হৃদাবরণের (pericardium) ন্যায় ইহাদেরও ঝিল্লীময় (serous membrane) একটী দোপরতা (double bag) আবরণ আছে তাহাকে ফুস্‌ফুসাবরণ (pleura) বলে। ফুস্‌ফুসাবরণ যে স্তরদ্বয়দ্বারা নির্ম্মিত সেই স্তর দুইটীর গাত্রও রক্তের রসানী (serum) দ্বারা আর্দ্র থাকে। এজন্য শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার সঞ্চালনজনিত ঘর্ষণের হ্রাস হয়।

বক্ষোগহ্বর (thorax) সম্পূর্ণ বায়ু-চলাচল-শূন্য একটী বাক্‌স বিশেষ। উহার চারিদিক একেবারে বন্ধ, কেবল শ্বাস-নালীটীই একমাত্র ছিদ্র-পথ। এই বাক্‌সটীর ভিতর ফুস্‌ফুসটী

এমনভাবে স্থাপিত আছে যে উহা বায়ু-পূর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠিলে বাক্‌সটীও ক্রমে বড় হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বক্ষঃপঞ্জর বর্ণনাকালে ইহার বিষয় বলা হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে (৩৪ পৃষ্ঠা)।

(২) শ্বাস-নালী (Trachea)

শ্বাস-নালীই ফুস্‌ফুসে বায়ু-চলাচলের প্রধান নল-পথ। ইহা প্রায় পৌনে এক ইঞ্চি মোটা এবং চারি ইঞ্চি লম্বা একটি নল-বিশেষ। ইহার গা শক্ত গোলাকার উপাস্থি সকল দ্বারা নির্ম্মিত। এই উপাস্থি সকল যদিও পাতকূয়ার পাটের ন্যায় কিন্তু সম্পূর্ণ গোলাকার নহে। এই নলের পশ্চাদ্ভাগে কোন উপাস্থি নাই, কেবল সম্মুখভাগে ও দুই পাশে রহিয়াছে। এই চক্রাকার উপাস্থি সকল না থাকিলে অতি সামান্য চাপেই নল-পথটী বন্ধ হইয়া শ্বাসরোধ ঘটিত। কারণ উপাস্থি সকল দৃঢ় ও কঠিন একথা তোমরা জান। আবার শ্বাস-নালীর পশ্চাতেই প্রায় পাশাপাশি হইয়া গল-নালী (gullet) অবস্থিত রহিয়াছে এবং এই পথে ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করে একথাও তোমরা জানিয়াছ (২৫ নং চিত্র দেখ)।

আমাদের মুখের গ্রাস গিলিবার সময় গল-নালী বিস্তারিত হয়। এসময়ে শ্বাস-নালীকে সঙ্কোচিত হইয়া কতকটা পথ ছাড়িয়া দিতে হয়। শ্বাস-নালীর পশ্চাদ্ভাগে উপাস্থি নাই এবং গল-নালী ঠিক সেইদিক হইতেই চাপ দেয়, কাজেই উহা তখন সহজে

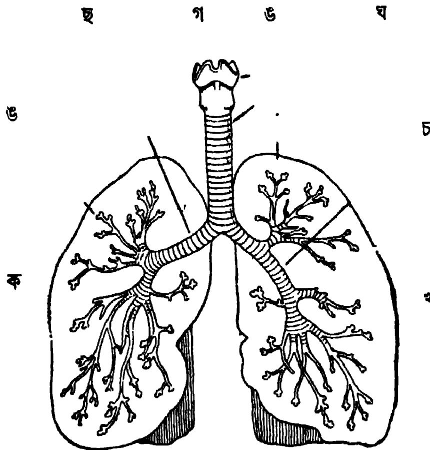
সঙ্কুচিত হইতে পারে অথচ অপর তিনদিকে উপাস্থিময় বলয়ের ন্যায় থাকাতে শ্বাস-পথটী একেবারে বন্ধ হইয়া যায় না।

শ্বাস-নালীর ভিতরের প্রাচীরে শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর একটী অস্তর আছে উহা হইতে এক প্রকার পুরু চট্‌চটে পদার্থ নির্গত হয় তাহাকে শ্লেষ্মা বা 'গয়ের' (mucus or phlegm) বলে। শ্লেষ্মা-নির্গমন হেতু এই ঝিল্লীময় অস্তরটী সর্ব্বদা ভিজা থাকে এজন্য ইহাকে সিক্তত্বক (wet skin)ও বলে। এই অস্তরের উপরিভাগ পশমের আঁশের ন্যায় সূক্ষ্ম রোমবৎ পদার্থে পূর্ণ, উহাকে শুঁয়া (cilia) বলে। এই শুঁয়াগুলি ক্রমাগত ঢেউয়ের মত ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইতে থাকে। বায়ুর সহিত কোন ধূলিকণা বা ময়লা কোনরূপে গলার ভিতর প্রবিষ্ট হইলে উহাদিগকে ধরিয়া উপরের দিকে ঠেলিয়া শ্লেষ্মার সহিত মুখ দিয়া বাহির করিয়া দেওয়াই ইহাদের কাজ। এই শুঁয়াগুলি যদি এইরূপে ধূলিকণা বা ময়লাদি বাহির করিয়া না দিত তাহা হইলে ঐ সকল পদার্থ বায়ু-কোষে (air-cells) জমিয়া রোগোৎপত্তির কারণ হইত।

(৩) বায়ু-নলী (Bronchi)

শ্বাস-নালী বক্ষোগহ্বরে প্রবিষ্ট হইবার পর দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া একটী ডান ফুস্‌ফুসে ও অপরটী বাম ফুস্‌ফুসে গিয়াছে (৩৭ নং চিত্র দেখ)। এই শাখা দুইটীর নাম বায়ু-নলী (bronchi)। প্রত্যেক বায়ু-নলী ফুস্‌ফুসের ভিতরে গিয়া বহুতর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। এই বায়ু-নলীগুলি রবরের

ফাঁপা নলের ন্যায়। মোটা হইতে ক্রমে সরু সরু নলে বিস্তৃত হইয়া ঠিক যেন গাছের ডালপালার ন্যায় ছড়াইয়া আছে। শ্বাস-নালীটী যেন ঠিক একটী গাছের গোড়া আর বায়ু-নলীগুলি তাহার ঝাকড়া ডালপালাবিশেষ।



৩৮ নং চিত্র—শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্রাবলী (organs of respiration)।

ক—ফুস্‌ফুসের বামভাগেব দৃশ্য, খ—ফুস্‌ফুসের দক্ষিণভাগের দৃশ্য, গ—কণ্ঠনালী(larynx), ঘ—শ্বাসনালী (trachea), ঙ—বর্দ্ধিতাকাব বায়ু-কোষ—(magnified air-cells), চ—দক্ষিণ বায়ু-নলী (right bronchial tube), ছ—বাম বায়ু-নলী (left bronchial tube).

বায়ু-নলীগুলি ক্রমে অতি ক্ষুদ্র হইয়া অবশেষে ফুস্‌ফুস-কোষে (lung-sac) আসিয়া ঠেকিয়াছে। ফুস্‌ফুস-কোষগুলি দেখিতে আঙ্গুরের থোকার ন্যায় (৩৮ নং চিত্র দেখ)। কিন্তু উহারা এত ক্ষুদ্র

যে উহাদের ৪০টী একত্র করিলে এক ইঞ্চি হয় কিনা সন্দেহ। আঙ্গুরের থোকার মধ্যে যেমন বহু আঙ্গুর থাকে তেমনি প্রত্যেকটী ফুস্‌ফুস-কোষে বহু সংখ্যক অতিক্ষুদ্র ফাঁপা পটকার মত আছে তাহাকে বায়ু-কোষ (air-cells) বলে। এক একটী ফুস্‌ফুস-কোষে প্রায় ১৭০০ বায়ু-কোষ আছে। এই বায়ু-কোষের প্রাচীর গুলি অতিশয় পাতলা এবং কোমল, কিন্তু অতিশয় স্থিতিস্থাপক।

ফুস্‌ফুসের ভিতরে এই প্রকার লক্ষ লক্ষ ঘন-সন্নিবিষ্ট ক্ষুদ্র বায়ু-কোষ আছে, ইহাদের প্রত্যেকটীর সহিত শ্বাসনালীর যোগ আছে। কাজেই আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডলের সহিতও ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণতঃ কেবল নাক দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু দ্রুত-গতির সময় মুখ এবং নাক উভয় দিক দিয়াই নিশ্বাস গ্রহণ করিতে বাধ্য হই। এই উভয় অবস্থাতেই বায়ু প্রথমতঃ গল-কক্ষে (pharynx) প্রবিষ্ট হইয়া শ্বাস-নালীর অগ্রভাগে স্বরযন্ত্রের (larynx) ভিতর দিয়া শ্বাস-নালীতে আসে এবং তথা হইতে বায়ু-নলীদ্বারা ক্রমে ফুস্‌ফুসের বায়ু-কোষে প্রবিষ্ট হয়।

একজন সুস্থ লোক বিশ্রামের অবস্থায় মিনিটে প্রায় ১৮ বার, একটী শিশু মিনিটে প্রায় ৪০ বার এবং বালকগণ মিনিটে প্রায় ২৫ বার শ্বাস-প্রশ্বাস বহিয়া থাকে। পরিশ্রম কালে, বিশেষতঃ দৌড়াইবার সময় শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত হয়।

অষ্টম অধ্যায়

মস্তিষ্ক (Brain)

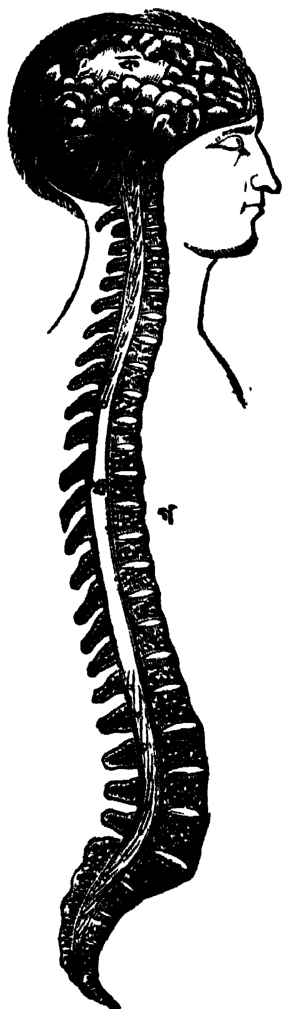
'মস্তিষ্কই জ্ঞানের আধার' একথা হয়ত তোমরা পাঠ করিয়াছ। প্রথমেই বলিয়াছিলাম মস্তকই 'আমি'র খাস কামরা; এখান হইতেই দেহ-ঘরের সকল সংবাদ জানা যায়। মস্তিষ্ককে জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের মূলাধার বলা যায় অর্থাৎ ইহাই চৈতন্য বা অনুভূতি, বুদ্ধিবৃত্তি, স্মৃতি, ইচ্ছাশক্তি এবং স্নেহ, মমতা, দয়া, দাক্ষিণ্য ইত্যাদি হৃদয়-বৃত্তি সমুহের আধার স্থল। এই বৃত্তি-গুলির বিষয় এক্ষণে একটু বিস্তৃত করিয়া বলিতেছি।

(ক) যদ্দারা আমরা কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারি, শিক্ষা করিতে পারি, উদ্ভাবন করিতে পারি, বুঝিতে পারি এবং মনে রাখিতে পারি তাহাকে বুদ্ধিবৃত্তি (intellect) বলে।

(খ) যাহাতে আমাদিগের চতুর্দ্দিকস্থ দ্রব্যসমূহের বিষয় পঞ্চেন্দ্রিয়ের যে কোন একটীর দ্বারা অনুভব করিতে শিক্ষা দেয় তাহাকে চৈতন্য বা অনুভূতি (sensation) বলে।

(গ) যদ্দারা আমাদিগকে স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়ার শক্তি প্রদান করে তাহাকে ইচ্ছাশক্তি (will) বলে।

(ঘ) যাহাতে আমাদের মধ্যে ভালবাসা, স্নেহ, মমতা, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ক্লেশ ও আনন্দ ইত্যাদি ভাবের উদ্রেক করে তাহাকে হৃদয়বৃত্তি (emotion) বলে।



৩৯ নং চিত্র—মস্তিষ্ক-মেরবিক স্নায়ু-কেন্দ্র (cerebro spinal nervous centre)

অতএব দেখা যাইতেছে যে মস্তিষ্ক না থাকিলে আমরা কিছুই করিতে, ভাবিতে বা জানিতে পারিতাম না। ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদির অস্তিত্বও থাকিত না। আজ যে তোমরা এই বই পড়িয়া তোমাদের দেহ-ঘরের বিবরণ জানিতে পারিতেছ মস্তিষ্ক না থাকিলে এ সকল বিষয়ের চর্চ্চাও হইত না এবং তোমাদেরও জানিবার সুযোগ ঘটিত না।

মস্তিষ্ককে চলিত ভাষায় 'মগজ' বা মাথার 'ঘিলু' বলে। মস্তিষ্ক করোটীতে অবস্থিত একথা তোমরা পূর্ব্বেই জানিয়াছ। এই অত্যাশ্চর্য্য ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রটী অতিশয় কোমল —এত কোমল যে উহার সুদৃঢ় বাক্সটীতে অর্থাৎ করোটীতে আঘাত করিলে সময় সময় উহাতে লাগে এবং বিপর্য্যয় উপস্থিত করে। মস্তিষ্ক করোটীগহ্বরটী একেবারে পূর্ণ করিয়া আছে। ইহা বহুসংখ্যক বিভিন্ন স্নায়ু-পিণ্ডের (nerve matter) যোগে

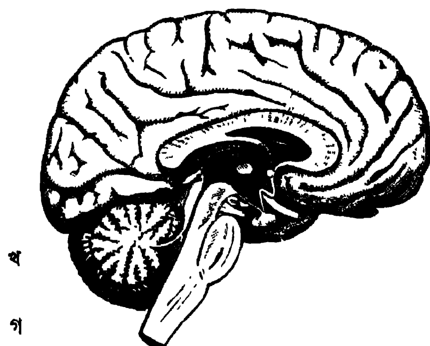
নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল স্নায়ু-পিণ্ড-বহুল রক্তবহা নালীতে পরিপূর্ণ। ইহার প্রত্যেকটী পিণ্ড স্নায়বীয় বিধান (nervous system) দপ্তরের এক একটী বিশেষ বিশেষ বিভাগের প্রধান কেন্দ্রস্থান বা সেরেস্থা। ইহাদের প্রত্যেক বিভাগের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপের জন্য যেমন লাট সাহেবের দপ্তরের এক এক বিভাগের এক একটী সেরেস্থা আছে—যেমন আইন বিভাগের সেরেস্থা, শিক্ষাবিভাগের সেরেস্থা, রাজস্ববিভাগের সেরেস্থা—এগুলিও ঠিক সেইরূপ।

তিনটী প্রধান স্নায়ুপিণ্ডের যোগে মস্তিষ্ক গঠিত হইয়াছে যথা—

(১) মূল মস্তিষ্কভাগ (cerebrum)
(২) ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক (cerebellum)
(৩) আয়ত-মজ্জা (medulla oblongata)

পুরুষের মস্তিষ্ক সচরাচর ওজনে প্রায় দেড় সের কি পৌনে দুইসের (52 to 56 ounces) এবং স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক তিন পোয়া হইতে পাঁচ পোয়ার (44 to 47 ounces) অধিক হয় না। তবে যাঁহাদের মানসিক শক্তি খুব অধিক তাঁহাদের মস্তিষ্কের ওজন ইহা হইতেও অধিক হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বৃহৎ মস্তিষ্ক সবল মনের ও উৎকৃষ্টতর মনোবৃত্তির এবং নিরাময় মস্তিষ্ক নিখুঁত ও সুস্থ মনের পরিচায়ক। যাহার মস্তিষ্ক স্বাভাবিক অপেক্ষা ছোট সে জড়-বুদ্ধি বিশিষ্ট না হইয়া পারে না। আবার রোগ-গ্রস্ত বা আহত মস্তিষ্ক উন্মাদ রোগ জন্মায়।

মানুষ জ্ঞানে সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একথা তোমরা জান। শুনিয়া অবাক হইবে যে মানব অপেক্ষা বহু পরিমাণে বৃহৎ জন্তুদিগের মস্তিষ্ক তুলনায় মানবের মস্তিষ্ক অপেক্ষা কত ক্ষুদ্র! ওজনে ঘোড়ার মস্তিষ্ক প্রায় আধ সের (১৯ আউন্স), এবং তিমির প্রায় আড়াই সের (৮০ আউন্স), এবং হস্তীর প্রায় সাড়ে চারি সের (১৫০ আউন্স) হইবে। ইহা হইতে বুঝিতে পারিতেছ যে এই সকল প্রাণী মানুষের তুলনায় কত বড় হইলেও উহাদের মস্তিষ্ক তুলনায় কত ছোট। ইতর প্রাণীর মধ্যে হস্তীই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান। এই বৃহৎ প্রাণীর বুদ্ধির বিষয় তোমরা হয়ত অনেক গল্প শুনিয়াছ। তিমি যদিও হস্তী অপেক্ষা বহুগুণে বৃহৎ তথাপি দেখিলে যে তিমি অপেক্ষা হস্তীর মস্তিষ্ক প্রায় দ্বিগুণ।



৪০ নং চিত্র—মস্তিষ্কের বামার্দ্ধ (অভ্যন্তর দৃশ্য)।

ক—মূল মস্তিষ্কভাগ (cerebrum), খ—ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক (cerebellum), গ—আয়ত-মজ্জা (medulla oblongata),

চর্চ্চাদ্বারা মস্তিষ্ক উর্ব্বর হয়। 'মাথা নাই' বলিয়া কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই। সমুচিত যত্ন চেষ্টা করিলে মস্তিষ্কের উন্নতিসাধন করা যায়। যাহাদের মস্তিষ্কের ভাগ অধিক তাহারা

যে কাজ অতি সহজে করিবে তাহা তোমার করিতে নিতান্ত আয়াস সাপেক্ষ হইতে পারে কিন্তু একেবারে পারিবে না এমন কোনও কথা নাই।

(১) মস্তিষ্কাবরণ (Brain covers)

করোটী মস্তিষ্কের একটী সুদৃঢ় আবরণ (৩ নং চিত্র)। ইহার ভিতরের গাত্রভাগ এবং মস্তিষ্ক ভাগের উপরি তল এই দুই এর মধ্যদেশে আবার তিনটী আবরণ আছে। এই অতি প্রয়োজনীয় তিনটী ঝিল্লীময় আববণ উপর্য্যুপরি তিনটী স্তরে স্থাপিত আছে। উহাদের নাম—

(ক) অনুরক্ত মাতৃ-আবরণ (pia mater),
(খ) লূতা তন্তু আববণ (arachnoid) এব,
(গ) কঠোর মাতৃ-আববণ (dura mater)।

(ক) অনুরক্ত মাতৃ-আবরণ (pia mater) একটী অতিশয় কোমল ঝিল্লীবিশেষ। ইহা মূল মস্তিষ্ক ভাগের ভাঁজের সহিত লাগিয়া আছে। মস্তিষ্ক-মূলাংশে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে এই পাত্‌লা ঝিল্লীটীতে আসিয়া রক্ত-বহানালী সকলের মুখ খুলিয়া যায়। এই আববণটীর সমগ্রভাগ একটী আঁশাল সংযোজক সূত্রের (fibrous connective tissues) শিরাত্মক ঝিল্লী (vascular membrane) বিশেষ এবং ঘন বুনটকরা রক্ত-বহানালীতে পূর্ণ।

(খ) লূতাতন্তু-আবরণটী (arachnoid) একটী পাত্‌লা ঝিল্লীবিশেষ। ইহা অনুরক্ত মাতৃ-আবরণ নামক সর্ব্বনিম্নস্থ প্রথম

স্তরটী শিথিল ভাবে বেষ্টন করিয়া আছে এবং এই প্রথম স্তরটী ও কঠোর মাতৃ-আবরণ নামক সর্ব্বোপরিস্থ তৃতীয় স্তরটীর মধ্যভাগে অবস্থিত রহিয়াছে। এই ঝিল্লীটী রস-ঝিল্লী (serous membrane) শ্রেণীর, কারণ ইহা হইতে এক প্রকার তরল পদার্থ (cerebro-spinal fluid) নিঃসৃত হইয়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মধ্যভাগটী পূর্ণ থাকে। হঠাৎ কোন কারণে মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হইলে এই তরল পদার্থ মস্তিষ্ককে উক্ত আঘাতের তীব্রতা অনুভব করিতে দেয় না।

(গ) কঠোরমাতৃ-আবরণ (dura mater) একটী ঘাতসহ শ্বেতাভ সূত্রীয় ঝিল্লী। ইহা করোটীর আভ্যন্তরীণ গাত্রভাগের আস্তরের ন্যায় এবং মস্তিষ্কভাগের একটী শিথিল বহিরাবরণবিশেষ। মস্তিষ্কে রক্ত-চলাচল করিবার ধমনী এবং শিরাতে ইহা পূর্ণ।

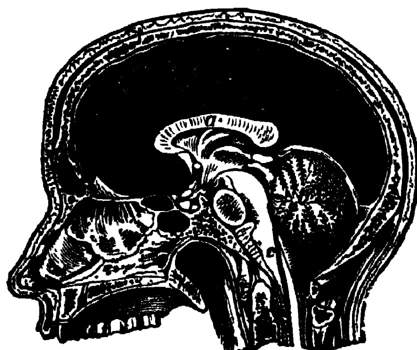
মস্তিষ্ক যে দেহের কি মহামূল্য যন্ত্র তাহা বোধ হয় আর তোমাদের বুঝিতে বাকি নাই। একবার ভাবিয়া দেখ যে ইহাকে নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য কত ব্যবস্থাই না করা হইয়াছে। করোটীইত একটী অতি সুদৃঢ় আবরণ। উহার উপরিভাগ মস্তকের কেশযুক্ত ত্বক (scalp) দ্বারা ঢাকিয়া তাহার উপর আবার চুলের ছাউনি দেওয়া হইয়াছে। ইহাতেও শেষ হয় নাই। করোটীর ভিতরেও আবার উপরোক্ত তিনটী আবরণদ্বারা কত যত্নে মস্তিষ্ককে সুরক্ষিত করা হইয়াছে।

মস্তিষ্কের বিষয় এক্ষণে তোমরা কতকটা জানিলে। ইহা এত কোমল যে ইহাকে কতকগুলি ঢাক্‌নার ভিতর রাখিতে হয়।

মাথার বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। অনেকে এমনি অসতর্ক যে শিশুদিগকে ধপাস্ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়, বিরক্ত হইলে জোরে কাণ মলিয়া দেয় কিংবা মাথায় 'চাটী' মারে। এ সকল বুদ্ধিমান বা হৃদয়বানের কাজ নয়। শিশুদিগকে রগে ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া 'মামার বাড়ী' দেখান অতি নির্বুদ্ধিতার কাজ। যদিও মস্তিষ্ক ছয়টী আবরণের ভিতর সুরক্ষিত থাকে তথাপি অনেক সময় আঘাতের চোটে হঠাৎ এমন ঝাঁকুনি লাগিতে পারে যে তদ্দারা মস্তিষ্কের সমূহ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

(২) মূল মস্তিষ্কভাগ (Cerebrum)

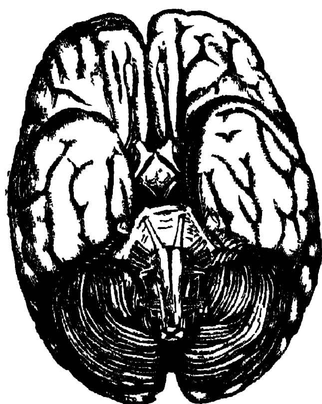
মূল মস্তিষ্কভাগ সমগ্র মস্তিষ্কপিণ্ডের প্রায় আট ভাগের সাত ভাগ হইবে। ইহা মস্তকের উপরিভাগস্থ সমস্ত করোটীটী



৪১ নং চিত্র—লম্বভাবে ছেদিত মস্তকের অর্দ্ধাংশ (vertical section of brain)

a—নিরেট স্নায়ু-তন্ত্রি (corpus callosum) b—ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক (cerebellum) c—আয়ত-মজ্জা (medulla oblongata) d—মূল মস্তিষ্কভাগ (cerebrum).

জুড়িয়া আছে (৪১ নং চিত্র দেখ) এবং সম্মুখের দিকে ভ্রূযুগল পর্য্যন্ত আসিয়া পশ্চাতের দিকে যেখানে মাথার চুল শেষ হইয়াছে ঘাড়ের সেই উপর পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহার মধ্যভাগ মস্তকের সম্মুখ হইতে পিছন পর্য্যন্ত একটী গভীর চিড় বা 'ফাইট' দ্বারা দুই অর্দ্ধ গোলাকার খণ্ডে প্রায় সম্পূর্ণ বিভক্ত। এই গোলকার্দ্ধদ্বয়ের (hemispheres) প্রত্যেকটীর আবার তিনটী করিয়া খণ্ড (lobe) আছে। কাজেই মূল মস্তিষ্কভাগটীর ছয়টী খণ্ড (৪২ নং চিত্র)।



৪২ নং চিত্র—মস্তিষ্কের তলদেশ (undersurface of the brain)

মস্তিষ্কপিণ্ডের গা'টী অর্থাৎ উপরিভাগ মসৃণ নয় কিন্তু একখানি কোঁকড়ান কাগজের ন্যায় চুনোট করা বা পাকান পাকান। ৪২ নং চিত্রটী দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে উহাদের ভাঁজে ভাঁজে কেমন চিড় বা ফাইট আছে। এই ফাইটগুলির এক একটী প্রায় এক ইঞ্চি গভীর।

মস্তিষ্কের ভিতরের অংশ শ্বেত স্নায়ু-মজ্জা (nerve matter) ময়। ইহার উপরেরও একটী ধূসর বর্ণের স্নায়ু-মজ্জাবিশিষ্ট স্তর আছে, উহা এই শ্বেত স্নায়ু-মজ্জার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে। এই শ্বেত ও ধূসর বর্ণের স্নায়ু-মজ্জাতে মস্তিষ্ক গঠিত

হইয়াছে। কিন্তু উহাদের অবস্থানভাব এমন জটিল যে এক্ষণে তোমরা উহা ভাল বুঝিতে পারিবে না।

মস্তিষ্কের কার্য্যকরী শক্তি এই উপরের স্তরটীতে নিহিত আছে বলিয়া অনুমিত হয়। এই শক্তি আবার মস্তিষ্কের চূণোট বা ভাঁজের সংখ্যা, আয়তন এবং এই স্তরটীর গাঢ়তার ন্যূনাধিক্য অনুসারে কম বেশী হইয়া থাকে।

ইতর প্রাণীদিগের মস্তিষ্কে কোনও ভাঁজ নাই। নিম্নস্তরের প্রাণী হইতে যখন উচ্চস্তরের প্রাণীতে উঠা যায় তখনই মস্তিষ্কের এই ভাঁজ দৃষ্ট হইতে থাকে। মনুষ্যে এই চূণোট বা ভাঁজের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তেমনি আবার অসভ্য বর্ব্বর মনুষ্যের মস্তিষ্ক অপেক্ষা অতি সুশিক্ষিত ব্যক্তির মস্তিষ্কের ভাঁজ অত্যন্ত অধিক। ইহা হইতে দেখা যায় যে মস্তিষ্কের এই ভাঁজের সহিত মানবের বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, কারণ ভাঁজের সংখ্যাধিক্য অনুসারে বুদ্ধির প্রখরতার তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়।

বুদ্ধিবৃত্তি, ইচ্ছাশক্তি ও হৃদয়-বৃত্তি এবং দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিযের ক্রিয়া এ সকলেরই মূল শক্তি এই মস্তিষ্কে নিহিত আছে। যে স্বেচ্ছানুবর্ত্তী মাংসপেশীর (voluntary muscles) বিষয় তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি (৫০ পৃষ্ঠা) মস্তিষ্ক ব্যতীত আমরা তাহার একটীও নড়াইতে বা কাজে লাগাইতে পারিতাম না।

এখন যদি কেহ তোমার পাটা মাড়াইয়া দেয় তাহা হইলে

তুমি তৎক্ষণাৎ পাটা সরাইয়া লইবে। যদি লাগিয়া থাকে তাহা হইলে মুখ বিকৃতি করিবে। যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া মাড়াইয়া দিয়াছে মনে কর তবে তাহাকে ধাক্কা বা চাপড় মারিতে চাহিবে। আবার যদি মনে কর যে হঠাৎ মাড়াইয়া ফেলিয়াছে তাহা হইলে হয়ত তাহাকে সতর্ক হইয়া চলিতে উপদেশ দিবে অথবা বদ্ মেজাজের হইলে গালি দিবে।

শুনিয়া অবাক হইবে যে উপরে যাহা বলিলাম সেই সকল তোমাকে করিতে বা ভাবিতে হইলে মূল মস্তিষ্কভাগ এবং মেরু-মজ্জা এই উভয়কে কাজে নিযুক্ত হইতে হইবে। তোমার পা মাড়ান হওয়া মাত্র তোমার মূল মস্তিষ্কভাগে সংবাদ পঁহুছিল যে তোমার পায়ে আঘাত লাগিয়াছে এবং সেই মুহূর্ত্তে পায়ের যে বেদনা তাহা মস্তিষ্কে অনুভূত হইল। মস্তিষ্কে এই ক্রিয়ার বিষয় পরে জানিতে পারিবে।

(৩) ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক (Cerebellum)

ক্ষুদ্র মস্তিষ্কভাগ মূল মস্তিষ্কভাগের তলদেশে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ঠিক ঘাড়ের উপর অবস্থিত (৪১ নং চিত্র দেখ) এবং এক কাণের পিছন হইতে অপর কাণের পিছন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা সমগ্র মস্তিষ্কপিণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ হইবে। মূল মস্তিষ্কভাগ হইতে ইহা কঠোর মাতৃ-আবরণের (dura matter) একটী ভাঁজদ্বারা বিভক্ত আছে। ইহাও মূল মস্তিষ্কভাগের ন্যায় দুই গোলকার্দ্ধে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ভাগ

শ্বেত ও ধূসর স্নায়ু-মজ্জাদ্বারা গঠিত। ইহার উপরিভাগ দেখিতে করোগেটেড্ টিনের পাতের ন্যায় ঢেউ খেলান।

ইহার ক্রিয়া সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিত কিছুই জানা যায় নাই। তবে যতদূর দেখা গিয়াছে তাহাতে এই প্রমাণিত হইয়াছে যে হাঁটা, দৌড়ান, কথা বলা এবং গান করা প্রভৃতি ক্রিয়া, যাহাতে একই সময়ে বহু পেশীর ক্রিয়া হইয়া থাকে, সে সকল ক্ষুদ্র মস্তিষ্কভাগেরই কর্ত্তৃত্বাধীনে ঘটিয়া থাকে।

সোজা হইয়া দাঁড়ান অতি কঠিন ব্যাপার। তোমাদের কাছে ইহা অতি সহজ বলিয়া মনে হইতেছে কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ পৃথিবীতে অসংখ্য জন্তুর মধ্যে বোধ হয় একমাত্র মানুষই দুই পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে এবং অপর প্রায় সকল জন্তুকেই চারি পায়ে হাঁটিতে হয়। আমাদের হাঁটিবার বা দৌড়িবার সময় যে আমরা ভারকেন্দ্র রক্ষা করিয়া থাকি তাহার শক্তি এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কভাগেই নিহিত আছে। ইহা রোগাক্রান্ত হইলে ইচ্ছামাত্র এ সকল কোনও ক্রিয়াই হইতে পারে না।

(৪) আয়ত-মজ্জা (Medulla oblongata)

মেরু-মজ্জা বা মেরবিক স্নায়ু-রজ্জুর (spinal cord) উপরের যে মোটা দিক মস্তকে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহাকে আয়ত-মজ্জা (medulla oblongata) বলে। ইহা ঠিক ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক-ভাগের (cerebellum) নিম্নে (৪০ নং চিত্র দেখ) মেরু-মজ্জা এবং মস্তিষ্ককে যুক্ত করিয়া অবস্থিত আছে অর্থাৎ এই মজ্জা

করোটীতে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ভাগের ঠিক নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়ার মধ্য দিয়া (৩৯ নং চিত্রের খ চিহ্নিত অংশ) বরাবর কটিদেশ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহার ঊর্দ্ধভাগ প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা এবং আধ হইতে পৌণে এক ইঞ্চি পুরু। মেরু-মজ্জার ন্যায় মস্তিষ্কের এই অংশটীরও বহিরাংশ শাদা এবং ভিতরাংশ ধুসরবর্ণ স্নায়ু-মজ্জাতে পূর্ণ।

আয়ত-মজ্জার ক্রিয়া কতকটা মেরবিক স্নায়ু-রজ্জুর ন্যায়, কিন্তু ইহার সহিত জীবনী-শক্তির বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহার একটী যায়গায় হৃদ্‌যন্ত্র এবং ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ার মূল শক্তি রূপে গুচ্ছ গুচ্ছ স্নায়ু-কোষ (nerve-cells) অবস্থিত আছে এবং রক্তবহা-নালীসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এই স্থানটীকে জীবন-গ্রন্থি (vital knot) বলে। মজ্জার উপরের দিকের অংশ যদি আঘাত প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে চৈতন্যের লোপ হয় অর্থাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তখনও বাঁচিয়া থাকে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চলিতে থাকে বটে কিন্তু কোন যাতনা অনুভব করিবার শক্তি থাকে না। তাহা ছাড়া দেহের সহিত মস্তিষ্কের যোগ ছিন্ন হইয়া যায় এবং ইচ্ছানুসারে অঙ্গচালনা করিবার সকল শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হয়।

মজ্জার নিম্নদিকের অংশ যদি আঘাত প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ রক্ত-সঞ্চালন এবং শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায় এবং তাহার ফলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে।

নবম অধ্যায়

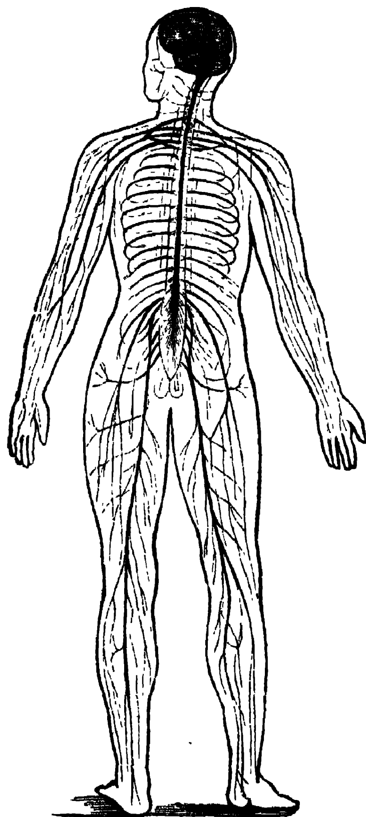
স্নায়বীয় বিধান (Nervous system)

বাষ্পীয় যন্ত্রের (steam-engine) পক্ষে যেমন বাষ্প, দেহ-যন্ত্রের পক্ষে তেম্‌নি স্নায়ু-বিধান (nervous system)। বাষ্প রুদ্ধ করিয়া দাও অমনি মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে ডাণ্ডা, চাকা, হাতল প্রভৃতি বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছিল তাহা তৎক্ষণাৎ চলৎশক্তি হীন হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। শরীরের পক্ষেও ঠিক এইরূপ। স্নায়বীয় বিধানে কোনও আঘাত লাগিলেই কতক বা সমগ্র ইন্দ্রিয় সকল অসাড় হইয়া পড়িবে এবং অবশেষে মৃত্যু ঘটিবে। কাজেই দেহ-যন্ত্রের কলকারখানার মধ্যে গঠন-কৌশলে স্নায়বীয় বিধানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে।

আমরা কি করিয়া চিন্তা করিতে পারি, কোনও বিষয় শিক্ষা করিতে বা বুঝিতে পারি এবং স্মরণ রাখিতে পারি, কি করিয়া দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কোনও কার্য্য করিবার জন্য কি করিয়াই বা মনস্থির এবং পরক্ষণই কার্য্যারম্ভ করিতে পারি, আবার কি করিয়াই বা আমরা ভালবাসিতে, ঘৃণা বা ভয় করিতে, আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশ করিতে পারি, স্নায়বীয় বিধানের আলোচনাদ্বারা এ সকল বিষয়ই বুঝিতে পারা যাইবে।

স্নায়বীয় বিধানের দুইটী বিভিন্ন অংশ আছে, যথা—

(ক) মস্তিষ্ক (brain), মেরবিক স্নায়ু-রজ্জু (spinal cord) এবং মাস্তিষ্ক্য কশেরুকা-মাজ্জেয় স্নায়ুবিধান (cerebro-spinal nerves)—যদ্দ্বারা মস্তিষ্কের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয় (sense organ), মাংসপেশী ও দেহের বাহ্যাংশের অবিচ্ছেদ্য যোগ রক্ষিত হইতেছে।



৪৩ নং চিত্র—স্নায়ুমণ্ডলের অবস্থান দৃশ্য (nervous system)।

(খ) সমবেদন স্নায়ু-বিধান (sympathetic system)—যদ্দ্বারা পরিপাক, রক্ত-সঞ্চালন ও শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্রাবলীর সহিত যোগ রক্ষিত হইতেছে। স্নায়ুবীয় বিধান ঠিক যেন একটী সমগ্র তাড়িত-বার্ত্তা-বহ-প্রণালী (telegraphic system)। মস্তিষ্কটী যেন প্রধান 'তার-আফিস', আর এখান হইতে অসংখ্য স্নায়ু-সূত্র-সকল (nerve fibres) যে দেহের সর্ব্বত্র শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া আছে উহারা যেন ঠিক টেলিগ্রাফের তার। অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে

তাড়িত-বার্ত্তা-বহ-প্রণালীর সহিত স্নায়ু-বিধানের যে কেবল বাহ্যিক সৌসাদৃশ্য আছে তাহা নয়। কারণ ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে কোনও নিগূঢ় উপায়ে দেহের স্নায়বিক ক্রিয়ার সহিত তাড়িত-প্রবাহের ক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

দেহের সর্ব্বত্র কোথায় কি ঘটিতেছে এই সকল স্নায়ুদ্বারা তাড়িত-বার্ত্তা-যোগে অনবরত তাহার সংবাদ মস্তিষ্কে প্রেরিত হইতেছে। মস্তিষ্ক সেই সকল সংবাদ পাওয়ামাত্র পুনরায় তৎক্ষণাৎ স্নায়ু-তার যোগে প্রত্যেকটীর বিষয় কি করিতে হইবে না হইবে সে সম্বন্ধে তাহার আদেশবার্ত্তা প্রেরণ করে।

কোন একজন যদি একটা মজার গল্প করে তাহা হইলে তোমার পক্ষে হাস্য করা অতি স্বাভাবিক এবং সহজ ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে হাস্যোদ্রেকের যন্ত্র-কৌশলটী অর্থাৎ যে প্রক্রিয়া বা দেহ-যন্ত্রের যে যে কল কৌশলটী খাটাইয়া এই হাসির ক্রিয়াটী মুখে দেখাইতে হইবে তাহা অতি জটিল। প্রথমতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুগুলি কথা বা শব্দ-ধ্বনিগুলিকে ধরিয়া মস্তিষ্কে লইয়া যাইবে, তৎপর সেই সংবাদ পাওয়ামাত্র মস্তিষ্ক তৎক্ষণাৎ অপর কতকগুলি স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়া মুখের মাংস পেশীতে তাহার আদেশ জানাইবে। মস্তিষ্কের আদেশানুসারে তখন মুখের পেশী সকল সঙ্কুচিত হইয়া মস্তিষ্কে যে হর্ষ অনুভূত হইয়াছে বাহিরের মুখভঙ্গিতে তাহার প্রকাশ করিবে।

আবার কোন রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাইবার সময় যদি কোন দুর্গন্ধ তোমার নাকে প্রবেশ করে তাহা হইলে হয়ত তুমি

তাড়াতাড়ি পা ফেলিয়া সেখান হইতে যত শীঘ্র পার চলিয়া আসিবে। এরূপ কেন করিবে বল দেখি? কারণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুসকল সেই অপ্রীতিকর অনুভূতির সংবাদ মস্তিষ্কে লইয়া যাইবে এবং মস্তিষ্ক সেই সংবাদ পাওয়ায় পুনরায় তৎক্ষণাৎ পায়ের পেশীসমূহকে সঙ্কুচিত হইয়া তোমাকে সেখান হইতে ত্বরিতপদে চালাইবার আদেশ জানাইবে।

এইরূপ একটা দিয়াশলাইর কাঠি জ্বালাইয়া হাতে ধরিলে আগুনের শিখা উহা ছাড়িয়া যখনই আঙ্গুলের কাছে আসিবে তখনই উত্তাপ লাগিবামাত্র হাত হইতে কাঠিটা ফেলিয়া দিবে। এখানেও ঠিক একই উপায়ে অতি সহজে হাত হইতে জ্বলন্ত কাঠিটা ফেলিয়া দেওয়ার ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। হাত হইতে স্নায়ুযোগে মস্তিষ্কে খবর পহুছিবামাত্র মস্তিষ্ক জানিল যে হাতটা পুড়িবার উপক্রম হইয়াছে আর অমনি তৎক্ষণাৎ অপর একদল স্নায়ুদ্বারা হাতকে জ্বলন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা ফেলিয়া দিতে আদেশ জানাইল। এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

স্নায়ু-তন্তু (nerve tissue) নরম মজ্জার ন্যায় পদার্থ বিশেষ। ইহাতেই মস্তিষ্ক, মেরবিক স্নায়ু-রজ্জু, সমবেদন-স্নায়ু-গ্রন্থি (sympathetic ganglia) এবং স্নায়ু সকলের অধিকাংশ ভাগ পূর্ণ। মস্তিষ্কের মধ্যে ভিতরের অংশ শাদা এবং বাহিরের স্তরটা গোলাপীর আভাযুক্ত পাঁশুটে রং। কিন্তু মেরবিক স্নায়ু-রজ্জুর মধ্যে ভিতরের ভাগ পাঁশুটে বা ধূসর এবং

বাহিরের অংশ শাদা। স্নায়ু-মণ্ডলির মধ্যে সমস্তটাই শাদা রং। রক্ত-বহানালী সমূহের মধ্যে শ্বেত রংএর অপেক্ষা ধূসর বা গোলাপীর আভাযুক্ত পাঁশুটে রংএর ভাগই অধিক।

স্নায়ু-সূত্র (nerve fibres) সকল প্রকৃতপক্ষে দেহের সর্ব্বত্র বিস্তৃত মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার অংশবিশেষ। উহাদিগকে দেখিতে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম, অতি মিহি, রূপার মত ঝক্‌ঝকে শাদা সূতার ন্যায় দেখায়। এই সূতার কতকগুলি করিয়া একটা পাতলা জালি রেশমী কাপড়ের ন্যায় পদার্থের খোলের ভিতর পূরিয়া দিলে যা হয় তাহাই স্নায়ু।

দেহের মাংসপেশীর ভিতর কতকগুলি স্নায়ু দেওয়া আছে, সেই সকল স্নায়ু মস্তিষ্কের আদেশ বহন করিয়া নেয় তাহাতেই পেশিসকলের সঙ্কোচন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সকল স্নায়ুকে পেশীসঞ্চালক-স্নায়ু (motor nerves) বলে। অপর স্নায়ুসকল দেহের নানা স্থান হইতে মস্তিষ্ক-কেন্দ্রে চলিয়া গিয়াছে এবং উহাতে নানা ভাব (impressions) বা জ্ঞান (sensations) বহন করিয়া নেয়। এই সকল স্নায়ুকে সংবিদ-স্নায়ু (sensory nerves) বলে।

পেশী-সঞ্চালক স্নায়ু এবং সংবিদ-স্নায়ু সাধারণতঃ পাশাপাশি হইয়া একটা সরাসরি রাস্তার মত চলিয়া গিয়াছে এবং প্রত্যেকে ক্রমাগত চারিদিকে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে করিতে গিয়াছে। কেবল চুল, নখ, উপাস্থি এবং উপত্বক দেহের একমাত্র অংশ যেখানে কোনও স্নায়ু নাই। তোমাদের নখ বা

চুল কাটিবার সময় যে লাগে না ইহাই তাহার কারণ, নতুবা এই সকল অংশে স্নায়ু থাকিলে এরূপ হইত না।

(১) করোটীক স্নায়ুমণ্ডলী

(Cranial or Cerebral Nerves)

মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীতে বার জোড়া বিভিন্ন স্নায়ু আছে। উহারা মস্তিষ্ক এবং আয়ত-মজ্জা হইতে প্রধানতঃ দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় সমূহে নীত হইয়াছে। এই সকল স্নায়ু করোটী-মূলের নয়টি ছিদ্র পথ-দিয়া মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইয়াছে। এই স্নায়ু ত্রিবিধ, যথা—

(ক) সংবিদ বা অনুভবসম্বন্ধীয় (sensory)
(খ) সঞ্চালক (motor) এবং
(গ) মিশ্র (mixed) অর্থাৎ উভয় প্রকার একত্রে মিশ্রিত।

করোটীর স্নায়ুমণ্ডলী জোড়া জোড়া। যথা :—

প্রথম জোড়া ঘ্রাণ-স্নায়ু (olfactory nerves) বা ঘ্রাণানুভাবক স্নায়ু। ইহারা নাসারন্ধ্রের ভিতর বিস্তৃত আছে। এই স্নায়ুদ্বয় সংবিদ অর্থাৎ অনুভবসম্বন্ধীয়।

দ্বিতীয় জোড়া দর্শন-স্নায়ু (optical nerves) বা দৃশ্যোৎপাদক স্নায়ু। ইহারা মস্তিষ্ক হইতে অক্ষিগোলক (eye balls) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্নায়ুদ্বয়ও অনুভবসম্বন্ধীয়।

তৃতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ জোড়া চক্ষুর পেশীতে গিয়াছে এবং

তাহাদের গতির তত্ত্বাবধান করিতেছে। এই সকল স্নায়ু পেশী-সঞ্চালক, এজন্য ইহাদিগকে 'অক্ষিচালক' বলে।

পঞ্চম জোড়ার প্রত্যেকটীর দুইটী গোড়া। উহার একটী পেশী-সঞ্চালক স্নায়ু। যে মাংসপেশীসমূহ চোয়ালদ্বয়কে চালনা করে উহা তাহাতে গিয়াছে। অপরটী সংবিদ-স্নায়ু। ইহা রসনার উপরিভাগের সম্মুখ দিকে বিস্তৃত আছে। ইহা একটী স্বাদগ্রাহী স্নায়ু।

সপ্তম জোড়া মুখে গিয়াছে। সেখানে মুখের পেশীসমূহের (facial muscles) উপর বিস্তৃত আছে এবং তাহাদের গতির তত্ত্বাবধান করে। এই স্নায়ুদ্বয় পেশী-সঞ্চালক।

অষ্টম জোড়া শ্রুতি-স্নায়ু (auditory nerves) বা শ্রবণানুভবনীয় স্নায়ু। ইহারা শ্রবণেন্দ্রিয়ে বিস্তৃত আছে এবং সংবিদ স্নায়ুবিশেষ।

নবম জোড়াটী কতকটা সংবিদ এবং কতকটা পেশী-সঞ্চালক। প্রত্যেকটী স্নায়ুর দুইটী মূল। একটী স্বাদ-গ্রাহী স্নায়ু। ইহা রসনার পশ্চাদ্ভাগে বিস্তৃত এবং অপরটী পেশী-সঞ্চালক। উহা গলাধঃকরণকালে যে পেশীসমূহের ক্রিয়া হয় তাহা নিয়মিত করে।

দশম এবং একাদশ জোড়াই একমাত্র করোটিক স্নায়ু যাহা দেহ কাণ্ডে চলিয়া গিয়াছে। দশম জোড়াটী স্বর-যন্ত্র (larynx), ফুস্ফুস, হৃদ্‌যন্ত্র, পাকস্থলী এবং যকৃতে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার কতকটা পেশী-সঞ্চালক এবং কতকটা সংবিদ। একাদশ

জোড়াটী কেবল পেশী-সঞ্চালক। উহারা গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশে বিস্তৃত আছে।

দ্বাদশ জোড়াও পেশী-সঞ্চালক এবং বাক্যোচ্চারণ-ক্রিয়ার সূক্ষ্মগতি নিয়মিত করিবার জন্য রসনার পেশীসমূহে বিস্তৃত আছে।

(২) মেরবিক স্নায়ু-রজ্জু (Spinal cord)

মেরবিক স্নায়ু-রজ্জু বা মেরু-মজ্জা মেরুদণ্ডীয় প্রণালীর (vertibral canal) ভিতর দিয়া আয়ত-মজ্জার (medulla oblongata) প্রসারণবিশেষ। ইহা করোটীর তলদেশ হইতে কটিদেশীয় প্রথম কশেরুকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত (৩৯ নং চিত্র) এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৬ কি ১৮ ইঞ্চি হইবে। ইহা একজনের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর ন্যায় মোটা অর্থাৎ পুরু। করোটীর তলদেশে যে ছিদ্র-পথে ইহা চলিয়া গিয়াছে তাহাকে বৃহদ্রন্ধ্র (foramen magnum) বলে। মস্তিষ্কের তিনটী ঝিল্লিময় আবরণ (dura mater, arachnoid and pia mater) এই মেরবিক স্নায়ু-রজ্জুকেও বেষ্টন করিয়া আছে। প্রকৃত পক্ষে করোটী-গহ্বরের অন্তর তিনটীরই উহা প্রসারণ মাত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মস্তিষ্কের ন্যায় মেরু-মজ্জারও শ্বেত ও ধূসর দুই প্রকার স্নায়ু-মজ্জা (nerve matter) আছে। কিন্তু তাহাদের অবস্থান ঠিক বিপরীত অর্থাৎ ভিতরাংশ ধূসর এবং বহিরাংশ শ্বেত। ভিতরাংশের ধূসর পদার্থ হইতে ৩১ জোড়া

স্নায়ু মেরবিক প্রণালীর (vertibral canal) প্রত্যেক পাশ দিয়া চলিয়া গিয়া কশেরুকার ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে **মেরবিক স্নায়ু** (spinal nerves) বলে।

প্রত্যেকটী মেরবিক স্নায়ুব দুইটী গোড়া বা মূল। একটী স্নায়ু-রজ্জুর (cord) সম্মুখের দিক হইতে এবং অপরটী পশ্চাদ্দিক হইতে নির্গত হইয়াছে। গোড়ার উপরেই দুইটী যুক্ত হইয়া পাশাপাশি ভাবে দেখিতে একটী রূপার তারের মত হইয়া কশেরুকার ফাঁক দিয়া চলিয়া গিয়াছে। মেরবিক প্রণালী হইতে বাহির হইয়া প্রত্যেকটী স্নায়ু ক্রমাগত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সূত্রবৎ ডালপালা বিস্তার করিয়া পেশীসমূহের ভিতর দিয়া দেহের উপরিভাগে শেষ হইয়াছে।

যে সকল স্নায়ু-মূল স্নায়ু-রজ্জুর সম্মুখের দিক হইতে আসিয়াছে তাহারা পেশী-সঞ্চালক স্নায়ু। ইহাদের শাখা-প্রশাখা দেহের পেশীসমূহে বিস্তৃত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছে।

যে সকল স্নায়ু-মূল স্নায়ু-রজ্জুর পশ্চাদ্ভাগ হইতে বাহির হইয়াছে তাহারা সংবিদ-স্নায়ু (sensory nerves)। ইহাদের সূক্ষ্ম সূত্রবৎ শাখা-প্রশাখা দেহের উপরিভাগে, ত্বকে গিয়া শেষ হইয়াছে। ইহারাই স্পর্শানুভূতির স্নায়ু। মেরুদণ্ড হইতে বাহির হইবার পর এই সকল স্নায়ুর যদি কোনও একটী কাটিয়া যায় বা কোনও রূপে আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে দেহের যে সকল অংশে এই স্নায়ুর ডালপালা বিস্তৃত আছে সেই সকল

অংশ অসাড় হইয়া পড়িবে অর্থাৎ সেই সকল অঙ্গের অনুভব-শক্তি একেবারে লোপ পাইবে। তবে পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে যদি স্নায়ুর কেবল সম্মুখের মূলটী আহত হয় তাহা হইলে অনুভবশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিলেও অঙ্গচালনা-শক্তির বিলোপ হইবে। কিন্তু পশ্চাতের মূলটী আহত হইলে ইহার ঠিক বিপরীত ফল ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারিলেও তাহাদের কোনও সাড় থাকে না। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে এই সকল মেরবিক স্নায়ুর সম্মুখের মূলটী পেশী-সঞ্চালক এবং পশ্চাতের মূলটী সংবিদ।

এক্ষণে মেরবিক স্নায়ু-রজ্জুর ক্রিয়াবলীর বিষয় বলা যাইতেছে।

(ক) মেরবিক স্নায়ু-রজ্জু দেহের নানাস্থান হইতে ইহার সংবিদ স্নায়ুমণ্ডলীদ্বারা ভাবসমূহ গ্রহণ করে এবং তাহাদিগকে মস্তিষ্কে বহন করিয়া নেয়। সেখানে তাহারা অনুভূতি বা চৈতন্যের উদ্রেক করে।

(খ) ইহার পেশী-সঞ্চালক স্নায়ুমণ্ডলীদ্বারা মস্তিষ্কের অনুজ্ঞা সকল ইহা স্বেচ্ছানুবর্ত্তী পেশীসমূহে প্রেরণ করে এবং এইরূপে দেহ-সঞ্চালন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(গ) ইহা দেহের কোনও কোনও অংশ হইতে ইহার সংবিদ স্নায়ুমণ্ডলীদ্বারা ভাবসকল গ্রহণ করিয়া এবং মস্তিষ্কের সহিত কোনও পরামর্শ না করিয়াই নিজের হুকুমে পেশীসমূহে আদেশ প্রেরণ করিয়া একপ্রকার প্রধান কেন্দ্রের কাজ করে।

মেরবিক স্নায়ু-রজ্জুর এই শেষোক্ত ক্রিয়াটাকে প্রতি-ক্রিয়া (reflex action) বলে। সংবিদ স্নায়ুমণ্ডলীকর্তৃক মেরবিক স্নায়ু-রজ্জুতে যে ভাবাবেগ (impulse) প্রেরিত হয় তাহা প্রত্যাবৃত হয় অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ তাহা পেশী-সঞ্চালক বেগরূপে পেশীসমূহে পুনঃ প্রেরিত হয় বলিয়া ইহাকে প্রতিক্রিয়া বলা হয়।

কোনও দুর্ঘটনা বশতঃ যদি কাহারও মেরু-মজ্জা পিষিয়া যায় তাহা হইলে আহত স্থানের নিম্নভাগের সমস্ত অঙ্গ হইতে মস্তিষ্কের যোগ বিচ্যুত হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় দেহের সমস্ত নিম্নাঙ্গ অবশ বা অসাড় হইয়া পড়ে। তখন আর অনুভব-শক্তির উদ্রেক করিবার জন্য মস্তিষ্কে কোনও সংবাদ বাহিত হইতে পারে না এবং মস্তিষ্ক হইতেও স্বেচ্ছানুরূপ ক্রিয়া উৎপন্ন করিবার কোনও অনুজ্ঞা আসিতেও পারে না। কাজেই সেই অঙ্গের আর কোনও অনুভব শক্তিও থাকে না এবং নড়াচড়া করিবার শক্তিও লোপ পায়। এইরূপ হইলে পদদ্বয় যদি অসাড় হইয়া যায় এবং তাহাতে কোনও অনুভব-শক্তি বা ইচ্ছানুরূপ চালনা করিবার কোনও শক্তি থাকে না। তথাপি কেহ আড়াল হইতে পায়ের তলায় সুড়্সুড়ি দিলে তৎক্ষণাৎ লাথি মারিবে। এস্থলে এই যে পদাঘাত উহা সে ব্যক্তির জ্ঞানকৃত ক্রিয়া নহে কিন্তু মেরবিক স্নায়ু-রজ্জুর স্বাধীন ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ ইহা মেরবিক স্নায়ু-রজ্জুর প্রতিক্রিয়ার ফল।

মস্তিষ্কও কতকগুলি প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করে। ইচ্ছা না করিলেও আপনা হইতেই এই সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে

এবং প্রায়ই অজ্ঞাতসারে ঘটে। হঠাৎ তীব্র আলোক-রশ্মি দেখিলে যে তোমরা চোখ মিট্‌মিট্‌ কর তাহা এই প্রতিক্রিয়ার ফলে। কিল বা ঘুসি ওচাইলে যে আপনা হইতে হঠাৎ দেহ সঙ্কুচিত হয় অথবা বজ্রপাত বা অপর কোনও উচ্চ শব্দে যে সমস্ত দেহ হঠাৎ কাঁপিয়া উঠে এ সকলই এই প্রতিক্রিয়া-জনিত। ইহার প্রত্যেক ঘটনাতেই ব্যক্তিবিশেষের অনুভূতি না হইয়াও তাহার ফল দেখা গিয়াছে।

মেরবিক-স্নায়ু (spinal nerves) স্নায়ু-রজ্জুর ভিতরের ধূসরবর্ণের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সকল স্নায়ুর ভিতর দিয়া মস্তিষ্ক হইতে দেহের ভিতরে এবং দেহের ভিতর হইতে মস্তিষ্কে যে সকল সংবাদ চলাচল করে তাহাদের কতক স্নায়ু-রজ্জুর এই ধূসর মজ্জাভাগের ভিতর দিয়া এবং কতক উহার বহিঃস্থ শাদা অংশের ভিতর দিয়া চালিত হয়। মস্তিষ্কের ন্যায় এখানেও কেবল ধূসরবর্ণ মজ্জাভাগের মধ্যেই কার্য্যকরী শক্তি নিহিত আছে। কেবল পার্থক্য এই যে মস্তিষ্কের বেলায় এই ধূসর মজ্জাভাগ বহিরাংশে এবং মেরবিক স্নায়ু-রজ্জুর বেলায় উহা ভিতরাংশে থাকে।

স্নায়ুগুলি যেন ঠিক টেলিগ্রাফের তার। এই টেলিগ্রাফের তার যেমন কেবল তাড়িত-প্রবাহ বা সংবাদ বহন করে, শুধু তারগুলির তাড়িতোৎপাদক কোন শক্তি নাই, ঠিক সেইরূপ এই স্নায়ুগুলিরও নিজেদের কোনও বোধ বা অনুভব শক্তি কিম্বা কোনও হুকুম করিবার শক্তি নাই। উহারা কেবল ইতস্ততঃ

সংবাদ বহন করিয়া নেয় মাত্র। এজন্য ইহাদের মধ্যে ধূসরবর্ণের পদার্থ একবারে দেখিতে পাওয়া যায় না, উহারা কেবল শাদা স্নায়ু-মজ্জাতে পূর্ণ।

টেলিগ্রাফের তারগুলির মধ্যে যদিও তাড়িত সঞ্চিত থাকে না কিন্তু তার কাটিয়া দিলেই যেমন আর তাড়িত-প্রবাহ চলাচল করিতে না পারায় সংবাদ প্রেরণ অসম্ভব হয় ঠিক সেইরূপ এই স্নায়ুমূলগুলি যদি কোন কারণে একবারে নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে দেহের যে সকল অংশে উহাদের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত আছে সেই সকল অংশ একবারে অসাড় হইয়া পড়িবে ; তখন আর বেদনা অনুভব করিবার কিম্বা অঙ্গসঞ্চালন করিবার কোনও শক্তি থাকিবে না। এমন কি তখন ঐ সকল অংশ কাটিলে কিম্বা পোড়াইলেও কোনও বেদনা অনুভূত হইবে না।

(৩) সমবেদক স্নায়ুবিধান
(Sympathetic system)

গাঁইট গাঁইট স্নায়ুপদার্থ মেরুদণ্ডের দুই পাশে এবং সম্মুখের দিকে তিনটী মালার লহরের ন্যায় হইয়া অবস্থিত আছে। এই গাঁইটগুলিকে স্নায়ু-গ্রন্থি (ganglia) বলে। স্নায়ু-গ্রন্থিগুলি পরস্পর পরস্পরের এবং মেরবিক স্নায়ুর সহিত স্নায়বিক রজ্জু-দ্বারা যুক্ত আছে। এই রজ্জুকে সমবেদক রজ্জু (sympathetic cord) বলে। ইহাদের ক্রিয়াসমষ্টিকে সমবেদক স্নায়ুবিধান (sympathetic system) বলা হয়।

এই স্নায়ু-গ্রন্থি সমূহ হইতে স্নায়ুসকল দেহের অধিকাংশ স্থলে রক্তবহা নালীর ন্যায় শাখা বিস্তার করিয়া আছে কিন্তু বক্ষোদর (thorax) এবং কুক্ষিতে (abdomen), হৃদ্‌যন্ত্রের উপর এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রাদির আশে পাশে ঘন সন্নিবিষ্ট জালির ন্যায় হইয়া আছে। সমবেদক স্নায়ুবিধানের বহুতর স্নায়ু-সূত্র মেরবিক স্নায়ু-রজ্জু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু অপর-গুলি স্নায়ু-গ্রন্থি সমূহ হইতেই উদ্ভূত হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রক্তবহা নালীসমূহে ছড়াইয়া পড়িবার জন্য আবার মেরবিক স্নায়ুতেই ফিরিয়া গিয়াছে।

সমবেদক স্নায়ুবিধান এইরূপে দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাবলীর অধিকাংশের উপর কর্ত্তৃত্ব করে এবং কতক পরিমাণে পরিপাক, পুষ্টিসাধন, রক্ত-সঞ্চালন এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াবলীর যন্ত্রাদিকে নিয়মিত করে।

লজ্জায় গাল লাল হওয়া ও কাণ গরম হওয়া কিম্বা ভয়ে বা হঠাৎ কোনও দুর্ঘটনা শ্রবণে মুখ বিবর্ণ হওয়া এই সমবেদন স্নায়ুবিধানের ক্রিয়া-জনিত ফল। প্রথমে মনে কোনও ভাবের উদ্রেক হইলে তাহার প্রভাবে সমবেদক স্নায়ুমণ্ডলীতে বিস্তৃত হয় এবং অবশেষে এই স্নায়ুবিধানের যে সকল সূক্ষ্ম স্নায়ু-সূত্র রক্তবহানালী সমূহের গাত্রের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে সেই সময়ের জন্য রক্তবহানালী সমূহের উপর তাহাদের কর্ত্তৃত্ব শিথিল হইয়া পড়ে। এজন্য অধিকতর পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হইবার সুযোগ ঘটে। এখন বোধ হয় বুঝিলে গাল

লাল হয় কেন। রক্ত উষ্ণ এবং লোহিত বর্ণ তরল পদার্থ তাহা জান। চামড়া লাল এবং গরম হইয়া উঠিবার কারণ এই যে এই সময়ে রক্তবহানালীতে অধিক পরিমাণে এই লাল এবং উষ্ণরক্ত সঞ্চারিত হয়। এইরূপে ভয় পাইলে কিম্বা হঠাৎ কোনও শোক সংবাদ শুনিলে মুখ পাংশুবর্ণ হইবার কারণ এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীসমূহের পেশীসকল এই সময়ে সঙ্কুচিত হওয়াতে রক্তবহানালী সকলে চাপ পড়ে এজন্য রক্তের প্রবাহ কমিয়া যায়। পেশীসমূহের এ সঙ্কোচন ক্রিয়া সমবেদক স্নায়ু-মণ্ডলীর ক্রিয়ার ফল।

(৪) সংজ্ঞা (Sensation) বা চৈতন্য (Consciousness)

মস্তিষ্ক এবং উহার ক্রিয়ার বিষয় আলোচনা করিবার সময় আমরা জানিতে পারিয়াছি যে সংজ্ঞা বা চেতনার অনুভূতি উহার প্রধান কাজ। সম্ভবতঃ মূল-মস্তিষ্ক গোলকার্দ্ধদ্বয়ের (cerebral hemispheres) পশ্চাৎ অর্থাৎ তলভাগেই এই সংজ্ঞা বা চেতনা শক্তির মূল ভিত্তি।

তোমরা জান যে স্নায়ু সকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—হয় পেশী-সঞ্চালক না হয় সংবিদ্। অর্থাৎ এক শ্রেণীর ক্রিয়া দেহের পেশীসমূহকে নিয়মিত করা এবং অপর শ্রেণীর ক্রিয়া দেহের নানা স্থান হইতে বিবিধ ভাব সমূহকে মস্তিষ্কে বহন করিয়া নেওয়া। যখন কোনও সংবিদ-স্নায়ুদ্বারা মস্তিষ্ক বিশেষ

কোনও ভাব গ্রহণ করে তখনই আমাদের কোনও ভাব বা জ্ঞানের অনুভূতি হয়।

এই সংজ্ঞা বা চৈতন্য দ্বিবিধ—সাধারণ অর্থাৎ যাহা সচরাচর ঘটে এবং বিশেষ বা অসাধারণ অর্থাৎ যাহা কোনও বিশেষ অবস্থায় ঘটিয়া থাকে। প্রথমটী অসংখ্য প্রকার এবং উহাদের কার্য্যও বহুতর বিবিধ স্নায়ুযোগে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অপরটী অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রান, আস্বাদন, স্পর্শ প্রভৃতি বিশেষ জ্ঞান পৃথক পৃথক বিশেষ স্নায়ুসমূহের দ্বারা সম্পন্ন হয়।

আমরা সকলে যে প্রতিনিয়ত কত নানা রকম সাধারণ ভাব সকল অনুভব করিতেছি ঠিক কোন্ প্রণালীতে উহারা আমাদের বোধগম্য বা জ্ঞানগোচর হয় তাহা দেহ-যন্ত্রের বহুবিধ নিগূঢ় রহস্য-ময় কল কৌশলাদির ন্যায় উহাও আমাদের কাছে কুহেলিকাময় থাকিয়া যাইবে। সে যাহা হউক আমাদের সমগ্র সত্তা বা চৈতন্যের সহিত দৈহিক চেতনা বা অনুভূতির এমন একটা বিশেষ সমন্বয় আছে যে মানবের সুখ দুঃখের মোট পরিণাম অনেক পরিমাণে তাহাদের উপর নির্ভর করে।

বাহ্য বা দৃশ্যতঃ কিম্বা কারণ ব্যতীত কোনও নিগূঢ় উপায়ে আপনা হইতেই আমাদের ভিতরে সংজ্ঞাহীনতা বা মূর্চ্ছা, ছট্-ফটানি বা অস্থিরতা, নৈরাশ্য বা হতাশ্বাস, অসোয়াস্তি বা ক্লান্তি, প্রফুল্লতা বা স্ফূর্ত্তি প্রভৃতির ন্যায় কতকগুলি ভাব বা অনুভূতির উদ্রেক হইতে দেখা যায়। আমরা এই সকল অনুভূতির বিশেষ কোনও স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারি না। অর্থাৎ এই সকল ভাব

দেহের কোনও স্থান-বিশেষে উপলব্ধি হইতেছে তাহা নহে। আমাদের দেহের ভিতরেই অনুভূত হইতেছে কিন্তু কেমন করিয়া কোথায় হইতেছে তাহা জানিতে পারি না। তবে অধিকাংশ সংজ্ঞা বা চৈতন্যই কোনও উত্তেজনা বা বাহ্য কার্য্য-কারণ-জনিত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই শেষোক্ত অনুভূতি সকল দেহের স্থানবিশেষে আবদ্ধ থাকে অর্থাৎ কোনও উত্তেজনা বা বাহিরের কার্য্য-কারণজনিত যে ভাব দেহের যে অংশে অনুভূত হইতেছে সেই ভাব বা অনুভূতি দেহের অপর কোনও অংশের উত্তেজনা-জনিত হইতে পারে না। যেমন আস্বাদন এবং আঘ্রাণের অনুভূতি মুখ এবং নাসিকা বিবরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির কোনও বিশেষ অংশে আবদ্ধ আছে। এইরূপ দর্শন ও শ্রবণের অনুভূতি চক্ষু ও কর্ণে এবং স্পর্শানুভূতি ত্বকেই সম্ভব হইবে—অন্যত্র নহে। দেহের যে বিশেষ বিশেষ অংশে বিশেষ বিশেষ অনুভূতির উদ্রেক হয় তাহাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় (sense-organ) বলে।

এই অনুভূতি বা চেতনা আরামদায়ক বা ক্লেশকর, যে কোনও প্রকার হইতে পারে। আরাম এবং ক্লেশকর এই উভয় অনুভূতিই আতিশয্যের তারতম্যানুসারে একই কার্য্যকারণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। শীতের রাত্রে আগুন পোহাইতে কেমন আরাম কে না জানে ? কিন্তু হাতখানা যদি আগুনের একবারে কাছে বাড়াইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে আগুনের প্রখর তাপে তখন সেই আরামদায়ক অনুভূতি ঘুচিয়া গিয়া ক্লেশে পরিণত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মস্তিষ্ক জ্ঞানের আধার। যদিও আমরা হাতে পায়ে কিম্বা দেহের অপর কোনও অংশে একটী বেদনা অনুভব করি তথাপি অনুভূতি দেহের সেই সকল অংশে না হইয়া মস্তিষ্কেই হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা যায় যে দৃশ্যের অনুভূতি চক্ষে না হইয়া মস্তিষ্কে হইয়া থাকে এবং ঘ্রাণের অনুভূতিও নাকে না হইয়া মস্তিষ্কেই হইয়া থাকে, ইত্যাদি।

ইহা হইতে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, সমস্ত অনুভূতিই তিনটী স্বতন্ত্র যান্ত্রিক রচনাদ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা—

(ক) বাহিরের প্রাকৃতিক বা ভৌতিক কার্য্য-কারণজনিত উত্তেজনা বা চেতনাকে গ্রহণ করিবার মত বিশেষভাবে প্রস্তুত একটী যন্ত্র।

(খ) সেই ভাবকে উক্ত যন্ত্র হইতে মস্তিষ্কে লইয়া যাইবার জন্য একটী সংবিদ্-স্নায়ু।

(গ) সেই ভাবকে প্রত্যক্ষ বা জ্ঞানগোচর করিবার জন্য মস্তিষ্ক।

এই তিনটীর যে কোনও একটী ক্ষুণ্ণ বা আহত হইলে তৎক্ষণাৎ অনুভবশক্তির হ্রাস বা একবারে লোপ হয়।

দশম অধ্যায়

জ্ঞানেন্দ্রিয় (The Senses)

তোমরা বোধোদয়ে পড়িয়াছ 'ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ'। গ্রন্থারম্ভে আমাদের দেহ-ঘরের পাঁচটী দরজার কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই পাঁচটী দ্বার বা ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা সকল বিষয় জানিতে পারি। ইহাদের নাম—(১) স্পর্শেন্দ্রিয়, (২) রসনেন্দ্রিয়, (৩) ঘ্রাণেন্দ্রিয়, (৪) শ্রবণেন্দ্রিয়, (৫) দর্শনেন্দ্রিয়। ইহাদের ক্রিয়ার বিষয়ে পূর্ব্ব অধ্যায়ে কতকটা আভাস দেওয়া হইয়াছে। ক্রমে ইহাদের প্রত্যেকটীর বিষয় পৃথক ভাবে বলা যাইতেছে।

বিশেষ বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে বিশেষ বিশেষ অনুভূতি হইয়া থাকে একথা তোমরা জানিয়াছ। আবার এই বিশেষ বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির গঠন-কৌশল এমনই চমৎকার যে প্রত্যেকটী ইন্দ্রিয়কে বিশেষ বিশেষ ভাব গ্রহণের বা অনুভূতির উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে।

তোমরা সচরাচর পঞ্চেন্দ্রিয়ের কথা শুনিয়া আসিতেছ। কিন্তু এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতি বা জ্ঞান ব্যতীত অপর আর একটী অনুভূতি আছে তাহাকে 'পেশলানুভূতি (mascular-sense) বলে। মাংসপেশীর এই অনুভূতি হইতেই আমাদের

ওজন জ্ঞান হইয়া থাকে। ক্রমাগত ব্যবহারদ্বারা এই জ্ঞানটী এমন তীক্ষ্ণ হয় যে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় দোকান-দারগণ কোনও জিনিষ কেবল হাতে করিয়া তুলিয়াই তাহার ওজন বলিয়া দিতে পারে।

সমস্ত দেহ বা কোনও অঙ্গ-সঞ্চালনে কোনও প্রকার প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত বা বাধা প্রাপ্ত হইলে যে প্রতিঘাতের ভাব উদিত হয় এই পেশলানুভূতি অনেকটা তাই। এই অনুভূতি কোনও কিছুতে গা ঠেকিলে অথবা কোনও চাপ পড়িলে যে বাধা বোধ হয় তাহা হইতেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে কোনও একটা ভারী জিনিষ তোলে কিম্বা বহিয়া নেয় সে বেশ জানে যে তাহার এই অনুভূতি হইতেছে কিন্তু যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাহার এই অনুভূতি দেহের কোন্ স্থানে হইতেছে তাহা হইলেই সে মহাগোলে পড়িবে। কারণ কোনও একটী বিশেষ স্থানে সে ইহা উপলব্ধি করিতেছে না।

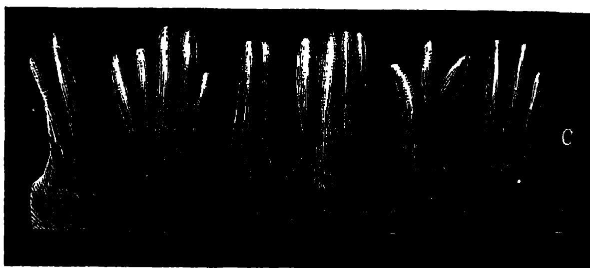
পেশলানুভূতি যে কেবল কোনও ভারী জিনিষ তুলিবার সময়ই হয় তাহা নহে। তোমরা সকলই হয়ত লক্ষ্য করিয়াছ যে আমরা চক্ষু বুজিয়া থাকিলেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকলের কোনও নড়াচড়া হইলেই তাহা কোন দিক হইতে এবং কতদূর পর্য্যন্ত হইতেছে আমরা ঠিক বুঝিতে পারি। তা ছাড়া আমাদের অঙ্গ-সংস্থান স্বেচ্ছাকৃতই হউক বা অপর-কর্ত্তৃকই হউক তাহাও আমরা জানিতে পারি। পেশলানুভূতিই অঙ্গ-সংস্থান বা অঙ্গ-সঞ্চালন-প্রভৃতি জ্ঞানের মূল।

(১) স্পর্শেন্দ্রিয় (The Sense of Touch)

স্পর্শজ্ঞান (চাপানুভূতি, উত্তাপ ও শৈত্যানুভূতি এবং বেদনানুভূতি) অল্পাধিক পরিমাণে দেহের সর্ব্বত্র ত্বক-ভাগে, মুখ-বিবরে এবং নাসারন্ধ্রে অনুভূত হইয়া থাকে। যে সকল অংশে এই অনুভূতি হয় সেই সকল স্থান ত্বাচ বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি-ময়। এই ঝিল্লির দুইটী স্তর। ইহার নিম্নস্তরের গভীর পরতটী কৈশিক নাড়ীজালে আবৃত সূত্রীয় পেশিতন্তু (fibres tissue) বিশিষ্ট এবং ঊর্দ্ধস্তরের উপরভাসা পরতটী কোনও প্রকার স্নায়ু বা রক্তবহা-নালীবিহীন এবং উপত্বাচ-কোষ (epidermic cells) বিশিষ্ট। চতুর্থ অধ্যায়ে ছাল বা উপত্বক এবং চামড়া বা প্রকৃত ত্বকের বিষয় হয়ত ভুলিয়া যাও নাই (৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা)। এই ভিতরের গভীর স্তরটীই প্রকৃত ত্বক (dermis) এবং বাহিরের সাড়হীন স্তরটীই উপত্বক (epidermis)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রকৃত ত্বক একটী সমতল স্তর নয়, কিন্তু ইহার উপরিভাগ অতি ক্ষুদ্র অসংখ্য কাঁটার ন্যায় উঁচু উঁচু হইয়া উঠিয়াছে এবং অতি ঘন সন্নিবিষ্টভাবে লাঙ্গল চষা জমির 'ডাঁড়া'র ন্যায় অর্থাৎ লাঙ্গল দিয়া চষিলে যেমন মাঝখানটা 'ডাঁড়া' বা আলের মত হইয়া তাহার দুইপাশে 'শিরেল' বা লাঙ্গলের রেখার টানা গর্ত্ত থাকে সেইরূপ হইয়া আছে। এই সকল অতি ক্ষুদ্র ডাঁড়াকে উন্নয়ন (papillæ) বলে। প্রত্যেক উন্নয়নের ঠিক মাথায় একটী সংবিদ-স্নায়ু, একটী অতি ক্ষুদ্র ধমনী

এবং সূক্ষ্মতম চুল অপেক্ষাও মিহি একটী শিরার*মুখ আসিয়া শেষ হইয়াছে। যে স্থানে স্পর্শানুভূতি অতিশয় তীব্র সেই স্থানের উন্নয়নগুলিতে ত্বাচানুকোষ (tactile corpuscle) নামক একটী ক্ষুদ্র ডিম্বাকৃতি কোষ দেখিতে পাওয়া যায়।



৪৫ নং চিত্র—হাতের তালুর চামড়ার উন্নয়নগুলি (papillæ of the skin from the palm of the hand) অনুবীক্ষণে যেরূপ দেখায়।

আঙ্গুলের ডগে, রসনার অগ্রভাগে এবং হাতের তালুতেই স্পর্শানুভূতি অধিক।

উপত্বক বা ছাল প্রকৃত ত্বক বা চাম্ড়ার উপরিভাগে বিস্তৃত আছে এবং উন্নয়নগুলির মধ্যদেশ অর্থাৎ 'শিরেল' পূর্ণ করিয়া আছে। এইরূপে উন্নয়নের আগাটী এমনভাবে দাঁড়াইয়া আছে যে ত্বকের উপরিভাগের অতি সন্নিকটে আছে। প্রকৃত ত্বকের অতি সহজে অনুভব বা উত্তেজনা জ্ঞানের (sensitiveness) ন্যূনাধিক্য করাই উপত্বকের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। উপত্বকটী তুলিয়া ফেলিলে (ফোস্কা পড়িলে বা 'নুনছাল' উঠিয়া গেলে যেরূপ হয়) কোমল নিম্নস্তরটীতে বিন্দুমাত্র স্পর্শেই জ্বালাকর

বেদনা অনুভূত হয়। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে প্রকৃত ত্বক উপত্বকদ্বারা সুরক্ষিত না হইলে প্রত্যেকবার কোনও কিছু স্পর্শ করিবামাত্র আমাদের কেবল কোমল স্পর্শানুভূতি হইত না কিন্তু বিলক্ষণ বেদনা অনুভূত হইত। প্রকৃতপক্ষে উপত্বক এক-দিকে প্রকৃত ত্বকের স্নায়ু-সূত্রের এবং অপরদিকে বাহ্যপ্রকৃতির মধ্যস্থ স্বরূপ।

পরমকারুণিক পরমেশ্বরের এমনি কৃপার বিধান যে অন্ধ-দিগের স্পর্শানুভূতি অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত অধিক। তোমরা শুনিয়া থাকিবে যে অন্ধদিগকে স্পর্শানুভূতির দ্বারা বিদ্যাশিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তাহাদের পড়িবার জন্য যে বই আছে তাহার অক্ষর সকল উঁচু উঁচু। এই সকল অক্ষরের উপর অঙ্গুলি স্পর্শে অন্ধগণ পাঠ করিয়া থাকে। স্পর্শশক্তির বলে অন্ধেরা বেত এবং বাঁশের অনেক কারুকার্য্যও শিক্ষা করিয়া থাকে।

স্পর্শেন্দ্রিয়ের ত্বাচানুভূতি ব্যতীত অপর তিনটী অনুভূতি আছে। যথা—

(ক) চাপানুভূতি (sensation of pressure),

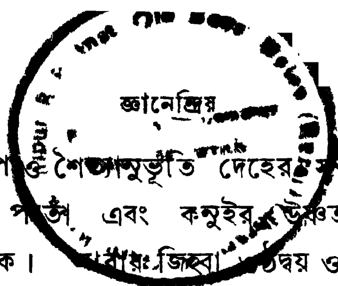
(খ) উত্তাপ ও শৈত্যানুভূতি (sensation of heat and cold),

(গ) বেদনানুভূতি (sensation of pain)।

(ক) চাপানুভূতি—কোন একটা কিছু ত্বকের কেবলমাত্র সংস্পর্শে আসিলেই উহার উপর চাপ প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং তজ্জনিত যে উত্তেজনা হয় তদ্দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে কিছুতে আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছে। চাপ এবং ইহার তারতম্য

অনুভবের শক্তিকে আমরা চাপানুভূতি বলিতে পারি। ত্বকের বিভিন্ন স্থলের অনুভব শক্তি চাপের বিভিন্নতানুসারে হ্রাসবৃদ্ধি পাইয়া থাকে। একই স্থানে পর 'পর দুইটী বিভিন্ন ওজনের জিনিষ স্থাপন করিলে উভয়ের ওজনের তারতম্য বুঝিতে পারা যাইবে। এইরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে হাতের উল্টাপিঠ ও কপালের চামড়ায় চাপানুভূতি অপেক্ষাকৃত তীব্র এবং আঙ্গুলের ডগে অতি ক্ষীণ।

(খ) উত্তাপ ও শৈত্যানুভূতি—আমাদের উষ্ণতা বা শীতলতার অনুভূতি ত্বকে পরিব্যাপ্ত সংবিদ স্নায়ুর উত্তেজনার ফল এবং স্পর্শানুভূতি হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র। আবার এই উষ্ণতা বা শীতলতার অনুভূতিও আপেক্ষিক অর্থাৎ একের তুলনায় অপরটীকে উষ্ণ বা শীতল বলিয়া অনুভব করিয়া থাকি। মনে কর তিনটী পৃথক পাত্রের একটীতে শীতল জল, একটীতে গরমজল এবং অপরটীতে ঈষদুষ্ণ জল রাখিয়া যদি প্রথমে গরম জলে হাত দিয়া তৎপরে ঈষদুষ্ণ জলে হাত দাও তাহা হইলে উহা অপেক্ষাকৃত শীতল বোধ হইবে। আবার শীতলজলে হাত দিয়া যদি তৎপরে উক্ত ঈষদুষ্ণজলে হাত দাও তাহা হইলে উহাই তখন উষ্ণ বোধ হইবে। এইরূপে শীতকালের রাত্রিতে যদি একজন লোক বাহির হইতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহার কাছে ঘরের হাওয়া অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বলিয়া বোধ হইবে। তেমনি আবার কোন ব্যক্তি যদি সেইরূপ ঘর হইতে বাহিরে যায় তখন বাহিরের হাওয়া তাহার কাছে শীতল বোধ হইবে।



এইরূপ উত্তাপ ও শৈত্যানুভূতি দেহের সর্ব্বত্র সমান নয়। গণ্ডদেশ, চক্ষুর পাতা এবং কনুইর উষ্ণতা অনুভব-শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক। আবার জিহ্বা, ওষ্ঠদ্বয় ও আঙ্গুলের ডগের স্পর্শানুভূতি যদিও প্রবল কিন্তু উষ্ণতানুভব শক্তি প্রখর নয়। শিশুদিগকে গরমজলে স্নান করাইবার সময় কনুইদ্বারা জল স্পর্শ করিয়া জল কতটা গরম আছে তাহা জানিয়া লইতে হয়। মুখ-বিবরের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি অপেক্ষা গল-নালী এবং পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উষ্ণতানুভব শক্তি অধিক। অতিরিক্ত গরম কোন দ্রব্য আহার বা পান করা কখনই কর্ত্তব্য নয়। এমন কি মুখে সহ্য হয় এরূপ গরম হইলেও তাহা খাওয়া উচিত নয় কারণ মুখে যতটা গরম সহ্য হইবে গল-নালী বা পাকস্থলীর ততটা গরম সহ্য করিবার শক্তি নাই। অনেকে গরম খাইতে গিয়া চিবাইতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি গিলিয়া ফেলে। এমতাবস্থায় চিবাইতে গেলে গরম ভুক্তদ্রব্যটী যতক্ষণ মুখের ভিতর রাখা আবশ্যক হয় উষ্ণতার আতিশয্যতার জন্য তাহা রাখিতে না পারায় গিলিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। এরূপ করা নিতান্ত গর্হিত।

(গ) বেদনানুভূতি—যে সকল স্নায়ু অনুভূতির উদ্রেক করে বেদনাকে সেই সকল কোনও স্নায়ু-প্রান্তে (nerve endings) অতিরিক্ত উত্তেজনার ফলস্বরূপ ধরা যাইতে পারে। বেদনানুভূতির পৃথক কোন ইন্দ্রিয় নাই। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে স্পর্শানুভূতি না থাকিলেও বেদনানুভূতি আছে।

বেদনার অনুভব অন্যান্য অনুভূতির সঙ্গে এমনভাবে মিশ্রিত যে পৃথকভাবে ইহাকে অনুভব করিতে পারা যায় না।

(২) রসনেন্দ্রিয় (The Sense of Taste)

আস্বাদনানুভূতি রসনায়, বিশেষভাবে ইহার পশ্চাদ্ভাগ এবং তালুদেশের পশ্চাদংশে নিহিত আছে। তবে রসনাই আস্বাদনের প্রধান ইন্দ্রিয়। ইহার গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে জিহ্বার বিষয় বর্ণনাকালে (৭২ পৃষ্ঠা) যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হয়ত তোমাদের মনে আছে।

দেহের অপরাংশের ন্যায় জিহ্বারও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিময় দুইটী আবরণ আছে। ইহার একটী স্তর গভীর এবং অপরটী উপর-ভাসা। প্রকৃত ত্বকের ন্যায় এই গভীর স্তরটীও সূক্ষ্ম কাঁটাময় বা উন্নয়নবিশিষ্ট। ত্বকের উন্নয়ন অপেক্ষা ইহার উন্নয়নগুলি বৃহৎ। রসনাগ্রে অর্থাৎ জিহ্বার ডগে এই উন্নয়নগুলির অধিকাংশই লম্বা সূক্ষ্ম এবং তীক্ষ্ণ। ইহাদিগকে সূত্রাকার উন্নয়ন (filiform papillæ) বলে। জিহ্বার অপরাংশে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বহুসংখ্যক উন্নয়ন আছে উহাদের আকার অনেকটা ব্যাঙের ছাতার ন্যায় এজন্য ইহাদিগকে ছত্রক-উন্নয়ন (fungiform papillæ) বলে। জিহ্বার গোড়ায় কয়েকটী বৃহৎ উন্নয়ন আছে তাহাদিগকে দেখিতে ছত্রক-উন্নয়নগুলিকে প্রাচীরদ্বারা ঘিরিলে যেরূপ দেখায় ঠিক সেইরূপ। ইহাদিগকে কণ্টক-প্রাকার বা প্রাচীরাবেষ্টন উন্নয়ন (circumvallate papillæ)

বলে। এই উন্নয়নগুলি (২৪ নং চিত্র দেখ) V এই আকারে এমনভাবে সাজান যে সরুদিকটা পিছনের দিকে থাকে।

ছত্রকবৎ এবং প্রাচীরাবেষ্টন এই উভয় উন্নয়নের যে কোষ-গুলির স্বাদানুভূতির সহিত বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে সেগুলি কন্দাকারে (bulbous groups) সাজান এবং দেখিতে কতকটা ফুলের কুঁড়ির ন্যায় এজন্য ইহাদিগকে স্বাদ-কোরক (taste-buds) বলে।

জিহ্বার ভিতরের পুরু স্তরটীর উপরে যে পাতলা স্তরটী আছে পাকস্থলীর ক্রিয়ার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইলেই তাহাতে একটী পুরু শাদা ক্লেদময় আবরণ পড়ে। এই সময়ে আমরা সাধারণতঃ 'জিভে ময়লা পড়িয়াছে' বা জিভ 'খড়খড়ে' হইয়াছে বলিয়া থাকি। জিহ্বার উন্নয়নগুলি প্রচুর পরিমাণে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু-সূত্রে পূর্ণ। উহাদের মূলভাগ মস্তিষ্কের দুইটী বৃহৎ স্নায়ুতে যুক্ত আছে। নবম অধ্যায়ে করোটীক স্নায়ুমণ্ডলীর পঞ্চম এবং নবম জোড়া স্নায়ুর বিষয় নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে। উহারাই স্বাদ-গ্রাহী স্নায়ু। এই স্নায়ুর পঞ্চম জোড়া কেবল জিহ্বার আগায় এবং পাশে এবং নবম জোড়া জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে এবং তালুর সন্নিকটস্থ অংশসমূহে বিস্তৃত আছে।

আমরা যাহাকে আস্বাদন-ক্রিয়া বলি প্রকৃতপক্ষে তাহার অধিকাংশ আঘ্রাণ এবং স্পর্শানুভূতির সহিত জড়িত। কারণ নাক বন্ধ করিয়া খাইলে অনেক জিনিষেরই আস্বাদন টের পাওয়া যায় না। একজনকে যদি নাক টিপিয়া ও চোখ বুজিয়া থাকিতে

বল এবং সেই অবস্থায় তাহাকে একটী পেঁয়াজ খাইতে দিয়া বল যে এটা একটা আপেল তাহা হইলে সে পেঁয়াজকে আপেল বলিয়াই মনে করিবে, উভয়ের স্বাদ-পার্থক্য কিছুই বুঝিতে পারিবে না। তোমাদের মা তোমাদিগকে কতবার নাক টিপিয়া 'ক্যাষ্টর অয়েল' খাওয়াইয়া দিয়াছেন তাহা হয়ত মনে পড়ে। বিস্বাদ কিম্বা তীব্র গন্ধবিশিষ্ট ঔষধ খাওয়াইতেও তোমাদিগকে অনেক সময় এরূপ করিতে হইয়াছে।

চিনি বা কুইনাইনের আস্বাদনের ন্যায় প্রকৃত স্বাদের সহিত গন্ধের কোন সম্পর্ক নাই। বিশেষভাবে অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রকৃত স্বাদ চারিপ্রকার যথা—মিষ্ট, তিক্ত, অম্ল এবং লবণাক্ত। এই স্বাদগুলি রসনার সর্ব্বত্র সমান ভাবে অনুভূত হয় না। যেমন জিভের আগায় মিষ্টাস্বাদন, পশ্চাদ্ভাগে তিক্তাস্বাদন এবং পার্শ্বে অম্লাস্বাদন অনুভূতি অপেক্ষাকৃত তীব্র।

(৩) ঘ্রাণেন্দ্রিয় (The Sense of Smell)

ফুলের গন্ধে মোহিত না হয় এমন কে আছে ? মিষ্টফুলের ঘ্রাণে মন আপনা হইতেই বলিয়া উঠে—'আঃ কি সুন্দর'। শুনিতে পাওয়া যায় যে কেবল চারিদিকে গন্ধ ছড়াইবার জন্যই ফরাসীর দক্ষিণাংশে এবং ইটালী দেশে গোলাপের বাগান করা হইয়া থাকে। সেখানে বেড়াইতে গেলে মনে হয় যে সার্থক নাসিকার সৃষ্টি হইয়াছে। আবার চীনদেশে নাকি রাস্তায় এমনি দুর্গন্ধ যে বিদেশীয়দিগকে নাকে তুলা দিয়া তবে পথ চলিতে হয়।

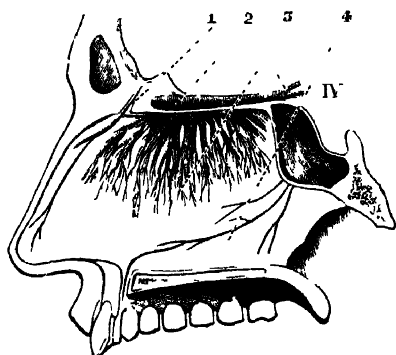
এই যে সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ ইহা কি ? দেহের কোন অংশে কোন কিছু স্পর্শ করিয়াছে, মস্তিষ্কের এই অনুভূতিই ঘ্রাণ। কোন কোন দ্রব্যের বিশেষ গুণ এই যে উহাদের সূক্ষ্মতম অণু সকল ক্রমাগত বায়ুমণ্ডলে ছড়াইয়া থাকে। এই সূক্ষ্মতম অণু সকল স্পর্শ বা রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইবার পক্ষে নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা অতি সহজে অনুভূত হইয়া থাকে এবং গন্ধ দান করিয়া থাকে।

পাকশালা হইতে যখন মাংস, পিষ্টক বা অপর কোন রান্নার সুগন্ধ বাহির হইতে থাকে তখনই হয়ত তোমাদের মুখে জল আসে। কিন্তু এই গন্ধ কি করিয়া উৎপন্ন হয় ? উত্তাপপ্রযুক্ত রন্ধনের পদার্থ হইতে অতি সূক্ষ্ম অণুসকল পৃথকভূত হইয়া বায়ু-মণ্ডলে ভাসমান হয় এবং নাসিকায় প্রবেশ করে। নর্দ্দামা হইতে যে ভীষণ দুর্গন্ধ নির্গত হয় উহাও এই প্রকারে হইয়া থাকে। কোন জঘন্য ময়লা জিনিষ নর্দ্দামায় পচিয়া তাহা দূষিত বাষ্পে পরিণত হয় এবং বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশ্রিত হইয়া নাসিকায় প্রবিষ্ট হয়।

গন্ধবিকিরণকারী দ্রব্যসমূহ হইতে যে সূক্ষ্মতম অণু সকল বায়ুমণ্ডলে বিকীর্ণ হয় তাহারা কত সূক্ষ্মতম অংশ তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে যে এই সকল দ্রব্য যদিও ক্রমাগত অতি সূক্ষ্ম অণুসকল বিকরীণ করিতেছে তথাপি উহাদের ওজনের বিশেষ কোন ন্যূনতা দৃষ্ট হয় না। মৃগনাভী ইহার একটী বিশেষ দৃষ্টান্ত। এক রতি মৃগনাভী একটী খোলাপাত্রে রাখিয়া

যথেষ্ট বায়ু-চলাচলবিশিষ্ট একটী ঘরে বহু বৎসর রাখিয়া দিলে ঘরটী যদিও গন্ধে ভরপূর থাকিবে তথাপি উহার ওজনের কোন পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে না।

বিবিধ গন্ধ বায়ুভরে বহু দূরে নীত হইয়া থাকে। যে সকল দ্বীপে সুগন্ধি মসলার বাগান আছে নাবিকেরা বলিয়া থাকে যে সেই সকল দ্বীপের বহু মাইল দূর হইতেই তাহারা সেই সুমিষ্ট ঘ্রাণ অনুভব করিতে থাকে। কোন দ্রব্যের সূক্ষ্মতম অংশ সকল যাহা বায়ুমণ্ডলে ভাসমান থাকে তাহা যতক্ষণ আমাদের ঘ্রাণানুভবকারী স্নায়ুর সংস্পর্শে না আসে ততক্ষণ আমরা কোন গন্ধই অনুভব করিতে পারি না।



৪৫ নং চিত্র—নাসিকার ঘ্রাণ-স্নায়ুর দৃশ্য।

1, 2, 3.—ঘ্রাণ-স্নায়ু ও শাখা-প্রশাখা (olfactory nerve and its brances)
4,—করোটীক পঞ্চম স্নায়ুর শাখা- প্রশাখা (branches of the fifth nerve)

ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসা-রন্ধ্রের ঊর্দ্ধদিগস্থ কোমল-ঝিল্লীময় আবরণে অব-স্থিত। এই ঝিল্লীময় আব-রণের গাত্রে করোটীক স্নায়ুমণ্ডলীর প্রথম জোড়া অর্থাৎ ঘ্রাণানুভাবক স্নায়ুর অতি সূক্ষ্মসূত্রবৎ শাখা-প্রশাখা সকল বিস্তৃত আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মস্তক ও তদস্থির বিষয় বর্ণনাকালে ঝাঁজরাস্থি (ethmoid bone) বিষয়

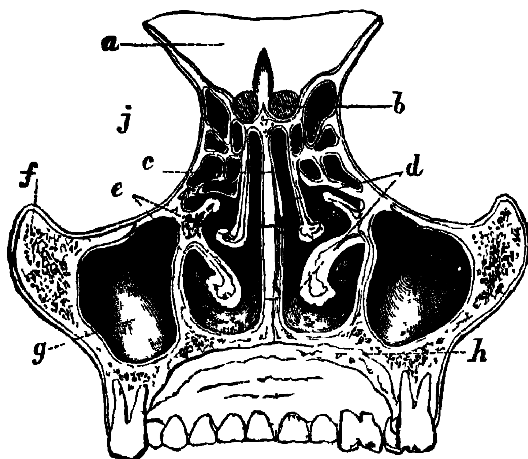
যাহা বলিয়াছি (২৪ পৃষ্ঠা) তাহা হয়ত ভুলিয়া যাও নাই। এই স্নায়ুগুলি মস্তিষ্ক হইতে করোটির তলদেশস্থ ঝাজরাস্থির অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্র-পথে নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে।

বায়ুসেবনকারী সকল প্রাণীর ন্যায় মানুষেরও দুইটী করিয়া নাসিকা গহ্বর (nasal cavities) আছে। দুইটী নাসরন্ধ্রদ্বারা মুখমণ্ডলের সম্মুখের দিকে বাহিরের বায়ুমণ্ডলীর সহিত এই গহ্বরের যোগাযোগ রক্ষিত হইতেছে এবং ভিতরের দিকে পশ্চাদ্বর্ত্তী নাসারন্ধ্র (posterior nares) নামক দুইটী ছিদ্র-পথে গল-কক্ষের (pharynx) সহিত ইহার যোগ রহিয়াছে।

নাসারন্ধ্রদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান স্বরূপ লাঙ্গলের ফালের আকৃতি বিশিষ্ট যে পাত্‌লা নাসারন্ধ্রাস্থি (vomer bone) আছে (২৭ পৃষ্ঠা) তদ্দারা নাসিকাগহ্বর দুইটী বিভক্ত আছে এবং বায়ু-পথকে দীর্ঘায়তন করিবার জন্য উভয় পার্শ্বে ঊর্দ্ধ ও মধ্যভাগে দুইটী করিয়া হাল্‌কা ফোঁপাল (spongy) অস্থি আছে তদ্বারা উহা সরু পেঁচাল লম্বা পথে পরিণত হইয়াছে। মুখমণ্ডলের ১৪ খানা অস্থির মধ্যে যে দুইটী পেঁচাল (scroll-like bone) অস্থির বিষয় বলিয়াছি তাহা হয়ত মনে আছে (২৬ পৃষ্ঠা)। এই অস্থিদ্বয়ের অভ্যন্তরস্থ পেঁচাল রাস্তার ভিতরাংশে এবং নাসারন্ধ্রদ্বয়ের ব্যবধানস্বরূপ অস্থিটীর গায়ে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এবং ঘ্রাণ-স্নায়ুর শাখা-প্রশাখাসকল বিস্তৃত আছে।

উপরোক্ত অস্থিদ্বয়ের নিম্নে আরো একটী হাল্‌কা পেঁচান অস্থি আছে উহা হম্বস্থির সহিত যুক্ত থাকিয়া বায়ু-পথটীকে ঘ্রাণ-

কক্ষ (olfactory chamber) হইতে কতক পরিমাণে পৃথক করিয়াছে (৪৬ নং চিত্র দেখ)। ইহা নাসা-পথের শূঁয়াবিশিষ্ট



৪৬ নং চিত্র—নাসিকাগহ্বরের ছেদিত অংশ, পশ্চাদ্দিক হইতে যেরূপ দেখায়।

a.—ললাটাস্থি (frontal bone), b —ঝাঁজরি-পাত (cribriform plate), c.—ঝাঁজরাস্থির খাড়া পাত (perpendicular plate of the ethmoid bone), d & e —পেঁচাল অস্থি (superior and inferior turbinal bone), f.—গণ্ডাস্থি (malar or cheek bone), g.—হন্বস্থির গহ্বর (the antrum), h.—তালু (the palate).

শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীদ্বারা আবৃত আছে এবং ইহাতে ঘ্রাণ-বায়ুর কোনও সূক্ষ্ম আঁশ নাই। নাসিকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর যে অংশে কোন ঘ্রাণ-স্নায়ু নাই তাহা শূঁয়াপূর্ণ কিন্তু উহার যে অংশে ঘ্রাণ-স্নায়ু

আছে তাহাতে কোনও শুঁয়া নাই। কিন্তু উহা ঘ্রাণ-স্নায়ুর সূক্ষ্ম আঁশে পূর্ণ থাকাতে উহাই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রধান অংশ।

ঘ্রাণানুভাবক শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর দুইপ্রকার কোষ আছে, উহারা স্বাদ-কোরকের ন্যায়। একপ্রকারের কোষ সরু লম্বা দণ্ডাকার এবং ইহাদের ভিতরের প্রান্তভাগ অণ্ডাকার। অপর প্রকারের কোষও পাতলা এবং ভিতরের প্রান্তভাগ লাঠির ন্যায়। কিন্তু অণ্ডাকার অংশের অপর পার্শ্বে বাহিরের প্রান্তভাগ চওড়া এবং স্তম্ভাকার। প্রথমোক্ত কোষই সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক এবং এই গুলির সহিতই ঘ্রাণানুভব শক্তির বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। উপরোক্ত উভয়বিধ কোষ পাশাপাশি মিশ্রিতভাবে অবস্থিত থাকিয়া ঘ্রাণানুভাবক শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী গঠিত হইয়াছে।

সাধারণ নিশ্বাস গ্রহণের সময় বায়ু ঘ্রাণকক্ষে প্রবেশ না করিয়া নিম্ন নাসাপথে কেবল গলকক্ষে প্রবেশ করে। মৃদুগন্ধ-বিশিষ্ট কোন জিনিষের ঘ্রাণ লইতে হইলে যে আমরা জোরে নিশ্বাস টানিয়া লই ইহাই তাহার কারণ। জোরে নিশ্বাস টানিয়া লওয়ায় একদমক বায়ু ঊর্দ্ধস্থিত ঘ্রাণকক্ষে প্রবিষ্ট এবং বায়ু-মণ্ডলের ভাসমান সুগন্ধি দ্রব্যের অতি লঘু সূক্ষ্ম জড়কণা সমূহের কতক সেখানে ঘ্রাণ-স্নায়ুর সংস্পর্শে আসাতে তখন ঘ্রাণানুভব হইয়া থাকে।

প্রবল সর্দ্দির সময় যে আমরা তেমন গন্ধ অনুভব করিতে পারি না তাহার কারণ এই যে সর্ব্বনিম্ন যে পেঁচাল অস্থিটী হন্বস্থির (jaw-bone) সহিত যুক্ত থাকিয়া নাসা-পথটীকে

ঘ্রাণকক্ষ হইতে কতকটা পৃথক করিয়াছে সেই অস্থির আবরণ-ঝিল্লীর স্ফীতাবস্থা-জনিত সে সময়ে ঘ্রাণানুভব-শক্তির অনেকটা হ্রাস হইয়া থাকে।

ব্যক্তি-বিশেষে এই ঘ্রাণানুভব-শক্তির বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণ অসভ্যজাতির ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। মানব অপেক্ষা বহু ইতর প্রাণীর মধ্যে এই ঘ্রাণশক্তির প্রখরতা দৃষ্ট হয়। কুকুরের ঘ্রাণশক্তির বিষয় অবশ্যই তোমরা পাঠ করিয়াছ। হরিণ, বন্য অশ্ব এবং কৃষ্ণসার প্রভৃতির ঘ্রাণশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বলিয়া অনুমিত হয়।

(৪) শ্রবণেন্দ্রিয় (The Sense of hearing)

কর্ণই শব্দানুভূতির ইন্দ্রিয়। যে কয়টী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় বলা হইয়াছে তন্মধ্যে ইহার গঠন-প্রণালী অতি জটিল এবং ইহাতে মূল এবং আনুসঙ্গিক অংশ সমূহ অত্যধিক রূপে বিকশিত হইয়াছে। করোটীর দুইধারে পার্শ্ব-কপালাস্থিতে (temporal bone) শ্রবণেন্দ্রিয় স্থাপিত। প্রত্যেকেরই দুইটী করিয়া কান একথা তোমরা জান। কানের বাহিরের আকৃতি কিরূপ তাহাও তোমাদের জানা আছে।

প্রত্যেকটী কানকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় যথা—

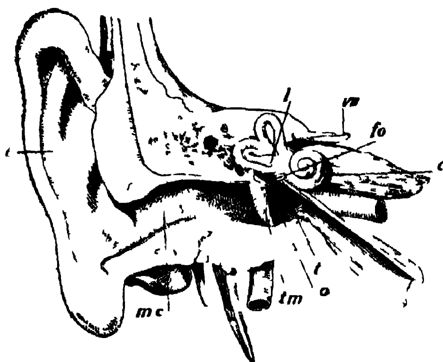
(ক) বহিঃস্থ কর্ণ (the outer ear),

(খ) মধ্যবর্ত্তি কর্ণগহ্বর (the middle ear), এবং

(গ) আভ্যন্তর কর্ণকুহর (the inner ear)।

৪৭ নং চিত্র দেখিলে তিনটীই একসঙ্গে বুঝিতে পারিবে।

(ক) বহিঃস্থ-কর্ণ—তোমরা যাহা চক্ষে দেখিতে পাও তাহাই নহে কিন্তু উহার ভিতরের যে ছিদ্র-পথটী মাথার ভিতরে ঢুকিয়াছে



৪৭ নং চিত্র—করোটীর পার্শ্বদেশ হইতে আড়াআড়িভাবে ছেদিত দক্ষিণ কর্ণের সম্মুখ ভাগ।

c—বহিঃস্থ কর্ণ (concha or external ear), mc—বহিঃস্থ শ্রুতি বিবর (external auditory canal), b—কর্ণকুহর (labyrinth), viii—শ্রুতি স্নায়ু (auditory nerve), c—কর্ণশঙ্কুলী (cochlea), fo—বাদামী গবাক্ষ (fenestra ovalis), eu—কর্ণরন্ধ্র (eustachian tube), t—পটহ (tympanum), o—মুদ্গরাস্থি নেহাই অস্থি ও রেকাবাস্থি (auditory ossicles or the malleus, incus and stapes), tm—পটহ ঝিল্লী (tympanic membrane)

বলিয়া মনে হয় অর্থাৎ তোমরা ডুব দিয়া স্নান করিবার সময় যে ছেঁদাটীতে মাঝে মাঝে জল ঢুকিয়া থাকে তাহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। কতকটা শামুকের খোলার আকৃতিবিশিষ্ট উপাস্থিময় চওড়া একটী পাত, যাহাকে সাধারণতঃ 'হাঁড়িকান' বলা হয় তাহা এবং উহা হইতে শ্রুতি-বিবর (auditory canal) নামক

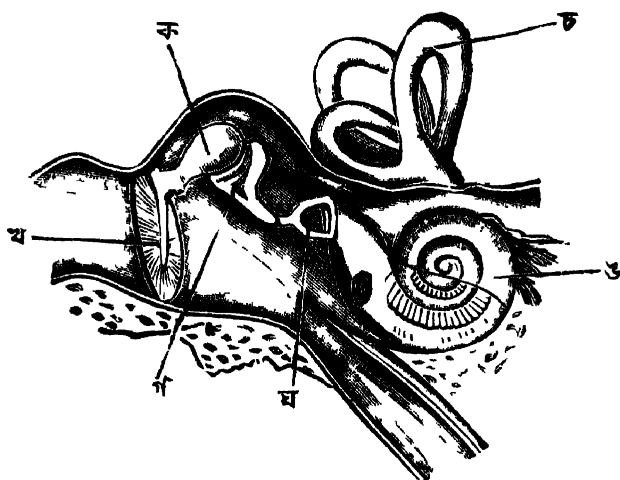
প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা যে একটী নল মস্তকে প্রবিষ্ট হইয়াছে এই উভয়ে মিলিয়া বহিঃস্থ-কর্ণ গঠিত হইয়াছে।

শ্রুতি-বিবর এবং এই শম্বুকাকৃতি উপাস্থিময় পাতটির উপরিভাগে একটি অতি পাত্‌লা চামড়া প্রসারিত আছে। বহিঃস্থ-কর্ণের আশ্চর্য্য গঠন-প্রণালীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এখনও সম্যক্ জানা যায় নাই। তবে অনুমানে বুঝিতে পারা যায় যে কানের উচু নীচু খাঁজগুলি ধ্বনিতরঙ্গের গতিকে শ্রুতি-বিবর-পথে চালাইবার পক্ষে সাহায্য করে।

কুকুর, ঘোড়া, গাধাপ্রভৃতি পশুকে তোমারা কানখাড়া করিতে এবং শব্দের গতি লক্ষ্য রাখিয়া এদিক ওদিক ঘুরাইতে ফিরাইতে নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। এরূপ করিবার কারণ এই যে, যেদিক হইতে শব্দ আসিতেছে ধ্বনিতরঙ্গকে সেদিক হইতে শ্রুতি-বিবরে আনিবার জন্য এরূপ কর্ণ-সঞ্চালন করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা এরূপ করিতে পারি না। আবার ভীরু-স্বভাব-সুলভ জন্তুদিগের মধ্যে যাহাতে তাহারা অতি ক্ষীণ ধ্বনিও সহজে অনুভব করিতে পারে এজন্য এই বাহিরের কানের অধিক পরিমাণে উৎকর্ষ সাধিত হইতে দেখা যায়। এই চপল-চটুল প্রাণীদিগের মধ্যে খরগোস্, হরিণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রুতি-বিবরের প্রথমাংশ উপাস্থিময়। কিন্তু উহার ভিতরাংশে অস্থিময় প্রাচীর আছে। প্রকৃতপক্ষে এই নল-পথটির অভ্যন্তর ভাগ পার্শ্ব-কপালাস্থিতে গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই ছিদ্র-পথটি বহিঃস্থ-কান হইতে সম্মুখের দিকে কিঞ্চিৎ বাঁকিয়া গিয়াছে এবং

ইহার গাত্র সূক্ষ্ম রোমাবৃত। কানের ভিতরে কিছু প্রবিষ্ট হইবার পক্ষে এই রোমগুলি বাধা উৎপাদন করে। কানের 'খইল' কাহাকে বলে তাহা অবশ্যই তোমরা জান। কর্ণের ছিদ্র-পথে যে সকল গ্রন্থি আছে তাহা হইতে এই খইল বা কর্ণ-মল (cerumen or the ear wax) নির্গত হইয়া থাকে।



৪৮ নং চিত্র—আভ্যন্তর-কর্ণকুহর, বর্দ্ধিতাকারে অঙ্কিত
(internal ear greatly enlarged)

ক—মুদ্গরাস্থি (malleus or the hammer), খ—পটহ-ঝিল্লী (tympanic membrane or the drum of the ear), গ—নেহাই-অস্থি (incus or the anvil), ঘ—রেকাবাস্থি (stapes or the stirrup), ঙ—কর্ণশঙ্কুলী (cochlea or the shell tube), চ—অর্দ্ধ-চক্রাকার-প্রণালী (semicircular canals or the ribbon loops).

কর্ণরন্ধ্রের ভিতরাংশের প্রান্তভাগ একটি ঝিল্লীদ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আবৃত আছে। এই ঝিল্লীটি ঢাকের চামড়ার ন্যায় টান

করিয়া পাতা। ইহাকে পটহ্-ঝিল্লী (tympanic membrane) বলে। ইহা অতিশয় পাত্‌লা এবং স্থিতিস্থাপক কিন্তু অতি সামান্য আঘাতেই সহজে ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। এই পটহ একবার ছিন্ন হইলে আর তাহা জোড়া লাগিবার উপায় নাই এবং উহার পরিণাম বধিরতা।

(খ) মধ্যবর্ত্তী-কর্ণ পটহ-ঝিল্লী এবং আভ্যন্তর-কর্ণের মধ্যস্থলস্থিত একটি ক্ষুদ্র গহ্বরবিশেষ। এই গহ্বরকেই কর্ণ-পটহ্ (drum of the ear) বলা হয়। কর্ণ-পটহ এবং শ্রুতি-বিবর এই উভয়ে মিলিয়া মধ্যবর্ত্তী কর্ণ-গহ্বরটি (middle ear) গঠিত হইয়াছে এবং পটহ-ঝিল্লীদ্বারা শ্রুতি-বিবর হইতে ক্ষুদ্র পটহ-গহ্বরটি বিভক্ত না হইলে উহারা উভয়ে মিলিয়া একটি গহ্বরে পরিণত হইত। পটহ-ঝিল্লির বিপরীত দিকে এই গহ্বরের অস্থিময় প্রাচীরে দুইটি অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষ আছে, উহাদের একটি ডিম্বাকৃতি বা বাদামী (fenestra ovalis) এবং অপরটি চক্রাকার বা গোল (fenestra rotunda)। এই গবাক্ষ দুইটি অতি পাত্‌লা ঝিল্লীদ্বারা আবৃত আছে।

পটহ-গহ্বরে বিচিত্র অবয়বের তিনটি ক্ষুদ্র অস্থি আছে। ইহাদের প্রথমটির আকার হাতুড়ীর ন্যায়। উহাকে মুদ্গরাস্থি (malleus) বলে। ইহার লম্বা বাঁটদ্বারা ইহা পটহ-ঝিল্লীর মধ্যভাগে সংলগ্ন আছে। এই মুদ্গরাস্থির গোলাকার মুণ্ডভাগ কামারের নেহাইএর অবয়ববিশিষ্ট অপর একটি ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ডে কাপে কাপে লাগান আছে। এই দ্বিতীয় অস্থিখণ্ডকে নেহাই-

অস্থি (incus) বলে। এই নেহাই-অস্থির আগায় ঘোড়ার জিনের রেকাবীর আকৃতিবিশিষ্ট অপর আর একটি অস্থি আছে তাহাকে রেকাবাস্থি (stapes) বলে (৪৮ নং চিত্র দেখ)। এই বিচিত্রাকার তৃতীয় অস্থিটির অবয়ব রেকাবের ন্যায় বাদামী এবং ইহা পটহ-গহ্বরের বিপরীত দিকস্থ বাদামী আকারের গবাক্ষ-পথটিতে ঠিক কাপে কাপে লাগিয়া আছে এবং একটি ক্ষুদ্র পেশীদ্বারা পটহ-ঝিল্লিতে আবদ্ধ আছে।

পটহ-গহ্বরের তলভাগে একটি ছিদ্র-পথ আছে তাহাকে কর্ণরন্ধ্র (eustachian tube) বলে। প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা এই নালীটী গলকক্ষে গিয়া শেষ হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে গল-কক্ষ বর্ণন কালে যে পাঁচটি ছিদ্রপথের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি (৭৯ পৃষ্ঠা) তাহা হয়ত ভুলিয়া যাও নাই। এই রন্ধ্র-পথে কর্ণপটহের ভিতর বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

(গ) আভ্যন্তর-কর্ণ বা কর্ণকুহর (osseous labyrinth) দেহের যন্ত্রাবলীর মধ্যে অতি কোমল এবং ইহার গঠন-প্রণালী অতি কঠিন। শ্রবণেন্দ্রিয়ের এই অংশই ধ্বনি-তরঙ্গ গ্রহণ করিয়া মস্তিষ্কে লইয়া যায়। ইহার অস্থিময় তিনটি অংশ। ইহার নীচের অংশ শামুকের খোলার ন্যায় (৪৮ নং চিত্রের ঙ চিহ্নিত অংশ), উপরের অংশ তিনটি ফাঁস দেওয়া একটি ফিতার গাঁইটের ন্যায় (৪৮ নং চিত্রের চ চিহ্নিত অংশ) এবং মধ্যভাগ ডিম্বাকৃতি একটি কক্ষদ্বারের ন্যায়।

বাদামী আকারের যে গবাক্ষপথে রেকাবাস্থি স্থাপিত আছে

কক্ষদ্বার (vestibule) তাহার ভিতরের অস্থিময় অংশ। ইহার দুইদিকে কর্ণকুহরের অস্থিময় অপরাংশগুলি অবস্থিত। এই কক্ষদ্বার বা 'দরদালানে'র একদিকে তিনটি অস্থিময় অর্দ্ধ-চক্রাকার প্রণালী অপরদিকে শম্বূকাকার নালী।

অর্দ্ধচক্রাকার-প্রণালী (semicircular canals) ফাঁস দেওয়া ফিতার গাঁইটের মত তিনটি অস্থিবিশেষ। ইহারা কক্ষদ্বার হইতে উঠিয়া অর্দ্ধচক্রাকার রূপে বাঁকিয়া আবার কক্ষ-দ্বারেই ফিরিয়া আসিয়াছে। এই ফাঁসের দুইটি খাড়াভাবে এবং তৃতীয়টি কাৎভাবে আছে। এই অস্থিময় প্রণালীর প্রত্যেকটি চক্রের গোড়া বা দুইদিকের মাথার জোড়ের একদিক স্থূল। জোড়ের এই স্ফীত অংশকে স্থালী (ampulla) বলে।

কর্ণশঙ্কুলী (cochlea) কর্ণকুহরের অস্থিময় নিম্নাংশ। ইহার আকার প্রায় অবিকল শামুকের খোলার ভিতরের অংশের ন্যায়। ৪৮ নং চিত্র দেখিলেই অনেকটা বুঝিতে পারিবে। কিন্তু ইহার সূক্ষ্ম ও জটিল গঠন-প্রণালীর বিষয় তোমরা এখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে না। এই পেঁচান যন্ত্রটী অতি সূক্ষ্ম পাতলা অস্থিদ্বারা গঠিত হইয়াছে। ইহার লম্বা পেঁচান নলটীর আগাগোড়া একটী অতি পাতলা লম্বা পর্দ্দাদ্বারা দুইভাগে বিভক্ত হইরা দুইটী স্বতন্ত্র পথে পরিণত হইয়াছে। পেঁচান নলটীর শীর্ষভাগে এই পথ দুইটীর পরস্পরের যোগ আছে কিন্তু অন্যত্র কোথাও নাই। উহার অধোভাগে এই পথের একটী মুখ কক্ষদ্বারে গিয়া খুলিয়াছে এবং অপরটী মধ্যবর্ত্তী কর্ণগহ্বরে চলিয়া

গিয়াছে এবং পূর্ব্ব বর্ণিত চক্রাকার বা গোল গবাক্ষদ্বারা উহা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

এক্ষণে দেখিতে পাইতেছ যে দুইটী ক্ষুদ্র গবাক্ষদ্বারা মধ্যবর্ত্তী কর্ণগহ্বরের সহিত আভ্যন্তর-কর্ণের বিবিধ কক্ষ এবং পথ সকলের যোগ আছে। ডিম্বাকার বা বাদামী গবাক্ষটী মধ্যবর্ত্তী কর্ণভাগকে কক্ষদ্বার হইতে পৃথক করিয়াছে এবং রেকাবাস্থির ফলকদ্বারা রুদ্ধ আছে। চক্রাকার বা গোল গবাক্ষটী কর্ণ-শঙ্কুলীর একটী পথকে মধ্যবর্ত্তী কর্ণভাগ হইতে পৃথক করিয়াছে। এই উভয় গবাক্ষই ঝিল্লীদ্বারা আবৃত আছে।

একথা স্মরণ রাখা উচিত যে আভ্যন্তরকর্ণের পথ সকলের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন যোগ বর্ত্তমান আছে। এইরূপে দেখা যায় যে কক্ষদ্বারের ভিতর দিয়া অর্দ্ধ চক্রাকার তিনটী অস্থিময় নালীর সহিত কর্ণশঙ্কুলী বা শম্বূকাকার পেঁচান নালীর পরস্পর যোগ রহিয়াছে। এই সমগ্র নালী-পথটীকে আভ্যন্তর-কর্ণকুহর (labyrinth) বলে।

আভ্যন্তর-কর্ণকুহরের নালী এবং কক্ষগুলি ঠিক তাহাদের সম আকৃতিবিশিষ্ট একটী কোমল ঝিল্লীময় থলিকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। এই থলিটী যে সকল অস্থিময় নালীর ভিতরে অবস্থিত আছে আকারে প্রায় তাহাদের অর্দ্ধেক হইবে। ইহার নাম গোলকধাঁধা-ঝিল্লী (membranous labyrinth)। এই নালী-সমূহের অস্থিময় প্রাচীর এবং উহাদের আভ্যন্তরস্থ ঝিল্লীময় থলি বা গোলকধাঁধা-ঝিল্লী এই উভয়ের মাঝখানে যে ফাঁক আছে

তাহা স্বচ্ছরস (perilymph) নামক এক প্রকার নির্ম্মল পাতলা তরল পদার্থে পূর্ণ আছে। এই ঝিল্লীময় থলিও এই প্রকার একরূপ তরল পদার্থে পূর্ণ আছে, তাহাকে গর্ভরস (endolymph) বলে। এই গর্ভরসে বালুকণার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র অণু সকল ভাসমান আছে।

শ্রুতি-স্নায়ু (auditory nerves) করোটির একটী ছিদ্র-পথে মস্তিষ্ক হইতে আভ্যন্তর-কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ক্ষুদ্র সূত্রীয় গুচ্ছ অবশেষে গোলকধাঁধাঁ-ঝিল্লীর আভ্যন্তর প্রাচীরে দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়া বিস্তৃত হইয়াছে। একটী শাখা কক্ষদ্বার এবং অর্দ্ধচক্রাকার প্রণালী-সমূহের প্রান্তদেশে এবং অপর শাখা শম্বুকাকার নালীতে চলিয়া গিয়াছে।

কর্ণশঙ্কুলীর ঝিল্লীতে অতি সূক্ষ্ম অসংখ্য সূত্রগুচ্ছ পাশাপাশি স্থাপিত আছে, উহাদিগকে ছিলকা-সূত্র (fibres of corti) বলে এবং ইহাদের ক্রিয়া অনেকটা হারমনিয়মের পর্দ্দার ন্যায়। ইহারা উপর ও নীচে দুই সারিতে হারমনিয়মের পর্দ্দার ন্যায় সাজান আছে। অনুবীক্ষণদ্বারা দেখিলে উহাদের এক সারিতে এইরূপ প্রায় চারি পাঁচ হাজার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সূক্ষ্ম কেশবৎ শুঁয়াবিশিষ্ট কোষসমূহকে ধারণ করিয়া আছে। ইহা অনুমান করা হয় যে বায়ুতে যে শব্দতরঙ্গ উদ্ভূত হইয়া শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হয় এই সকল শুঁয়া (cilia) সেই শব্দ-তরঙ্গের আঘাতে স্পন্দিত হইয়া স্নায়ু-সূত্র-সমূহে প্রতিহত হয় এবং সেই বেগ মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয়।

শব্দানুভূতির যন্ত্র-কৌশল—সকল প্রকার শব্দ বা ধ্বনিকে দুইভাগে বিভাগ করা যায় যথা—সঙ্গীত এবং সাধারণ রব। এই উভয়বিধ ধ্বনিই বায়ুতে কোন বস্তু-বিশেষের স্পন্দন-জনিত উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত বস্তুই এই স্পন্দন সকলকে চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডলে সঞ্চারিত করে এবং বায়ুতরঙ্গের একটা প্রবাহ তুলিয়া ক্রমশঃ চারিদিক পরিব্যাপ্ত করে।

জলে কখনও ঢিল ছুঁড়ে নাই তোমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কেহ নাই। পুকুরে ঢিল ছুঁড়িবার সময় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে ঢিলটী জলে পড়িবামাত্র তথায় একটী তবঙ্গ উঠিয়া গোলাকার রেখার ন্যায় হইয়া ক্রমশঃ বড় হইতে হইতে তীরের কাছে আসিয়া ক্রমে মিলাইয়া যায়। বায়ুতে কোন বস্তুবিশেষের স্পন্দনেও ঠিক এই তরঙ্গলহরীর ন্যায় ধ্বনি-তরঙ্গ উদ্ভূত হইয়া থাকে। এই সকল বায়ু-তরঙ্গ অতি অদ্ভুত ক্ষিপ্রবেগে প্রধাবিত হইয়া থাকে। শব্দের সাধারণ গতির দ্রুততা সেকেণ্ডে প্রায় ৩৭৩ গজ। শীতল বায়ু অপেক্ষা উষ্ণ বায়ুতে শব্দের গতি দ্রুত হইয়া থাকে এবং যেদিকে বায়ু প্রবাহিত হয় শব্দের গতির বেগ সেই দিকে অপোক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে।

বায়ু ব্যতীত শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে না। যেস্থানে বায়ু-মণ্ডল বিরল এবং লঘু সে স্থানে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাও মৃদু এবং ক্ষীণ। কোন স্থান হইতে বায়ু একবারে নিষ্কাষিত করিয়া ফেলিলে তথায় কোনও শব্দই শ্রুতিগোচর হইবে না।

শব্দ-তরঙ্গ বায়ুযোগে কি প্রকারে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া

পটহ-ঝিল্লীতে আঘাত করে এক্ষণে হয়ত তাহা বুঝিলে। এই তরঙ্গাঘাতে যখন পটহ-ঝিল্লী স্পন্দিত হইতে থাকে তখন এই স্পন্দনবেগ মধ্যবর্ত্তী কর্ণগহ্বরের মুদ্গরাস্থি, নেহাই-অস্থি এবং রেকাবাস্থিতে সঞ্চারিত হয়। তোমাদের অবশ্য মনে আছে যে রেকাবাস্থির তলার দিক ক্ষুদ্র বাদামী আকারের গবাক্ষে কাপে কাপে লাগিয়া আছে এবং এই গবাক্ষের ঠিক পশ্চাদ্ভাগে আভ্যন্তর কর্ণকুহরের কক্ষদ্বার। একথাও অবশ্য মনে আছে যে এই কক্ষটী এবং ইহা হইতে যে নালী পথটী বাহির হইয়াছে তাহা 'স্বচ্ছরস' নামক তরল পদার্থে পূর্ণ।

ধ্বনিতরঙ্গ আঘাতে প্রত্যেকবার যেমন রেকাবাস্থিটী ভিতরের দিকে ধাক্কা খাইয়া ডিম্বাকার গবাক্ষ হইতে সরিয়া যায় অমনি এই 'স্বচ্ছরস' ধ্বনির তীব্রতানুসারে অল্পাধিক প্রচণ্ড গতিতে তরঙ্গায়িত হইতে থাকে এবং ক্রমে উহা ঝিল্লীময় থলিস্থ গর্ভরসে সঞ্চারিত হয়।

এই আশ্চর্য্য এবং জটিল যন্ত্র-কৌশলের অবশিষ্ট ক্রিয়া এই গর্ভরস এবং উহাতে যে ক্ষুদ্র কণাসকল ভাসমান আছে তদ্দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের যন্ত্র-কৌশল-প্রণালী মোটামুটি উল্লেখ করা হইল। ইহার সম্যক ক্রিয়া অদ্যাপি বিশেষরূপে জানা যায় নাই। একটী শব্দানুভূতি ক্রম সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

বহিঃস্থ কর্ণে বা হাড়িকান ও মাসকানের ভিতর দিয়া—

শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া—

সূক্ষ্ম শুঁয়াসকল অতিক্রম করিয়া—

কাণের থইলের মধ্য দিয়া—

কর্ণপটহে প্রবিষ্ট হওয়ায়—

মুদ্গাবাস্থি কম্পমান—

রেকাবাস্থি কম্পমান—

নেহাই অস্থি কম্পমান—

এই প্রকম্পনজনিত হাবমনিয়মেব পর্দ্দাসদৃশ ছিল্কা-সূত্রগুলিব সঞ্চালন—

এই সকলেব প্রকম্পনজনিত কক্ষদ্বার তবঙ্গায়িত—

উক্ত তরঙ্গাঘাত শম্বুকাকাব বা অদ্ধচক্রাকাব নালীকে প্রবিষ্ট হইয়া স্বচ্ছরস প্রকম্পিত—

উক্ত প্রকম্পনজনিত গোলকধাঁধা ঝিল্লী তবঙ্গায়িত—

এবং ইহার অভ্যন্তরস্থ গর্ভরসও প্রকম্পিত—

তৎসঙ্গে উহাদের অগ্রভাগস্থ সূক্ষ্ম কেশবৎ শুঁযা বিশিষ্ট কোষসমূহের সঞ্চালন—

ইহাদেব শ্রুতি-স্নায়ুব অগ্রভাগেব স্পর্শ—

এবং তদ্দ্বারা মস্তিষ্কে শব্দানুভূতির পরিচালনা।

(৫) দর্শনেন্দ্রিয় (The Organ of Sight)

দর্শনানুভূতির দ্বাবা আলোকের সাহায্যেই চারিদিকে পরিদৃশ্যমান পদার্থ সমূহের রং, অবয়ব, আয়তন এবং অবস্থান আমাদের বোধগম্য হইয়া থাকে। চক্ষুই দর্শনানুভূতির ইন্দ্রিয়। অঙ্গুলি যাহা স্পর্শদ্বাবা অনুভব করিতে পারে না, রসনা যাহার স্বাদ পায় না, নাসিকা যাহার ঘ্রাণ পায় না এবং কর্ণ যাহার ধ্বনি শ্রবণ করিতে পারে না চক্ষুদ্বারা তাহাই অনুভব করিতে পারি।

স্বভাবের যে বিচিত্র শোভা দেখিয়া নয়ন মন পুলক ভরে আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে অন্ধ সে আনন্দ উপভোগে একেবারে বঞ্চিত।

দর্শনের ইন্দ্রিয়টী অতিশয় কোমল ও অতি সহজেই নষ্ট হইতে পারে। ইহা একবার নষ্ট হইলে ইহার পুনঃসংস্কার অতি কঠিন। ইহার গঠন-প্রণালী এত সূক্ষ্ম ও জটিল যে এখন তোমরা সকল বিষয় বুঝিতে পারিবে না। ইহার বিষয় মোটা-মুটিভাবে যথা-সম্ভব বলা যাইতেছে।

প্রথমতঃ ভ্রূযুগল (eye brows), নেত্রপক্ষ (eye lashes) বা চক্ষুর পাতার লোম এবং নেত্রপুট (eye lids) বা চক্ষের পাতা প্রভৃতি যদ্দ্বারা চক্ষু সুরক্ষিত হইতেছে তাহাদের বিষয় বলা যাইতেছে। প্রত্যেক চক্ষুর উপরে ঠিক কপালের নীচেই একসারি লোম আছে তাহাকে ভ্রূ বলে তাহা জান। ইহাদের বিশেষ ক্রিয়া কি এই প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যায় যে ইহাদের উদ্দেশ্য দুই প্রকার। প্রথমতঃ মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্যসাধন। দ্বিতীয়তঃ ইহারা কপাল হইতে ঘাম বহিয়া যাহাতে চক্ষে পড়িতে না পারে তৎপক্ষে বাধা উৎপাদনে সাহায্য করে। কাহারও কাহারও অত্যন্ত অধিক ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইতে থাকে। এই প্রচুর ঘর্ম্ম চক্ষে প্রবিষ্ট হইলে তাহা অনিষ্টকর বা বিরক্তিজনক হইতে পারে এজন্য এই ঘাম আটকাইবার অভিপ্রায়েই যেন ইহা সৃষ্ট হইয়াছে।

চক্ষের পাতার দুইধারে একসারি করিয়া লোম আছে তাহাই নেত্রচ্ছদ বা নেত্রপক্ষ। ইহাদেরও ভ্রূযুগলের ন্যায় দুই প্রকার

অভিপ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। এক উদ্দেশ্য চক্ষুর সৌন্দর্য্য-সম্পাদন এবং অপর উদ্দেশ্য ধূলিকণা, ক্ষুদ্র পোকা এবং শুষ্ক পাতার কণা ইত্যাদি বায়ুভরে চক্ষে প্রবিষ্ট হইবার উপক্রম করিলে পূর্ব্ব হইতে সাবধান করিয়া দেওয়া। পোকা বা অপর কিছু চোখের ভিতর ঢুকিবার সম্ভাবনা হইলে অতর্কিতভাবে আপনা হইতেই চক্ষের পাতা কেমন বুজিয়া যায় তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে।

ভ্রূযুগল এবং চক্ষুর পাতার লোম প্রয়োজনীয় হইলেও চক্ষের পাতাই প্রকৃতপক্ষে চক্ষের আবরণ বা রক্ষক স্বরূপ। একটী চক্ষে দুইটী করিয়া পাতা—একটী উপরের পাতা, একটী নীচের পাতা। এই পাতা চক্ষের চারিদিকে অঙ্গুরীর আকারে বেষ্টিত একটী দৃঢ় পাতলা পেশীর স্বেচ্ছা-প্রসূত ক্রিয়ার ফলে আপনা হইতেই বুজিয়া যায়। এই চক্ষের পাতাগুলির ভিতরাংশ আর্দ্রত্বক (wet skin) বা অতি কোমল শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীরদ্বারা আচ্ছাদিত। এই ঝিল্লীকে সংযোজিকা (conjunctiva) বলে। ইহা যেমন চক্ষের পাতার সঞ্জাবের ন্যায় হইয়া আছে তেমনি আবার অক্ষিগোলকের সম্মুখভাগ ঢাকিয়া আছে।

চক্ষু এক ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটী প্রায় গোলাকার ফাঁপা গোলাবিশেষ। ইহা দেহের অতি কোমল এবং সহজে নষ্ট-প্রবণ অংশ, এজন্য এই গোলাটী অক্ষি-কোটর (orbit of the eye) নামক গহ্বরে অবস্থিত আছে। ললাটাস্থি এবং নাসাস্থি-দ্বারা চক্ষের কোটর (socket) গঠিত হইয়াছে এবং ইহার

মধ্যভাগে একটী ছিদ্র বর্ত্তমান আছে। এই ছিদ্রের অপর পার্শ্বে মস্তিষ্ক অবস্থিত এবং ইহার ভিতর দিয়া দর্শন-স্নায়ু অক্ষিগোলকে চলিয়া গিয়াছে। বোঁটায় যেমন ফল ঝুলিয়া থাকে, দর্শন-স্নায়ু তেমনি অক্ষিগোলক বা নেত্রপিণ্ডটী ধারণ করিয়া আছে। চক্ষু-কোটরের প্রাচীরে তিনটী আবরণ বা স্তর (coats or layers) আছে। যথা—

(ক) বাহ্য-ঝিল্লী বা দৃঢ়াবরণ (the sclerotic coat),

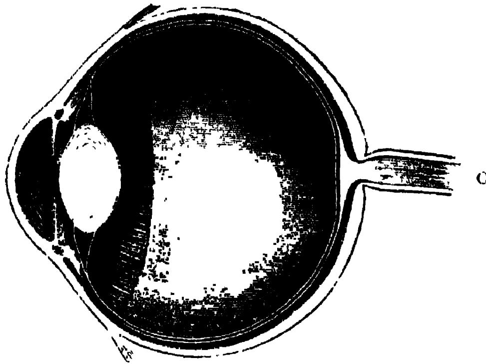
(খ) মধ্য-ঝিল্লী বা বর্ণাবরণ (the choroid coat), এবং

(গ) পশ্চাৎ-ঝিল্লী বা জালিময়-পর্দ্দা (the retina).

(ক) নেত্রপিণ্ডের বাহ্যঝিল্লীর একদিক দৃঢ়াবরণ (sclerotic coat) এবং অপরদিকে স্বচ্ছাবরণ (cornea)। অক্ষি-গোলকের বাহিরের আবরণস্বরূপ যে পুরু শাদা, অস্বচ্ছ ঝিল্লীটী আছে উহাই দৃঢ়াবরণ। ইহাকেই সাধারণতঃ চক্ষের শুভ্রবর্ণ অংশ বলা হয়। ইহা দেহের সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত এবং দৃঢ় ঝিল্লী-বিশেষ। ভিতরের কোমল অংশসমূহকে সুরক্ষিত অবস্থায় রাখাই ইহার কাজ।

চক্ষুর সম্মুখভাগে টেঁকঘড়ীর কাচের আবরণের ন্যায় বাহ্য-ঝিল্লীর যে স্বচ্ছ কাচকড়ার ন্যায় গোলাকার একটী স্তর আছে তাহাকে স্বচ্ছাবরণ (cornea) বলে। এই ঝিল্লীময় স্তরটী এমনি শক্ত যে খুব জোরে চোখ রগড়াইলেও উহা ছিঁড়িয়া যায় না। বাহ্যঝিল্লীর স্বচ্ছাবরণ স্তরটী দৃঢ়াবরণ অপেক্ষা অধিক ন্যুব্জাকার (convex)।

(খ) অক্ষিগোলক বা নেত্রপিণ্ডের মধ্যঝিল্লী বা বর্ণাবরণ (choroid coat) নামক দ্বিতীয় আবরণটী ঠিক দৃঢ়াবরণের নিম্নেই অবস্থিত। ইহা অতিশয় সূক্ষ্ম এবং স্নায়ু ও রক্তবহা-



৪৭ নং চিত্র—অক্ষিগোলকের দৃশ্য (view of eye-ball)

o.—দর্শন-স্নায়ু (optic nerve), বাহিরের শাদা ঘেরটী—বাহ্য-ঝিল্লী বা দৃঢ়াবরণ (sclerotic), ঠিক তাহার পরের কাল ঘেরটী—মধ্য-ঝিল্লী বা বর্ণাবরণ (choroid), তাহার পরবর্ত্তী ঘেরটী—পশ্চাৎ-ঝিল্লী বা জালিময় পর্দ্দা (retina), তৎপর ঈষৎ কাল সমগ্র মধ্যভাগ—মসৃণ-রস (vitreous humour), তৎপর কাল ফুট্‌কিওয়ালা শাদা ডিম্বাকার অংশ—স্বচ্ছ কাচ-পুটক (crystalline lens), তৎপরবর্ত্তী লম্বা গোলাকার অংশ—নেত্র-পটল (iris), মুক্তাকার অংশের উপরিভাগ—স্বচ্ছাবরণ (cornea) এবং নিম্নভাগ—জলীয়-রসপূর্ণ (aqueous humour) অগ্র-কক্ষ (anterior chamber)।

নালীসমূহে পরিবেষ্টিত এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত আলোক-রশ্মিকে মন্দীভূত করিবার অভিপ্রায়ে কালশিরায় বা কৃষ্ণবর্ণ বর্ণকণিকাতে (black pigments) পূর্ণ।

তোমরা সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া ঠিক তাহার পরেই কোন কিছুর দিকে তাকাইলে কি দেখিতে পাও ? নিশ্চয়ই সে জিনিষটা ভাল করিয়া দেখিতে পাও না, কেবল ঝাপ্‌সা দেখ। চক্ষে অতিরিক্ত পরিমাণে আলোক-রশ্মি পতিত হওয়াতেই দৃষ্টি এরূপ জোব্‌ড়ান এবং অস্পষ্ট বোধ হয়। কাল রংএর এই আলোক-রশ্মিকে প্রসর্পিত করিবার অর্থাৎ শুষিয়া লইবার শক্তি আছে এজন্য সাধারণ দৃষ্টিপাতে আলোক-রশ্মি অধিক তীব্র হইলে অক্ষি-গোলকে প্রবিষ্ট কতক আলোক এই মধ্যঝিল্লীস্থিত কৃষ্ণবর্ণে শোষিত হয় এবং তখন আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই।

মধ্যঝিল্লী বা নেত্রপিণ্ডের দ্বিতীয় আবরণের যতটুকু অক্ষি-গোলকের পশ্চাদ্ভাগে আছে তাহাকে বর্ণাবরণ (choroid coat) বলে। কিন্তু বাহ্যঝিল্লীর দৃঢ়াবরণের ন্যায় চক্ষের সম্মুখ-ভাগে উহা রূপান্তরিত হইয়া নেত্রপটল (iris) অর্থাৎ চক্ষুর তারকা-বেষ্টন কৃষ্ণবর্ণ পর্দ্দায় পরিণত হইয়াছে।

নেত্রপটল (iris) বা চক্ষুর রঙ্গিনাংশ অর্থাৎ চোখের তারার চারিদিক যে কাল, নীল বা কটা রঙ্গের গোলাকার অংশ তাহা যেন ঠিক মাঝখানে ছেঁদাওয়ালা একটী গোলাকার পর্দ্দা। ঠিক যেখানে দৃঢ়াবরণ শেষ হইয়া স্বচ্ছাবরণ আরম্ভ হইয়াছে দৃঢ়াবরণের সেই সীমা ঘিরিয়া এই তারকা-বেষ্টন পরদার বেষ্টন পরিধিতে অর্থাৎ গোলাকার পরিধির চারিদিক বা বাহিরের প্রান্তভাগে সংলগ্ন আছে। স্বচ্ছাবরণ এবং নেত্রপটলের মধ্যস্থিত স্থানকে চক্ষের অগ্র-কক্ষ (anterior chamber) বলে।

নেত্রপটলের ঠিক মধ্যভাগে যে ছিদ্রটী আছে তাহাকে কণীনিকা (pupil) বা চক্ষুর 'তারা' বলে।

নেত্রপটল যে পেশী-সূত্রসমূহে গঠিত, উহাদের কতকগুলি কণীনিকা হইতে তারকা-বেষ্টন গোলাকার পর্দ্দাটীর বাহিরের ধার পর্য্যন্ত সরলরেখাকারে এবং অপরগুলি চক্ষু তারকাকে কেন্দ্র করিয়া উহার চারিদিকে বৃত্তাকারে অবস্থিত আছে। সরল-রেখাকার সূত্রগুলি যদি সঙ্কুচিত হয় তাহা হইলেই তারকা-বেষ্টন পর্দ্দাটী সরিয়া বাহিরের ধার পর্য্যন্ত যায়, কাজেই তাহাতে কণীনিকা প্রসারিত হয় অর্থাৎ চোখের তারা বড় হয়। আবার যখন কণীনিকার চতুর্দ্দিকস্থ বৃত্তাকার পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয় তখন উক্ত পর্দ্দাটী সরিয়া কেন্দ্রের দিকে আসে, কাজেই তখন চোখের তারাটী ক্ষুদ্রাকার হইয়া যায়।

তীব্র আলোকে নেত্রপটলের বৃত্তাকার পেশীগুলির (circular muscles) সঙ্কোচন-ক্রিয়া উৎপন্ন করে এবং তাহার ফলে কণীনিকার কতক অংশ আবৃত হয়। কিন্তু এই তীব্র আলোক অপসারিত হইলে পেশীসকলের উত্তেজনার হ্রাস হয় এবং তখন কণীনিকা পূর্ব্ব আকার ধারণ করে। পক্ষান্তরে অস্পষ্ট ক্ষীণালোকে সরলরেখাকার পেশীগুলির (radiating muscles) সংকোচন-ক্রিয়া উৎপাদন করে এবং তাহার ফল-স্বরূপ কণীনিকার প্রসারণ হয়।

এখন বুঝিতে পারিলে যে যখন আলোক খুব উজ্জ্বল ও তীব্র হয় তখন এই আলোক-রশ্মির কতকটা ঢাকা দিবার জন্য

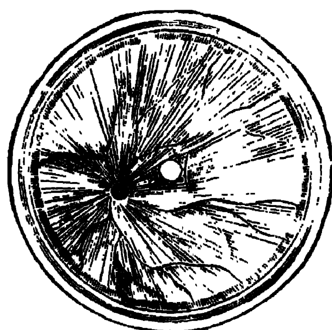
তারকা-বেষ্টন পর্দ্দাটী কণীনিকার উপর প্রসারিত হয়। আবার যখন আলোক অস্পষ্ট হয় তখন যথাসম্ভব আলোক-রশ্মিকে প্রবিষ্ট করিবার জন্য উক্ত পর্দ্দাটী গুটাইয়া কণীনিকা হইতে সরিয়া যায়।

দিনের বেলায় যখন খুব আলো হয় তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া যদি আয়নাতে মুখ দেখ এবং চোখের তারার প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া থাক তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে চোখের 'মণি' বা তারাটী ছোট দেখাইতেছে। এই সময়ে যদি একজন জানালাটী ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বন্ধ করিতে থাকে তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে আলোর তীব্রতা যতই কমিয়া আসিতেছে চোখের তারা ততই বড় হইয়া আসিতেছে। জানালাটী আবার খুলিয়া দিলেই তারাটী ছোট হইয়া যাইবে।

নেত্রপটলের সঙ্কোচন ও প্রসারণ-ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। স্বতঃপ্রবৃত্ত মাংসপেশীর দ্বারা উহা গঠিত এজন্য সাধারণতঃ আলোর তীব্রতানুসারে আপনা হইতেই উহা সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হইতে থাকে।

(গ) নেত্রপিণ্ডের পশ্চাদ্বর্ত্তী ঝিল্লী বা জালিময়পর্দ্দা (retina) বর্ণাবরণের ভিতর দিকের অতি সূক্ষ্ম লূতাতন্তুবৎ একটী কোমল আবরণবিশেষ। ইহা স্নায়ু-সূত্রে পূর্ণ এবং ইহার গঠন-প্রণালী অতি বিস্ময়কর। ইহা এমন অনুভব-প্রবণ যে আমরা যাহা কিছু দেখি সেই সকলের চিত্র এই পর্দ্দাতে প্রতিফলিত হয়। দর্শন-স্নায়ুদ্বারা ইহা মস্তিষ্কের সহিত যুক্ত আছে।

দর্শন-স্নায়ু নেত্রপিণ্ডের পশ্চাদ্ভাগে কণীনিকার ঠিক বিপরীত দিকে অর্থাৎ পশ্চাতে প্রবিষ্ট না হইয়া নাকের কাছাকাছি একটী বিন্দুতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। যে স্থানে দর্শন-স্নায়ু পূর্ব্বোক্ত 'রেটিনা' নামক জালিময় পর্দ্দার সহিত যুক্ত হইয়াছে উহা একেবারেই অনুভব-প্রবণ নয়। এই স্থানকে কৃষ্ণচিহ্ন (blind spot)



৪৮ নং চিত্র—নেত্রপিণ্ডের পশ্চাৎ অর্দ্ধাংশ (back half of eye-ball)।

বলে, কারণ যখন কোনও পদার্থের উপর এমন ভাবে কাহারও দৃষ্টিক্ষেপ হয় যে উহার প্রতিবিম্ব ঠিক এই কৃষ্ণচিহ্নের উপরে পতিত হয় তখন উক্ত পদার্থ তাহার কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না।

নেত্রপিণ্ডের পশ্চাতের কেন্দ্রস্থলে অর্থাৎ কণীনিকার ঠিক বিপরীত ভাগে আর একটী গোলাকার দাগ আছে তাহাকে পীতচিহ্ন (yellow spot) বলে। এই বিন্দুটীতে দৃষ্টি সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।


(ক)


(খ)

যদি এই বই খানা তোমার চক্ষু হইতে প্রায় ১ ফিট দূরে রাখিয়া বাম চক্ষু বুজিয়া ডান চক্ষুদ্বারা এক দৃষ্টে (ক) চিহ্নিত চিত্রটীর প্রতি তাকাইয়া থাক তাহা হইলে (ক) এবং (খ) উভয় চিত্রই সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে। এখন তোমার দৃষ্টি (ক) চিহ্নিত চিত্রটীর প্রতি স্থির রাখিয়া বইখানা যদি ক্রমশঃ সম্মুখের দিকে আনিতে থাক তাহা হইলে কিছুদূর আনিলেই (খ) চিহ্নিত চিত্রটী আর নয়নগোচর হইবে না। কিন্তু বইখানা যখন আরও চোখের কাছে আনিবে তখন পুনরায় উহা দৃষ্টি-গোচর হইবে।

উপরোক্ত পরীক্ষাকালে তোমার দৃষ্টি (ক) চিত্রের উপর আবদ্ধ ছিল। ইহা হইতে এই বুঝায় যে (ক) চিত্রের প্রতিবিম্বটী কণীনিকার বিপরীত দিকে জালিময় পর্দ্দার যে অংশে পীতচিহ্নটী আছে সেই অংশে অচলভাবে ছিল। তুমি যখন প্রথম (ক) এবং (খ) উভয় চিত্রই একসঙ্গে দেখিয়াছিলে তখন (খ) চিত্রের প্রতিবিম্ব পীতচিহ্ন এবং কৃষ্ণচিহ্নের মধ্যস্থলে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু তুমি যখন বইখানা তোমার সম্মুখের দিকে সরাইতে লাগিলে তখন (খ) চিত্রের প্রতিবিম্বও সরিয়া যাইতে লাগিল এবং ক্রমে কৃষ্ণচিহ্নের উপরে আসিয়া পড়িল। কাজেই তখন উহা তোমার দৃষ্টির অন্তরাল হইল। পরে যখন তুমি বইখানা ক্রমে তোমার আরো সম্মুখের দিকে সরাইতে

লাগিলে তখন (খ) চিত্রের প্রতিবিম্ব ক্রমে কৃষ্ণচিহ্ন হইতে সরিয়া গেল এবং উহা পুনরায় দৃষ্টিগোচর হইল।

ইহা হইতে এই প্রমাণিত হয় যে চক্ষের জালিময় পর্দ্দার (retina) এমন একটী সূক্ষ্ম স্থান আছে যাহার আলোকানুভূতি একেবারে নাই অর্থাৎ সম্পূর্ণ অন্ধ। দর্শন-স্নায়ুর প্রবেশ-পথটীই সেই সূক্ষ্ম স্থান এবং ইহাকেই কৃষ্ণচিহ্ন (blind spot) বলে। এই জালিময় পর্দ্দাই চক্ষে আলোকানুভূতি উৎপাদন করে। অতএব উহাকেই দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রধান অঙ্গ বলা যাইতে পারে।

কাচ-পূটক (lens) কাহাকে বলে তাহা না জানিলেও তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয় ত আতসী কাচ (magnifying glass) অর্থাৎ যে কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে দ্রব্যের আয়তন বড় দেখায় তাহা দেখিয়াছ। এরূপ কাচ দেখিয়া থাকিলে লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে উহার দুই পিঠে সমান না হইয়া 'আধারি' লণ্ঠনের কাচের ন্যায় মাঝখানটা বাদামী বা উচু। এইরূপ কাচকেই কাচ-পুটক বলা হয়। তবে সকল কাচ-পুটকই একপ্রকার নয়। কতকগুলির মাঝখানটা উচু না হইয়া গর্ত্তের ন্যায় আছে। যে কাচ-পূটকের মাঝখানটা বাদামী অর্থাৎ কচ্ছপের পিঠের ন্যায় তাহাকে ন্যুব্জাকার কাচ-পূটক (convex lens) এবং যাহার মাঝখানটা গর্ত্ত ও চারিপাশ পুরু তাহাকে বক্রোদর কাচ-পূটক (concave lens) বলে। চশমার জন্য যে কাচ ব্যবহার হয় তাহা এই কাচ-পূটক।

স্বচ্ছকাচ-পূটক (crystalline lens) নেত্রপটলের (iris)

ঠিক পশ্চাদ্ভাগস্থিত (৪৭ নং চিত্র দেখ) একটী অতি সুন্দর উজ্জ্বল স্বচ্ছ আটাল পদার্থবিশেষ। ইহা কচ্ছপের পিঠের ন্যায় ন্যুব্জাকার অর্থাৎ ইহার সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগ বক্রাকার এবং সম্মুখভাগ হইতে পশ্চাদ্ভাগ অধিক বক্র বা উচু। ইহার ব্যাস এক ইঞ্চির প্রায় এক তৃতীয়াংশ হইবে। বহু-সংখ্যক বন্ধনীদ্বারা ইহা স্বস্থানে অবস্থিত আছে। আলোক ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

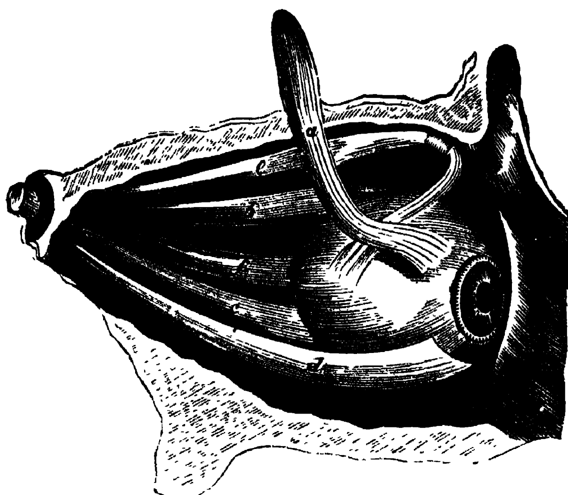
স্বচ্ছ কাচ-পূটক চক্ষের অগ্র-কক্ষকে পশ্চাৎ-কক্ষ হইতে পৃথক করিয়াছে। অগ্র-কক্ষ অর্থাৎ স্বচ্ছাবরণ এবং স্বচ্ছ কাচ-পূটকের মধ্যবর্ত্তী স্থান জলীয়রস (aqueous humour) নামক নির্ম্মল জলবৎ তরল পদার্থে পূর্ণ আছে। চক্ষুর পশ্চাৎ-কক্ষ অর্থাৎ দৃঢ়াবরণের মধ্যস্থিত বৃহৎ কক্ষটী মসৃণ-রস (vitreous humour) নামক স্বচ্ছ আঠাবৎ তরল পদার্থে পূর্ণ (৪৭ নং চিত্র দেখ)। ইহা চক্ষের অপর সকল অংশ অপেক্ষা বৃহৎ। ইহা অতি কোমল এবং স্বচ্ছ। ইহার ভিতর দিয়া অতি সহজে দৃশ্য পদার্থের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতে পারে।

তোমাদের মধ্যে যাহারা ফটোগ্রাফের ছবি তুলিবার যন্ত্র (camera) দেখিয়াছ তাহারা জান যে সেই যন্ত্রটী একটী বাক্সের ন্যায়। উহার সম্মুখের দিকে একটী গোল ছিদ্র আছে, তাহার মুখে একটী দুইদিকে ন্যুব্জাকার কাচ-পূটক আছে এবং পরে আর একটী বক্রোদর কাচ-পূটক আছে। বাক্সটীর পিছনের দিকে একটী সাধারণ ঘষা কাচ আছে। যাহার ছবি তোলা হইবে

এই ঘষা কাচের উপরে উল্টাভাবে তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে অর্থাৎ মাথা নীচের দিকে ও পা উপরদিকে হয়। অধিশ্রয়ণে (focus) সংগৃহীত আলোক-রেখার ক্রিয়াজনিত এইরূপ হইয়া থাকে। যাহা হউক এরূপ হইবার কারণ এখন সম্যক বুঝিতে পারিবে না। তবে মোটামুটি জানিয়া রাখ যে কাচ-পূটকের ভিতর দিয়া আলোক-রেখা প্রতিফলিত হইবার সময় এইরূপ বিপরীত ভাবে প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া থাকে।

নেত্রপিণ্ডের গঠন-প্রণালী এই আলোক-চিত্রের যন্ত্র-কৌশলের অনুরূপ। আলোক-সাহায্যে ছবিতোলা-যন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে কোনও পদার্থ হইতে আলোক-রেখা প্রথমতঃ কাচ-পূটকের ভিতর দিয়া প্রতিফলিত হইয়া অবশেষে উহা বক্রোদর কাচ-পূটকের ভিতর দিয়া প্রতিভঙ্গ হইয়া উক্ত যন্ত্রের বাক্সটীর পিছন দিকের গায়ে সেই পদার্থের একটী প্রতিবিম্ব বা চিত্র উৎপাদন করে।

চক্ষের বেলায় বিবিধ পদার্থ হইতে আলোক-রেখা স্বচ্ছাবরণ (cornea), জলীয়-রস (aqueous humour), স্বচ্ছ কাচ-পূটক এবং মসৃণ-রসের (vitreous humour) ভিতর দিয়া গমন করে এবং অবশেষে এই সকলে প্রতিভঙ্গ হইয়া (by refrection) নেত্রপিণ্ডের পশ্চাদ্বর্ত্তী ঝিল্লীতে (retina) সেই পদার্থের একটী চিত্র উৎপাদন করে। এই প্রতিচ্ছায়া (উক্ত ঝিল্লীদ্বারা দর্শন-স্নায়ুতে সঞ্চারিত হইয়া) মস্তিষ্কে নীত হয় এবং তাহা হইতেই দর্শনানুভূতি হইয়া থাকে।



৪৯ নং চিত্র—নেত্রপিণ্ডের পেশীসমূহের দৃশ্য (muscles of the eye-ball)

b, c, d, f—ঋজু-পেশী (straight muscles or recti)
a, e—তির্য্যক্-পেশী (oblique muscles) g—দর্শন-স্নায়ু (optic nerve)

নেত্রপিণ্ডের পেশীসমূহ (the muscles of the eye-ball)—নিম্নলিখিত ছয়টী পেশীদ্বারা অক্ষিগোলক ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া থাকে। যথা—

(১) উর্দ্ধ-ঋজুপেশী (superior rectus) অক্ষিগোলককে উর্দ্ধদিকে সঞ্চালিত করে।

(২) অধঃ-ঋজুপেশী (inferior rectus) অক্ষিগোলককে নিম্নদিকে সঞ্চালিত করে।

(৩) আভ্যন্তর-ঋজুপেশী (internal rectus) অক্ষিগোলককে ভিতরের দিকে সঞ্চালিত করে।

(৪) বাহ্য-ঋজুপেশী (external rectus) অক্ষিগোলককে বাহিরের দিকে সঞ্চালিত করে।

(৫) ঊর্দ্ধ-তির্য্যকপেশী (superior oblique) অক্ষিগোলককে অধঃ ও বাহ্যদিকে সঞ্চালিত করে।

(৬) অধঃ-তির্য্যকপেশী (inferior oblique) অক্ষিগোলককে ঊর্দ্ধ ও বাহ্যদিকে সঞ্চালিত করে।

এই পেশীসকলের চারিটী ঋজু অর্থাৎ সোজা এবং অপর দুইটী তির্য্যক অর্থাৎ বাঁকা (৪৯ নং চিত্র)। এই সকল পেশীদ্বারা অক্ষিগোলক ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করা যায় বলিয়া সকল সময় সমস্ত মস্তক নাড়িবার প্রয়োজন হয় না। যে অস্থিময় অক্ষি-কোটরের ভিতরে নেত্রপিণ্ড অবস্থিত আছে তাহার পশ্চাদ্ভাগ হইতে এই সকল পেশী উদ্ভূত হইয়া মাংসবন্ধনী (tendon) দ্বারা অক্ষি-গোলকের সম্মুখভাগে যুক্ত আছে (৪৯ নং চিত্র দেখ)। অক্ষি-কোটরের অস্থিময় অংশের উপরিভাগ অর্থাৎ যে স্থানে নেত্রপিণ্ড বসান আছে উহা মেদময়। নেত্রপিণ্ডকে আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং উহাকে উষ্ণ রাখিতে ও অবাধ সঞ্চালনে যাহাতে কোনও ব্যাঘাত উৎপাদন না হয় তজ্জন্য যেন অক্ষি-কোটরটীতে একটী চর্ব্বির গদি আঁটা রহিয়াছে। চক্ষু রগড়াইবার সময় যে লাগে না ইহাই তাহার কারণ।

অশ্রুনিঃসারক-গ্রন্থি (lachrymal gland) ও অশ্রু-নিঃসারণ-প্রণালী (lachrymal ducts) প্রত্যেক চক্ষের

বাহিরের কোনে অর্থাৎ কানের দিকে বাদামের আকৃতি এবং আয়তনবিশিষ্ট একটী করিয়া ক্ষুদ্র ঈষৎ পীতের আভাযুক্ত লোহিতবর্ণ গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থিগুলি হইতে এক প্রকার জলবৎ রস নিঃসৃত হয় এবং সেই অশ্রুজলে (lachrymal fluid) অক্ষিগোলক সিক্ত হওয়ায় উহার সঞ্চালন-ক্রিয়া সহজ হয়। এই অশ্রুজল তৎপরে সংগৃহীত হইয়া বহুসংখ্যক অতি ক্ষুদ্র নালী-যোগে চোখের পাতার ভিতরের দিকে নীত হয়। এই সকল ক্ষুদ্রনালী মিলিত হইয়া অবশেষে অশ্রুনিঃসারণ-প্রণালীতে পরিণত হইয়াছে। এই প্রণালী চক্ষের ভিতরের কোণ হইতে নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। চোখের নাকের দিকের কোণে যে একটী করিয়া সূচের আগার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে তাহা দেখিয়াছ কি? আয়নাতে দেখিলেই উহা বুঝিতে পারিবে। এই ছিদ্র-পথটীই অশ্রুনিঃসারণ-প্রণালী।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে চক্ষের বাহিরের কোণস্থিত গ্রন্থি হইতে যে অশ্রুজল নির্গত হয় তাহা চক্ষের পুটুলি ও পাতার উপর দিয়া বহিয়া ক্রমে জমা হইয়া ভিতরের কোণে নীত হয়। ক্রন্দন করিবার সময় অশ্রুজলে চক্ষু পরিপূর্ণ হইয়া এই নালী দিয়া বহিয়া যায়। অধিক ক্রন্দনের সময় যে নাক দিয়া জল গড়ায় তাহার কারণ এই যে তখন এত প্রবল বেগে জল বহিতে থাকে যে নালীপথ উপচিয়া গিয়া অতিরিক্ত জল নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়।

আলোকানুভূতি (sensation of light)—বায়ুর তরঙ্গ

জনিত যেমন শব্দের উৎপত্তি, তেমনি 'ইথার' (ether) নামক এক প্রকার উদ্বায়ী তরল পদার্থের কম্পনজনিত আলোকের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই আলোকের অনুভূতির সহিত চক্ষের 'রেটিনা' নামক পর্দ্দার কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু মস্তিষ্কের দর্শন-জ্ঞানোদ্দীপক অংশই ইহার কেন্দ্রস্থল। কারণ 'রেটিনা', এমন কি সমস্ত দর্শন-স্নায়ু অক্ষুণ্ণ থাকিলেও মস্তিষ্কের কোন অঙ্গ হানি হইলে আলোকের অনুভূতি কিছুমাত্র হইতে পারে না অর্থাৎ অন্ধ হইয়া থাকে।

বর্ণানুভূতি (sensation of colour) এবং বর্ণান্ধতা (colour blindness)—এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাতে ইহাই জানা গিয়াছে যে আলোক-রশ্মি চক্ষুর জালিময় পর্দ্দায় (retina) পড়িয়া সেখানে পদার্থের একটী প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করে এবং দর্শন-স্নায়ুদ্বারা সেই প্রতিবিম্বের কথাটী যেই মস্তিষ্কে নীত হয় অমনি আমাদের দৃষ্টিজ্ঞান হয়। কিন্তু আলোক-রশ্মিব কেবল ইহাই একমাত্র কাজ নয়। এই আলোক-রশ্মির সাহায্যেই আমাদের বিবিধ বর্ণজ্ঞান হইয়া থাকে।

রামধনুতে আমরা ৭টী বিভিন্ন রং দেখিতে পাই। পল-তোলা কাঁচখণ্ড (যেমন ঝাড়ের কলম) আলোর দিকে ধরিয়া দেখিলেও তাহার ভিতর দিয়া এইরূপ সাতটী রং প্রতিফলিত হইতে দেখা যায় তাহা বোধ হয় প্রত্যক্ষ করিয়াছ। দর্শনেন্দ্রিয়ের এই বর্ণানুভূতি কি প্রকারে হইয়া থাকে তাহা এখন তোমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে না।

অনেকে আবার এমনি বর্ণান্ধ যে তাহাদের একটী রং হইতে অপর রংএর পার্থক্য বুঝিবার শক্তি নাই। বিশেষতঃ লাল ও সবুজ রংএর পার্থক্য অনেকে বুঝিতে পারে না। অনেক সময় রেলগাড়ীর চালকের (engine driver) এই বর্ণান্ধতার জন্য রেলের ভীষণ দুর্ঘটনাসকল ঘটিতে দেখা গিয়া থাকে। চক্ষুর 'রেটিনা' নামক ঝিল্লীর বা দর্শন-স্নায়ুর কোনও অঙ্গহীনতার জন্য এরূপ বর্ণান্ধতা জন্মিয়া থাকে।

গ্রন্থকার প্রণীত

"শুশ্রূষা" সম্বন্ধে অভিমত।



ভূতপূর্ব্ব সিভিল-সার্জ্জন, লেপ্টেনাণ্ট-কর্ণেল শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বসু মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"শুশ্রূষা নামক পুস্তকখানি বেশ হইয়াছে। আমি উহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। পুস্তকখানি অতি সরল ভাষায় ও পরিষ্কাররূপে লিখিত হইয়াছে। এদেশে রোগীর শুশ্রূষা সম্বন্ধে যেরূপ বিশৃঙ্খলতা ঘটে তাহা স্মরণ করিলে সাধারণের বোধগম্য এইরূপ একখানি পুস্তকের যে বিশেষ অভাব ছিল তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাপ্রণালী, কি হোমিওপ্যাথিক কি এলোপ্যাথিক-প্রণালী সকলেই একমত হইয়া বলিতেছেন যে রোগীর চিকিৎসার জন্য ঔষধ-ভক্ষণ ব্যতীত রোগীর পথ্য ও শুশ্রূষার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। অথচ আমরা আয়ুর্ব্বেদিক শাস্ত্র মধ্যে রোগীর সেবা সম্বন্ধে যে সমুদায় উপদেশ আছে তাহাও জানি না বা জানিতে চেষ্টা করি না এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে যে সমুদায় উপদেশ আছে তাহাও জানি না। সুতরাং অনেক সময় বিভ্রাট ঘটে। এমন কি ঔষধ, পথ্য ও শুশ্রূষার বৈষম্য হেতু রোগীর অকাল মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। এমন স্থলে শুশ্রূষা সম্বন্ধে কতকগুলি আবশ্যকীয় কথা সুন্দররূপে লিখিত হওয়ায় যে সাধারণের একটী গুরুতর অভাব মোচন হইয়াছে তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ একখানি পুস্তক সকল গৃহস্থের বাটীতে থাকা উচিত।**"



ভূতপূর্ব্ব সিভিল-সার্জ্জন Lt. Col. **U. N. Mukherjie,** *M. B., C. M. (Edin), M. R. C. S. (Lond)* লিখিয়াছেন—"আমি বাবু শ্যামাচরণ দে প্রণীত 'শুশ্রূষা' পাঠ করিয়া বিশেষ পরিতোষ লাভ করিয়াছি। বিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তক সঙ্কলিত হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস হইত না। ইংরাজী ভাষায় শুশ্রূষা সম্বন্ধীয় পুস্তকের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন গ্রন্থই বাঙ্গালী গৃহে রাখিবার উপযোগী নয়; একে ব্যয় সাপেক্ষ তাহার পর পরিচ্ছদ পথ্যাদি সম্বন্ধে মৌলিক নিয়ম ভেদ হেতু বাঙ্গালী রোগীর কোন প্রয়োজনই তাহাদের দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভব নয়। শ্যামাচরণ বাবুর পুস্তকে শুশ্রূষা সম্বন্ধীয় যাহা কিছু জানা আবশ্যক তাহা সন্নিবেশিত আছে। বাঙ্গালী মাত্রেরই গৃহে গৃহে একখণ্ড রাখা উচিত।

Dr. J. N. Mittra, *M. R. C. P.* (London) .—"* * I have gone through the book and am glad to see that in has just filled up a gap in the popular science series of books in the Bengali literature. It is written in a plain easy style * * * *It should be in the hand of every housewife.*"

Dr. M. M. Bose. *M. D., L. R C. P.* (Edin) :—"I heve read with much interest Babu Shama Churn Dey's "শুশ্রূষা" The treatise has been nicely arranged. *I have no doubt it will be of great help to those who take up the sacred and important duty of nursing sick people.* There is also a chapter in the Book on *accidents* and how to meet them."

Dr. Sundari Mohan Das, *M. B., M. C. P. S.,* author of "*Hygiene in Bengali*", "*Small-pox and Vaccination*" &c. &c. .—

"Practitioners are often at a loss to understand why the pounds and pints of drugs they prescribe do little good to their patients, and their joy knows no bound when they find a little extra trouble

in advising the attendants to separate the fresh phials from the old ones or to administer the medicines and meals at regular intervals is amply repaid by the rapid improvement of the poor sufferer. So between the patient and his physician stands a class of people called *nurses* or attendants who have no guidance except love o lucre. It is extremely gratifying to find Babu Shyama Charan De coming to our rescue by a scientific attempt to teach this class His **"Susrusa" will be of immense help to** *those who nurse the sick.'*

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

'শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দে প্রণীত **'শুশ্রূষা'** প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। রোগের প্রতিকার পক্ষে সুচিকিৎসা যেমন আবশ্যক শুশ্রূষাও তদপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। কিন্তু এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে বঙ্গ সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত কোনও পুস্তকই ছিল না। এই গুরুতর অভাব মোচনে প্রয়াস পাইয়া শ্যামাচরণ বাবু যে এদেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের ভাষা সরল এবং বিষয়বিন্যাস অতি প্রশংসার্হ। আশা করি এই অভাব প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বঙ্গদেশে গৃহে গৃহে রক্ষিত হইবে।"

হিতবাদী (২৫শে বৈশাখ, ১৩০৪)—"আমাদের দেশে শুশ্রূষাকারীর দোষে অনেক স্থলে সুচিকিৎসা সত্ত্বেও হিতে বিপরীত ফল হইতে দেখা যায়। এই অভাব মোচন জন্য শ্যামাচরণ বাবু এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। এই পুস্তকে রোগের শুশ্রূষাপ্রণালী, পথ্য প্রস্তুতপ্রণালী, পুল্টিশ ইত্যাদি প্রস্তুত ও ব্যবহার-প্রণালী ও সামান্য সামান্য রোগের মুষ্টিযোগ ইত্যাদি অনেকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় সরল ভাষায় সন্নিবেশ করিয়াছেন।"

চারুমিহির (৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪)—"* * একদিকে সুচিকিৎসা অন্যদিকে উপযুক্ত শুশ্রূষা। শুশ্রূষার দোষে চিকিৎসা নিষ্ফল হইয়া পড়ে। শুশ্রূষাকারীর অজ্ঞতা বশতঃ হিতে বিপরীত ঘটিয়া থাকে। শুশ্রূষার গুণে রোগী উপস্থিত কষ্টে বহু আরাম লাভ করে, সহজে চিকিৎসা সফল হয়। কি প্রণালীতে শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য, এই পুস্তকে তাহা সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে। ইহার পরিচ্ছেদগুলি সুসংবদ্ধ এবং বিষয়গুলি বিশদ ভাষায় লিপিবদ্ধ। ইহাতে আনুসঙ্গিক বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থ শুশ্রূষা পাঠে যথেষ্ট উপকার পাইবেন, ভরসা করি ঘরে ঘরে শুশ্রূষার আদর হইবে।"

সঞ্জীবনী (৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪)—"* * * দেখিয়া সুখী হইলাম, শ্যামাচরণ বাবুর "শুশ্রূষা" শুশ্রূষাশিক্ষার্থীর পক্ষে একখানি উপাদেয় পুস্তক হইয়াছে। এই পুস্তক ঘরে ঘরে সমাদৃত হইবে বলিয়া আশা হইতেছে। গ্রন্থের ভাষা সরল, মুদ্রণ সুন্দর, বিষয়-সন্নিবেশ উপযোগী এবং শৃঙ্খলাটীও সুবিধাজনক হইয়াছে। রোগীর সেবা শুশ্রূষা সম্বন্ধে গৃহস্থের অবশ্য জ্ঞাতব্য বহুতর বিষয় এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই শুশ্রূষা প্রত্যেক গৃহস্থের একবার পাঠ করা উচিত। * * *"

দাসী (মে, ১৮৯৭)—"* * বইখানির আকার, বাঁধান, কাগজ ও ছাপা যেরূপ মনোরম, নয়নরঞ্জন * বক্তব্য বিষয়সন্নিবেশ ও বিষয়ের অবতারণাপ্রণালী ততোধিক প্রীতিপ্রদ ও সুন্দর হইয়াছে। শুশ্রূষা উত্তমরূপে সম্পন্ন হইলে, রোগযাতনা অর্দ্ধেক লাঘব হয় এবং রোগী শারীরিক যন্ত্রণার ভিতরে আরাম ও মনে শান্তি পাইয়া থাকেন। শুশ্রূষার অভাবে, অথবা সাধু ইচ্ছাসত্ত্বেও শুশ্রূষার কদর্য্য প্রণালী বশতঃ, রোগীর চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়া আরো রোগ বৃদ্ধি পায়। এই গ্রন্থখানি সেই অভাব অনেকটা মোচন করিবে। "শুশ্রূষা" প্রত্যেক পরিবারে ও পীড়িতাশ্রমে সযত্নে রক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। উদ্বাহ অনুষ্ঠানে এই বইখানি সুন্দর অথচ অতি প্রয়োজনীয় উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হইতে পারে। * * *"

The East (July 3, 1897)—"* * This is an excellent book, containing as it does, instructions of varied nature as to how and in what respects, patients suffering from all kinds of diseases are to be attended to. It is so nicely got up that it furnishes a very pleasant reading to all those including parents, who are required to nurse the sick. It is indeed a very useful and exhaustive treatise on the all important subject, the nursing of the sick. We would commend it to our families all over the country. *Every family will do well to have a copy of it.* * *"

Indian Messenger (July 11, 1897)—"* * *ought to be on the book-shelf in every household in Bengal.* The importance of such a book cannot be gainsaid. Mr. Day's manual, the first of its kind in Bengali, is well printed, nicely bound and moderately priced at a rupee."

Indian Mirror (July 31, 1897)—"This is a Bengali book on nursing the sick. It gives clear directions as to what nurses should do in regard to the different ailments, which they are called upon to deal with. Hints on Hygienic matters and the preparation of gruels and diet find a large place in the compilation. A list of domestic medicines forms the subjects of a separate chapter. The nearest relatives or friends invariably attend on the sick in the Hindu household, and as they are not expected to possess the technical knowledge of the professional nurses, *the book, under notice, will be found by them to be of immense value.*"

নব্যভারত (শ্রাবণ, ১৩০৪)—"* * উৎকৃষ্ট ছাপা, উৎকৃষ্ট কাগজ এবং উৎকৃষ্ট বাঁধা। বিষয় নির্ব্বাচন ভাল, এবং ঔষধ প্রয়োগপ্রণালী সুন্দররূপে বর্ণিত। এই পুস্তকে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। * * *"

বামাবোধিনী পত্রিকা (শ্রাবণ, ১৩০৪) "* * এ পর্য্যন্ত রোগীর শুশ্রূষা সম্বন্ধে যত পুস্তক বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ হইল। ইহাতে জানিবার বিষয় অনেক আছে। গর্ভিণীর শুশ্রূষা ও শিশুপালন সম্বন্ধে দুই এক অধ্যায় থাকিলে ইহা পূর্ণাঙ্গ হইত। গ্রন্থের ভাষা বেশ সহজ হইয়াছে। দুর্ঘটনা ও মুষ্টিযোগ প্রকরণ বিশেষ উপকারী। প্রত্যেক গৃহে এরূপ পুস্তক থাকা আবশ্যক।"

Calcutta Gazette (October 13, 1897)—"A very useful publication contaning instructions on the proper way of nursing the sick and the preparation of different kinds of diet for them. It also gives a number of recipes for cases of emergency and accidents."

সময় (৩০শে মাঘ, ১৩০৪)—"* * রোগ হইলে রেগীর কিরূপ শুশ্রূষা করিতে হয়, ঔষধ সেবন করাইতে হয়, পথ্য দিতে হয়, পথ্য প্রস্তুত করিতে হয় এই সকল এবং রোগের মোটামুটী চিকিৎসা পর্য্যন্ত ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। উত্তম বাঁধাই এবং কাগজ ও ছাপা উত্তম। লেখকের ভাষা উত্তম। সাধারণ লোকের বিশেষ উপকার দর্শিবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।"

ভারতী (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫)—"* * আমাদের দেশের বহুবিস্তৃত একান্নবর্ত্তী পরিবারে রোগেরও প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট এবং শুশ্রূষারও অভাব নাই। বরং অতি শুশ্রূষায় রোগী বিপন্ন হইয়া পড়ে এবং আত্মীয়দের একান্ত চেষ্টা ও উদ্বেগ বশতঃই শুশ্রূষার ফল অনেক সময় বিপরীত হয়। রোগীর সুখস্বাস্থ্যবিধান কেবলমাত্র ইচ্ছা ও প্রয়াসের দ্বারা হয় না,—সেজন্য শিক্ষা ও অভ্যাসের প্রয়োজন আছে। তাহা ছাড়া রোগীর পরিচর্য্যায় সুপ্রণালীবদ্ধ নিয়মপালন বড়ই আবশ্যক;—রুগ্নকক্ষে প্রবেশ অবারিত, কথাবার্ত্তা অসংযত, এবং সমস্তই বিধিব্যবস্থাহীন হইলে চলে না। কিন্তু হায়, সতর্ক এবং বিহিত ব্যবস্থা আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এবং চারিদিক হইতে আত্মীয়জনোচিত হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশের সমস্ত পথ খুলিয়া রাখিতে গিয়া বিধিব্যবস্থার নিয়ম সংযোগে সম্পূর্ণ ঢিলা দিতে হয়।

এই কারণে সমালোচ্য গ্রন্থখানি আমাদের দেশে মহোপকারী বলিয়া বোধ করি। গ্রন্থকার উপযুক্ত গ্রন্থ এবং সুচিকিৎসক বন্ধুর সাহায্যে এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জ্জিত ; ডাক্তারী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানবিহীন পাঠক পাঠিকাদের পক্ষে এ গ্রন্থখানি উপাদেয়।

কিন্তু কেবলমাত্র পাঠদ্বারা অল্পই ফললাভ হইবে, শিক্ষা এবং চর্চ্চা চাই। বালিকা মাত্রেরই এই গ্রন্থ স্কুলপাঠ্য এবং পরীক্ষার বিষয় হওয়া উচিত। ঔষধ প্রয়োগ, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, পুল্টিশ দেওয়া, পথ্য প্রস্তুত করা রোগীর অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা, সংক্রামক রোগাদিতে মারীবীজনাশক উপায়াদির সহিত পরিচিত হওয়া, এ সমস্তই স্ত্রী-শিক্ষার অবশ্য-নির্দ্দিষ্ট অঙ্গরূপে প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য। আজকাল দুরূহ শিক্ষাপ্রণালী পরীক্ষা-প্রতিযোগিতা এবং জীবিকা চেষ্টায় স্বজাতির মধ্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রুগ্নসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, রোগী পরিচর্য্যা বিদ্যাটা যদি আমাদের স্ত্রীগণ বিশেষরূপে শিক্ষা করেন তবে দেশটা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইতে পারে। তাঁহারাও রাত্রি জ্বালিয়া রাত জাগিয়া আকণ্ঠ পড়া গিলিয়া পুরুষদের সহিত ঊর্দ্ধশ্বাসে বিদ্যা দৌড়ের ঘোড়দৌড় খেলাইতে যান দেহলতা জীর্ণ, মেরুদণ্ড নত এবং হরিণচক্ষু চষমাচ্ছন্ন করিয়া তোলেন তবে জয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়—কিন্তু পরাজয় আমাদের জাতীয় সুখস্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যের।

প্রদীপ (ফাল্গুন, ১৩০৫)—"এই পুস্তকখানি প্রত্যেক গৃহস্থেরই থাকা উচিত। ইহাতে গৃহশয্যা, রোগীর প্রতি কর্ত্তব্য, শুশ্রূষা করিবার যোগ্যতা ও কর্ত্তব্য পরিচর্য্যা, ঔষধ বিধান আহার সেক, পুল্টিশ অস্ত্রপ্রয়োগের পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত, অস্ত্রপ্রয়োগের পর কর্ত্তব্য ক্ষত শুশ্রূষা, দুর্ঘটনা, পথ্যাপথ্য নির্ণয়, পথ্য প্রস্তুতপ্রণালী, খাদ্য নির্ব্বাচন, রোগবিশেষে ব্যবস্থা, মুষ্টিযোগ এবং অন্যান্য বহুবিধ একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ একখানি পুস্তকের বড় অভাব ছিল। শ্যামাচরণ বাবু এই পুস্তক লিখিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। কারণ অনেক সময় ভাল ডাক্তারের চিকিৎসাও উপযুক্ত শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যার অভাবে ফলপ্রদ হয় না।"

চারুমিহির (৩১শে আষাঢ়, ১৩০৯)—"* * * আমরা প্রথম সংস্করণের সমালোচনায় লিখিয়াছিলাম, শুশ্রূষা সমাদৃত হইবে, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। অনেকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের সন্নিবেশে এই সংস্করণে ইহার আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে। নবম পরিচ্ছেদে ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যকর স্থানগুলির বিবরণ পড়িয়া পাঠকগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন।"

বসুমতী (১০ই শ্রাবণ, ১৩০৯)—"* * * সুধু ঔষধ খাইলেই রোগ নিবারণ হয় না, শুশ্রূষা বিশেষ দরকার। আমাদের গৃহস্থের মেয়েরা ছেলেপিলেদের জ্বর কি অন্য পীড়া হইলে কাঁদিয়াই আকুল হন; শুশ্রূষার কিছুই জানেন না; আর সেইজন্য রোগীও ভাল ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে থাকিয়াও কত কষ্ট পায়। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বাবু এই পুস্তকখানি প্রচার করিয়া সুধু যে আমাদের উপকার করিলেন তাহা নহে, কত রোগীর প্রাণ বাঁচাইলেন। পুস্তকখানি যে সাধারণে আদৃত হইয়াছে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ। দিন পঞ্জিকার মত এই পুস্তকখানি প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে রাখিতে অনুরোধ করি। * * *"

নব্যভারত (শ্রাবণ, ১৩০৯)—"* * * এ পুস্তকখানিরও প্রথম সংস্করণে আমরা বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলাম। এ পুস্তকখানি গৃহীমাত্রেরই গৃহপঞ্জিকার ন্যায় উপকারে আসিবে। দ্বিতীয় সংস্ক[illegible] অপেক্ষা [illegible]র হইয়াছে।"

